আমাদের সংবিধান

সুভাষ সি কাশ্যপ

অনুবাদ

পার্থ সরকার

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

আমাদের সংবিধান

সুভাষ সি কাশ্যপ

অনুবাদ

পার্থ সরকার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-2260-5

প্রথম প্রকাশ · 1998 (*শক* 1919)

দ্বিতীয় মুদ্রণ . 2002 (*শক* 1923)

মূল্য : 45.00 টাকা

Our Constitution *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক

নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

কোনও খ্যাতনামা লেখকের কাছে কে যেন জানতে চেয়েছিল যে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত বইটি লিখতে কত সময় লেগেছিল। জবাবে লেখক বলেন, লিখতে তাঁর মাত্র দেড় বছর সময় লেগেছিল কিন্তু নির্দিষ্ট ঐ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করার জন্য তাঁর সারা জীবনের অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা কাজে লাগাতে হয়েছিল। বর্তমান লেখা সম্পর্কে বিনম্রভাবে একই কথা বলা যায়।

গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি সংবিধান ও সাংবিধানিক আইনের ছাত্র—কার্যত ভারতের সংবিধান রচনা, গ্রহণ ও প্রবর্তনের সময় থেকে। 'দ্য ফ্রেমিং অফ ইনডিয়ান কন্‌সটিটিউশান' পাঁচ খণ্ডে লেখা শেষ করার পর যে বিষয়ের উপর আমি বহুদিন ধরে একটি সহজবোধ্য বই লিখতে চেয়েছি তা হল ভারতীয় সংবিধান কীভাবে গড়ে উঠেছে, কেমন করে কাজ করেছে এবং কী ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে আমি ব্যাপক লেখালেখি করেছি এবং রাজনীতি, সরকার ও সংসদের উপর বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সংবিধানের উপর আমার এই পরিকল্পনাটি আড়ালেই থেকে গিয়েছে। সহজে ব্যবহারযোগ্য এই বইটি প্রকাশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের।

ভারতের সংবিধান নিয়ে সহস্রাধিক পাতার একটি বড় বই লেখা আমার কাছে অনেক বেশি সহজ হত। এই বইটি যাতে স্থূলায়তন না হয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভণিতা বর্জিত হয়, বাস্তব তথ্যভিত্তিক হয় এবং সাধারণ মানুষের পাঠযোগ্য হয় সেজন্য সত্যিই আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এজন্য উদ্ধৃত সূত্রের বিস্তারিত উল্লেখ, পাদটীকা দেওয়া ইত্যাদি আমি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছি। তবে প্রাসঙ্গিক কোনও কিছু বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য যাতে বাদ না যায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। মামলার ক্ষেত্রে আমি সুপ্রিম কোর্টের বাছাই করা বিভিন্ন রায়ের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছি। তা ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক আইনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে কিছু সাংবিধানিক বিতর্কে আমি তীক্ষ্ণ মতামত পোষণ

করি। আলোচ্য গ্রন্থে ঐ বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া থেকে আমি সতর্ক ভাবে বিরত থেকেছি। পরবর্তী কালে ভিন্ন স্বাদের লেখায় সেগুলি ব্যবহার করার ইচ্ছা আছে।

ইতিমধ্যে আমাদের সংবিধানের উপর বিপুল আয়তনের বহু খণ্ডের বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। সদা ব্যবহারযোগ্য, সর্বার্থসাধক ও প্রামাণিক একটি বইয়ের প্রয়োজন বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। আশা করি এই বইটি সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবিধানিক আইনের ছাত্ররাই নয়, আইনজীবী এবং আমাদের সংবিধানকে জানতে ও বুঝতে চান এমন ব্যক্তিদের কাছেও এই বইটি গ্রহণযোগ্য হবে।

সংবিধানের বয়ান ও গণপরিষদের বিতর্কের উপর নির্ভর করা ছাড়াও আইন-প্রতিবেদনগুলির উপর আমাকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। তা ছাড়া বিচারপতি হিদায়াতুল্লা, বিচারপতি বেগ, বিচারপতি হেগড়ে, বিচারপতি গজেন্দ্রগদকর, এন এ পাল্কিওয়ালা, শিবরাও, এইচ এম সিরভাই, গ্র্যানভিল অস্টিন, আর. সি. এস. সরকার, পি. এম. বকসি, এম. পি. জৈন, জে. এন. পাণ্ডে, ভি. এন. শুক্লা, ডি. ডি. বসু এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের রচনা থেকে আমি উপকৃত হয়েছি। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আমি আমার আগেকার লেখাগুলিরও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি। শ্রী এম. সি. শাহ, শ্রী পি. আর মিত্তাল যথাক্রমে মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগ অধ্যায় দুটিতে সাহায্য করেছেন। শ্রী শাহ আমাকে সারণি ও গ্রন্থসূচি করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি আমার বন্ধুদের, পরিবারের সদস্যদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বইটি শেষ করতে আমায় সাহায্য করেছেন।

সুভাষ সি. কাশ্যপ

এক

ভূমিকা

সংবিধান কী ?

দেশের জনগণকে শাসন কবার জন্য বাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে সেই দেশের সংবিধান। রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গগুলি — আইনসভা, প্রশাসন, ও বিচার ব্যবস্থা — সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হয়। সংবিধান এদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে, দায়িত্ব স্থির করে এবং পারস্পরিক ও জনগণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ কবে।

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত হয় যার আদর্শরূপ হল জনগণের স্বশাসন। কিন্তু প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, জাতি ও রাষ্ট্রের পরিধির জন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আজ আর সম্ভব নয়। কী ভাবে ও কাদের দ্বারা শাসিত হতে চান তা ঠিক করার জন্য আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণ তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রয়োগ করে। জনগণেব সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক পদক্ষেপ হল নিজেদের একটি সংবিধান প্রদান করা। এই সংবিধান সেই মূল নিয়মগুলির রূপরেখা নির্ধারণ করে যাব ভিত্তিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কিছু ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় একটি সংবিধান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা, তাদের সীমানা নির্ধারণ ও ক্ষমতা বণ্টন করে। এটা যেমন কেন্দ্রীয় স্তরে করা হয়, তেমনই করা হয রাজ্য বা অন্য ইউনিটের স্তরেও। একটা দেশের সংবিধানকে সে দেশের মৌলিক আইনও বলা যায় যা রাজনৈতিক পরিকাঠামোর বনেদ তৈরি করে। অন্য সমস্ত আইন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যাবলীর বৈধতা ও আইন-গ্রাহ্যতার পরীক্ষা এর ভিত্তিতেই হয়।

প্রতিটি সংবিধানে তার স্থপতিদের দূরদৃষ্টি ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে কেন্দ্র কবে সংবিধান গড়ে ওঠে যা জনগণেব বিশ্বাস ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয।

একটি দেশের সংবিধানকে কোনও প্রাণহীন দলিল মনে করা ভুল, কারণ সংবিধানে যা লেখা আছে শুধুমাত্র সেটুকুই সংবিধান নয়, সক্রিয় প্রতিষ্ঠানাদিব একটি সজীব অঙ্গ হল সংবিধান। এটা ক্রমবর্ধমান ও বিবর্ধনমূলক। কীভাবে এবং কাদের দ্বারা তা কার্যকর হচ্ছে তার ভিত্তিতেই সংবিধান তার সারবস্তু ও অর্থ অর্জন করে। আদালতের ব্যাখ্যা, প্রথা ও সংবিধানের বাস্তব প্রয়োগভিত্তিক অনুশীলন সংবিধানের কার্যকাবিতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংবিধানিক আইন ঃ

সংবিধানের ধারাগুলিতে দেশের যে মৌলিক আইন অন্তর্ভুক্ত বয়েছে, তারই তাৎপর্য প্রকাশ করে সাংবিধানিক আইন। বিশেষ করে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গেব মধ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনেব যে কাঠামো রয়েছে, তাব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাংবিধানিক আইন। তবে বিশেষ ভাবে মুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আধুনিক সাংবিধানিক আইন মৌলিক মানবিক অধিকার ও নাগরিকেব সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাছাড়া সংবিধানের বিষযবস্তু সাংবিধানিক আইনের একমাত্র সূত্র নয়। সাংবিধানিক আইনের মামলা, প্রথা এবং সাংবিধানিক ধাবানুযায়ী তৈরি হওযা বেশ কিছু আইন বিধিও সাংবিধানিক আইনেব অন্যতম সূত্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

নিয়মতান্ত্রিকতা ঃ

সংবিধান শাসিত বা সংবিধানেব অধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিকতা বলে। এই নিয়মতান্ত্রিকতা সীমাবদ্ধ সরকার ও আইনের অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এর ফলে শাসন ব্যবস্থা কখনও স্বেচ্ছাচাবী, স্বৈরাচারী বা একনায়কের শাসন হয়ে উঠতে পারে না। সাংবিধানিক সরকার তাই সব সময়েই গণতান্ত্রিক সরকার হয়। তা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিকতা মানেই লিখিত সংবিধান—কারণ লিখিত সংবিধানই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সংজ্ঞা ও সীমানা নির্ধারণ করে। লিখিত সংবিধানের অধীন সরকাব সীমাবদ্ধ হবেই। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় লিখিত সংবিধান থাকা সত্ত্বেও কিছু দেশ প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক নয়। এমন উদাহরণ অনেক আছে। বলা যেতে পারে তাদের সংবিধান আছে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতা নেই।

ভারতের সংবিধান ঃ

আমাদের বর্তমান সংবিধান অর্থাৎ ভারতের প্রথম সংবিধান 1949 সালের 26

নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়। এই সংবিধান ভারতের জনগণের তৈরি এবং জনগণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত। 1950 সালের 26 জানুয়ারি থেকে সংবিধান চালু হয়। মূল সংবিধানে 22টি অংশ, 395টি অনুচ্ছেদ এবং 9টি তফসিল আছে। কিন্তু এই সংবিধান সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে। গত 46 বছরে প্রায় 76টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। তফসিলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 12টি।

সংবিধানের উৎস ঃ

দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সূত্র থেকে ভারতীয় সংবিধানের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে তাঁদের কাজটা সহজ নয়। অতীতকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করাব একটা সচেতন সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছিলেন। তাঁরা স্থির করেছিলেন তৎকালীন কাঠামোর উপরে এবং তখনকার প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁরা কাজ করবেন। ভারতের সংবিধানটি ধীরে ধীরে সাংগঠনিক উপায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ার যে সব দাবি উঠত সেই সব দাবির মাধ্যমে এবং মাঝে মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের অনিচ্ছাকৃত ছোট মাপেব সাংবিধানিক সংস্কারের দৌলতে আমাদের সংবিধান ক্রম-বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক অবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে—বিশেষত যাকে আধুনিক অর্থে 'আইনসভা' বলা হয়—বহু পূর্বে প্রায় 1920 সালের শেষ দিকে শুরু হয়। কার্যত, সংবিধানের বেশ কয়েকটি ধারার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে প্রাচীন ভারতের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অনুপ্রাণিত হয়ে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। 73 ও 74তম সংবিধান সংশোধন আইন পঞ্চায়েতগুলিকে অধিকতর অর্থবহ করে তুলেছে।

1918 সালে জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের সময় বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের দাবি তোলা হয়। 1925 সালের জাতীয় সম্মেলনে 'কমনওয়েল্থ অফ ইন্ডিয়া বিলেব' চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। আইনের চোখে সমতা, বাক্ স্বাধীনতা, সমবেত হওয়া এবং ধর্মাচরণ প্রভৃতি 'অধিকারের ঘোষণা' এই বিলে করা হয়। 1927 সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের দাবি পুনরায় তোলা হয়। 1928 সালে সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত মতিলাল নেহরু কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিচারগ্রাহ্য মৌলিক মানবাধিকার অর্জন করাই ভারতের জনগণের প্রথম লক্ষ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে নেহরু প্রতিবেদনের 19টি মৌলিক অধিকারের 10টি-ই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে। 1931 সালে করাচি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা হয়। 1931 সালের প্রস্তাবে

উল্লিখিত বেশ কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের মধ্যে স্থান পেয়েছে। মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের কথা না থাকলেও এই বিষয়ে একটি অধ্যায় 1976 সালের 42তম সংশোধনীর পর সংবিধানে সংযোজিত হয়।

সংবিধানে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ সংসদীয় নিয়মতন্ত্রে বাঁধা একটি সরকার, সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে সব কথা বলা হয়েছে তার সবই 1928 সালের মতিলাল নেহরু কমিটির প্রতিবেদনে ছিল।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে সংবিধানের শতকরা প্রায় 75 ভাগ যথাযথ সংযোজন ও সংশোধন সহ 1935 সালের ভারত সরকার আইনের পুনরুল্লেখ মাত্র। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাঠামো, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ধারাসমূহ, জরুরি অবস্থার ঘোষণা ইত্যাদি মূলত 1935 সালের আইনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। দেশীয় উৎসগুলি ছাড়াও বহু বিদেশী সংবিধান গণপরিষদের সামনে ছিল। এই ভাবেই নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের ধারণাটি আইরিশ সংবিধান থেকে গ্রহণ করা হয়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া হয় আইনসভার প্রতি দায়বদ্ধ মন্ত্রীদের দায়িত্বসহ সংসদীয় ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরূপে রাষ্ট্রপতিকে এবং রাজ্যসভার সভাপতি রূপে উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়োগের ধারাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথাও বলা যেতে পারে মার্কিন সংবিধানের বিল অফ রাইট্সের অনুপ্রেরণায় আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি রচিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের ধারাসমূহ এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনকে প্রভাবিত করেছে কানাডার সংবিধান। সপ্তম তফসিলের অন্তর্গত যুগ্ম তালিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আদান প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা এবং সংসদীয় অধিকারের বিষয়গুলি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের আদলে গৃহীত। জরুরি অবস্থার ধ্যানধারণা জার্মান রাইখের কাছ থেকে নেওয়া। রিট জারি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারার পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বুঝতে হলে এবং সংসদীয় অধিকারের বিষয়ে এখনও ব্রিটিশ সংবিধানের সাহায্য নিতে হয়।

সংবিধানের ব্যাখ্যা ঃ

বিধিবদ্ধ আইনগুলির ব্যাখ্যার সাধারণ নিয়মাবলী সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংবিধান একটি মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন, যার বলে তৈরি হয় আইনসভা। আর সেই আইনসভাতেই দেশের সমস্ত আইন তৈরি হয় এবং বৈধতা লাভ করে সবরকম সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ঊর্ধ্বে উঠে সংবিধানকে ব্যাখা করতে হবে। সাধারণ নিয়মাবলী ছাড়াও সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার বিশেষ কয়েকটি নিয়ম আছে।

সংবিধানের প্রতিটি ধারা এমন ভাবে তৈরি হয় যাতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের

অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা থাকে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে, নেহাত অন্যভাবে প্রয়োজন না হলে, প্রতিটি শব্দ প্রচলিত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা উচিত। *কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য*। (1973 SCC 225)।

সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য বুঝবার জন্যই সংবিধানের ব্যাখ্যা করা হয়। সংবিধানে ব্যবহৃত প্রকৃত শব্দগুলির নিরিখে এই ব্যাখা করা দরকার। সংবিধানের কোনও ধারার ভাষা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হলে সংবিধান প্রণেতারা গণপরিষদে কী বলেছিলেন বা সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য কী, — এসব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষার অস্পষ্টতার জন্য যদি একাধিক ব্যাখা দেওয়া যায় তা হলে স্পষ্ট ব্যাখার জন্য সংবিধান প্রণেতাদের বক্তৃতা বা সংবিধানের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা যেতে পারে (*গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1950 SC 27)।

প্রতিটি অংশ যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র সংবিধানটি পড়া উচিত। যেখানে দুটি ধারার মধ্যে সংঘাত বাধে, সেখানে যে অর্থ দুটি ধারাকেই কার্যকর করে এবং তাদের সুসমঞ্জস প্রয়োগ সম্ভব হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত। (*ভেঙ্কটারামান্না বনাম মহীশূর রাজ্য* A 1958 SC 255), *মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকম* (1951) SCR 527, *গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* (1950) SCR 88)।

একটি ধারার কোনও অংশ বাতিল হয়ে গেলেও বৈধতা বহাল থাকে যদি সেই অংশটিকে অপর অংশের বাতিল অংশ থেকে আলাদা করা যায় এবং তা স্পষ্ট অর্থ বহন করে। (*গয়াপ্রতাপ সিংহ বনাম এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক* AIR 1955 SC 765, *গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* (1950) SCR 88)।

সুপ্রিম কোর্ট গোলক নাথ মামলায় বলেন, আদালতের ব্যাখ্যা বা আদালত ঘোষিত কোনও আইনকে আগে থেকে কার্যকর করার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ, এর ফলে অতীতের আইনগুলির বৈধতা বাতিল হয় না। (*গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1967 SC 1643)।

দুই

সাংবিধানিক ইতিহাস

অতীত ঐতিহ্যের পরম্পরার উপর একটি দেশের সংবিধানের সৌধ গড়ে ওঠে। প্রচলিত কোনও সংবিধানকে সম্যক ভাবে বুঝতে গেলে তার অতীত প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস জানা দরকার।

প্রাচীন ভারতে সাংবিধানিক সরকার

গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, শাসকদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার সীমিতকরণ এবং আইনের অনুশাসনের ধ্যানধারণা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মের সার্বিক মহত্ত্বের ধারণার সঙ্গে আইনের শাসন বা সীমাবদ্ধ সরকাবের এই ধারণার প্রায় কোনও পার্থক্যই ছিল না। প্রাচীন ভারতের শাসকগণ ধর্ম মেনে চলতে বাধ্য থাকতেন, ধর্মের উর্ধ্বে কেউ ছিলেন না। প্রজাতান্ত্রিক সরকার, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা বা স্থানীয় স্বশাসিত সংগঠনের অস্তিত্ব যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গণতান্ত্রিক চেতনা ও আচরণ বৈদিক যুগ থেকেই জনজীবনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঋগবেদ এবং অথর্ববেদে 'সভা' (সাধারণ পরিষদ) এবং 'সমিতি'র (বয়স্কদের সভা) উল্লেখ রয়েছে। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ", কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র", "মহাভারত", অশোকস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি, ঐ সময়ের বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রসমূহ, "মনুস্মৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থে বেদ-পরবর্তী যুগের ভারতের ইতিহাসে বহু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। বিশেষ করে, মহাভারতের পরে বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ছোট ছোট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই রাষ্ট্রগুলি কীভাবে কাজ চালাত তার উল্লেখ আছে জাতক-কথায়। সদস্যরা 'সন্থাগরে' মিলিত হতো। প্রকাশ্য সভা

থেকে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতেন। তাঁরা তাঁদের 'গোপ' নির্বাচিত করতেন যিনি রাজা হতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'ক্ষুদ্রক মল্লা সংঘ' নামে পরিচিত একটি প্রজাতন্ত্র আলেকজান্ডারের অভিযানের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। লিচ্ছবিদের রাজধানী বৈশালী ছিল পাটলিপুত্রের (পাটনা) কাছে। এই রাজ্যটি ছিল প্রজাতান্ত্রিক। শাসন কাজ পরিচালনা করতেন একটি নির্বাচিত সভা এবং একজন নির্বাচিত সভাপতি যাঁকে 'নায়ক' বলা হত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রজাতন্ত্রগুলির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। দাক্ষিণাত্যের জনপ্রিয় সভাগুলি সম্পর্কে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। এই সভাগুলি রাজাদের সংযত রাখত। কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একতন্ত্রী শাসন অথবা রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারের কোনও স্থান ছিল না। ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখত ভারতীয় রাজার ক্ষমতাকে। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট ছিলেন সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-সম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। মনুর মতে, প্রজাদের উচিত অবিবেচক ও অত্যাচারী রাজাকে পাগলা কুকুরের মতো মেরে ফেলা। দশম শতাব্দীতে শুক্রাচার্য লিখিত "নীতিসার" গঠনতন্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ। কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, গ্রাম ও শহরের জীবন, রাজার পরিষদ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মত অনুসারে বাজা কাজ করতেন।

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান

পরবর্তী কালে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, নির্বাচিত রাজা, সভা, সমিতি প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি লোপ পায়। কিন্তু গ্রাম-সভা, গ্রাম-সংঘ বা পঞ্চায়েতের মতো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি বেঁচে থাকে এবং গ্রামাঞ্চলে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলিম বংশের রাজত্বকালে এই ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা বজায় ছিল।

ব্রিটিশদের আবির্ভাব (1600-1765)

ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল ব্যবসা করতে। লন্ডনের কিছু বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন 1600 সালের 31 ডিসেম্বর। তাঁরা রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ লাভ করেন, যার ফলে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে 15 বছরের জন্য একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পায় এই কোম্পানি। কোম্পানির গঠনতন্ত্র, ক্ষমতা, অধিকারের কথা এই সনদে উল্লেখ করা হয়। প্রতি বছর কোম্পানির সদস্যরা একজন গভর্নর ও 24টি এক সদস্য বিশিষ্ট

কমিটি নির্বাচিত করতেন। ইংল্যান্ডের এই 25 জনের ওপর কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাত। পরবর্তী সময়ে এই কমিটিগুলিই ডাইরেকটর হিসাবে পরিচিত হয়। এই ভাবে কোর্ট অফ ডাইরেকটর্স তৈরি হয়। কোম্পানির সুস্থ পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে, ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গভর্নর এবং কোম্পানি আইন তৈরি করতে পারত, যদিও এই ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত, কারণ ব্রিটেনের প্রচলিত আইন, রীতি ও পূর্ববর্তী নজিরের পরিপন্থী কোনও আইন তারা প্রণয়ন করতে পারত না।

পরবর্তী প্রতিটি সনদে কোম্পানির ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধি পায়। 1700 সালের মধ্যেই কোম্পানি বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে বাণিজ্যকেন্দ্র ও উপনিবেশ স্থাপন করে। 1669 সালের সনদে বোম্বাই বন্দর ও দ্বীপের দায়িত্ব কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয় বার্ষিক 10 পাউন্ড খাজনার বিনিময়ে। এরই সঙ্গে বোম্বাই অঞ্চলের শাসনকার্য ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য আইন প্রণয়ন বা হুকুম জারির ক্ষমতাও কোম্পানিকে দেওয়া হয়। এই ভাবে 1669 সালে কোম্পানি সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও সেখানকার জনগণকে শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সামান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে এরা শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। 1677 সালে কোম্পানিকে নিজের মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার অধিকার দেওয়া হয়। 1683 সালের সনদে কোম্পানিকে যুদ্ধ ঘোষণা ও চুক্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এই শর্তে যে, কোম্পানি কোনও এলাকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না। যে এলাকা কোম্পানির অধিকারে আসবে তা ব্রিটিশ রাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেখানে কোম্পানি ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে।

1726 সালের সনদে গভর্নর এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কাউন্সিলকে বিধি, উপবিধি ও অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে এগুলি অবশ্যই কোর্ট অফ ডাইরেকটর্স-এর অনুমোদন সাপেক্ষ এবং ইংল্যান্ডের প্রচলিত আইন মোতাবেক হতে হবে। 1726 সালের সনদেই তিনটি প্রেসিডেন্সিতে ইংল্যান্ডের আইন পরিষ্কারভাবে চালু করা হয় এবং মেয়রের কোর্ট স্থাপিত করা হয়।

1707 সালে আউরংজেবের মৃত্যুর পর দেশজুড়ে অস্থির অবস্থা, মোগল সাম্রাজ্যের বিভাজন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগে কোম্পানি প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। 1757 সালে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার বিরুদ্ধে পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির জয় ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে।

1764 সালে বক্সার যুদ্ধে মোগল সম্রাট শাহ্ আলম এবং অযোধ্যা ও বাংলার নবাবের সম্মিলিত শক্তিকে কোম্পানি পরাজিত করে। এর ফলে সুবে বাংলার পূর্ণ

কর্তৃত্ব ইংরেজের হাতে যায়। 1765 সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি কোম্পানির হাতে তুলে দেন শাহ্ আলম। এর ফলে জমির খাজনা আদায় ও দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার পূর্ণ অধিকার কোম্পানির করায়ত্ব হয়। প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব নবাবের হাতে থাকে। 1765-1772 সাল পর্যন্ত এই দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। এই সময় চরম অরাজকতা দেখা দেয় এবং এরই পরিণতিতে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করে। কমিটি কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সুপারিশ করে। চালু হয় রেগুলেটিং অ্যাক্ট, 1773।

কোম্পানি শাসন (1773-1858)

রেগুলেটিং অ্যাক্ট 1773 ঃ ভারতের সংবিধানের ইতিহাসে এই আইন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতে কোম্পানি প্রশাসনকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় এই আইনে। এর ফলে কোম্পানির শাসনভুক্ত এলাকার প্রশাসন বণিকদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসে। 1773 সালের নিয়ন্ত্রণ আইন সর্বপ্রথম ভারতে কোম্পানি শাসনের একটি লিখিত সংবিধান উপস্থিত করে এবং কোম্পানির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এই আইন সম্ভবত ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সংহত এবং প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করার প্রথম ধাপ। এই আইন অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় কলকাতায়। পূর্বতন তিনটি স্বাধীন ও পৃথক প্রেসিডেন্সিকে বাংলার গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়; 4 জনকে গর্ভনর জেনারেলের পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়; আর ইংল্যান্ডের কোর্ট অফ ডাইরেকটর্স-এর মৌলিক সংস্কার করা হয়।

পিট্স ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ঃ বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে 1773 সালের আইনে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। 1781 সালের সংশোধনী আইনে এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়। যাই হোক, পরবর্তী কালের গুরুত্বপূর্ণ আইনটি পিট্স ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1784 নামে পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেকটর্স-এর হাতে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব থাকল। রাজনৈতিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 6 সদস্যের একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল গঠন করল। ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক, অসামরিক সরকারের যাবতীয় কার্যাবলী তদারক, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়।

চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ-আইন 1793 এবং 1813 ঃ এই দুই আইন অনুযায়ী কোম্পানির সনদ 20 বছর করে দুবার নবীকরণ করা হয়। 1813 আইন অবশ্য ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকারে ছেদ ঘটায়। মাদ্রাজ,

বোম্বাই, কলকাতার কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং এদের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণও বেড়ে যায়। এই কাউন্সিলগুলির জারি করা নিয়ম-কানুন ব্রিটিশ সংসদে পেশ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন 1833 ঃ এই আইনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সংবিধান রচনার প্রথম অস্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়। এই আইন গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন সভা ও প্রশাসন সংক্রান্ত সভা পৃথক করার নির্দেশ দেয়। ভারতে ব্রিটিশ অঞ্চলের সরকার পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণের আভাস এই আইনে দেখা যায়। ব্রিটিশ অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক সরকারের পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই ভাবে এই প্রথম গভর্নর জেনারেলের সরকার 'ভারত সরকার' এবং গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল 'ভারত কাউন্সিল' রূপে পরিগণিত হয়। আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বও এই আইনে চালু হয়। আইন প্রণয়নের কাজ চালাতে তিন সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলে আরও একজন আইন-সদস্য নিয়ে কাউন্সিলের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। কিছু সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হাতে ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলের আইন তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়।

চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন 1853 ঃ এটি শেষ সনদ আইন, যা ভারতের আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ রূপে বহাল থাকলেও, এর প্রকৃতি ও আকৃতির বহু পরিবর্তন করা হয়।/6 জন বিশেষ সদস্যকে কাউন্সিলে আইন প্রণয়ন করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাউন্সিলের আইন-কানুন ও নির্দেশাবলী তৈরি করার উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র তাঁরা সভায় যোগ দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। অন্য সময় কাউন্সিলের সভায় যোগ দেওয়ার বা ভোট দেওয়ার অধিকার এঁদের ছিল না। এঁদের আইন প্রণয়নকারী কাউন্সিলর বলা হত। গভর্নর জেনারেল, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা ও আগ্রার স্থানীয় সরকার সমূহের 4 জন প্রতিনিধি সহ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 12 জন। আইন প্রণয়নের কাজ প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হল। এই আইনের 23 ধারায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে একমাত্র গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভাতেই আইন প্রণয়ন এবং নিয়ম-কানুন তৈরি করা যাবে।

বণিক থেকে শাসক (1858-1918)

1858 সালের আইন ঃ জাঁকিয়ে বসা ব্রিটিশ শাসনের অবসান কল্পে 1857 সালের

বিদ্রোহ ছিল প্রথম সংগঠিত প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা একে সিপাহী বিদ্রোহ আর ভারতীয় ইতিহাসবিদ্‌রা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে অভিহিত করেছেন। এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার মৃত্যু-ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন গৃহীত হয়। যাকে "ভারতের সু-সরকারের জন্য আইন 1858" নামে অভিহিত করা হয়। এই আইন বলে ভারতে কোম্পানি শাসনাধীন সমস্ত এলাকা ব্রিটিশরাজের অধীনে আনা হয় এবং সরাসরি তাঁর শাসনাধীন করা হয়। 'রাজার দ্বারা এবং রাজার নামে' এই শাসন কার্য পরিচালনা করা হত একজন মুখ্য সচিবের মাধ্যমে। তাঁকে বলা হত প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ফর স্টেট (ইন্ডিয়া)। এই আইনে মূলত ইংল্যান্ড থেকে ভারত সরকারকে আরো সুসংসহত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভারতে সরকার পরিচালনার যে ব্যবস্থা ছিল তার বিশেষ কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

ভারতের কাউন্সিল আইন, 1861 ঃ শীঘ্রই সরকার প্রশাসনের নীতিগত সংস্কার এবং ভারতীয় জনমতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করল। এ জন্য সরকারের প্রস্তাবিত বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বেসরকারী ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে কাউন্সিল আইন 1861 একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দুটি কারণে এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গভর্নর জেনারেলকে ভারতীয়দের তাঁর বর্ধিত কাউন্সিলের সদস্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়নের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, কাউন্সিলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের হাতে সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

পঞ্চম সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনিক পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি করা হল। এই সদস্যকে একজন আইন-বিশেষজ্ঞ হতে হত। তা ছাড়া আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 6 থেকে 12 জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হত যার অন্তত অর্ধেক বেসরকারি ব্যক্তি। আইনে স্পষ্ট করে বলা না হলেও বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্যেও ভারতীয়দের নিযুক্ত হওয়ার কোনও বাধা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে 1862 সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং 3 জন ভারতীয়কে নবগঠিত আইন পরিষদে মনোনীত করেন। এঁরা হলেন পাতিয়ালার মহারাজা, বেনারসের রাজা ও স্যার দিনকর রাও। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পর সেবারই প্রথম আইন তৈরির কাজে ভারতীয়দের যুক্ত করা হল।

1861 সালের আইনে বহু ত্রুটি ছিল, তাছাড়া এই আইন ভারতীয়দের আশা

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। এই আইন গভর্নর জেনারেলকে সর্বশক্তিমান করে তুলেছিল। বেসরকারি সদস্যরা কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারতেন না। কোনও প্রশ্ন করা যেত না এবং বাজেট নিয়ে আলোচনা করা যেত না। দেশের আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগল। খাদ্যশস্যের চরম সংকট দেখা দিল এবং 1877 সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হল। অসন্তোষ ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। 1857 সালের বিদ্রোহের পরে যে দমন পীড়ন চালানো হয়েছিল তার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা এই অসন্তোষকে আরও তীব্র করে তোলে। ইলবার্ট বিলে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বৈষম্যগুলি তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ঃ এ. ও. হিউম নামে জনৈক ইংরেজের সভাপতিত্বে 1805 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যাত্রা শুরু হয়। 1885 সালের 28-30 ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে আইন পরিষদের সংস্কার ও প্রসারের দাবি তোলা হয়। পরবর্তী প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশন থেকে এই দাবিটি উঠতে থাকে এবং প্রতি বছর ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। পরিষদের সংস্কার, সমস্ত সংস্কারের মূল—এ কথা কংগ্রেস মনে করত। পঞ্চম অধিবেশনে (1889) এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন: "এটি পাওয়া গেলে অন্য সব কিছু পাওয়া যাবে। এর উপর নির্ভর করছে দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ এবং আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ।" 1889 সালে গৃহীত প্রস্তাবে সংস্কার এবং গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল, প্রাদেশিক আইনসভাগুলি পুনর্গঠনের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এই রূপরেখাকে বিল আকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য প্রস্তাবে বলা হয়। এই প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 21 বছরের বেশি যে সব পুরুষের বয়স সেই সব ব্রিটিশ প্রজার ভোটাধিকার দাবি করা হয়। ভোটদান প্রথা চালু করারও দাবি করা হয়।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1892 ঃ ভারতীয় জনগণকে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিষদে বক্তব্য পেশ করার অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত, ভালভাবে ভারতকে শাসন করা যাবে না—কংগ্রেস তার এই ধারণা পুনরুল্লেখ করে 1891 সালে। বর্তমান আইন মুলত কংগ্রেসের 1889-1891 সাল অবধি গৃহীত প্রস্তাবগুলি দ্বারা প্রভাবিত। 1892 সালের এই আইনে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে, কমপক্ষে 10 এবং অনধিক 16 (আগের ন্যূনতম

6 ও সর্বাধিক 12এর পরিবর্তে) করা হয়। এই ভাবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করা হয়। আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরিষদগুলি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি অথবা বাজেটের উপর আলোচনা করার অধিকার পায়। এই অধিকার অবশ্য সীমাবদ্ধ ও কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ ছিল। জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর কাউন্সিল সদস্যদের আইন মোতাবেক প্রশ্ন করার অধিকারও দেওয়া হয়। এই অধিকারও অবশ্য ছিল শর্তাধীন।

1892-এর আইন নিশ্চিত ভাবে 1861-এর আইন অপেক্ষা উন্নত ছিল। আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বমূলক উপাদান সংযোজিত হল এবং কাজের পরিধি বাড়িয়ে কিছু বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হল। কাউন্সিলে 'নির্বাচিত' প্রতিনিধিদের প্রবেশ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

স্বরাজের লক্ষ্যে ঃ 1906 সালের অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করল স্বরাজই তার লক্ষ্য। নরমপন্থীরা স্বরাজ বলতে বুঝতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত একটি সংসদীয় সরকার, আর চরমপন্থীদের কাছে স্বরাজ মানে ছিল স্বাধীনতা। জনগণের প্রকৃত কার্যকর প্রতিনিধিত্ব এবং দেশের আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিচালনায় আরও বেশি ক্ষমতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের এই অধিবেশন থেকে সত্বর আইন পরিষদগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিও করা হয়।

মিন্টো-মরলে সংস্কার ঃ জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি আর নরমপন্থীদের দেশ-শাসনে ভারতীয়দের অধিকতর ও কার্যকর প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ও ভারত-সচিব লর্ড মরলে যুগ্মভাবে কিছু সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন 1906-1908 সালের মধ্যে। এগুলিই মিন্টো-মরলে সংস্কার নামে খ্যাত। আইন পরিষদের প্রসারণ এবং তাদের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি, প্রশাসনিক পরিষদে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি, যেখানে নেই সেখানে প্রশাসনিক পরিষদ গঠন এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার আরও উন্নতি প্রভৃতি প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের কাউন্সিল আইন 1909 ঃ এই আইনে পরিষদগুলিকে আরও ব্যাপক আরও প্রতিনিধিত্বমূলক এবং আরও কার্যকর করা হল। পরিষদের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেল। ভারতীয় আইন পরিষদের (গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল) অতিরিক্ত সদস্যের সর্বাধিক সংখ্যা 16 থেকে বাড়িয়ে 60 করা হল। একসিকিউটিভ কাউন্সিলররা এই সংখ্যার বাইরে ছিলেন যেহেতু তাঁরা পদাধিকার বলে সদস্য হতেন। এই আইন নীতিগত ভাবে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন মেনে নিয়েছিল। তবে সিদ্ধান্ত হয় ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব জনগণের পক্ষে যথোপযুক্ত নয়। তাই ভারতীয় আইন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে

সদস্য বাছাইয়ের পদ্ধতি ঠিক হয় শ্রেণীসমূহ ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব। সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়নের পদ্ধতিও বজায় থাকে। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে যাদের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব নয় তা করার ব্যবস্থাও রাখা হল। পৌরসভা, জেলা ও স্থানীয় বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক সভা, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যক্তিগোষ্ঠী যেমন জমির মালিক, চা বাগিচার মালিক প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সদস্যদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হত। আইন অনুযায়ী প্রতিটি প্রাদেশিক আইন পরিষদে, বেসরকারির সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকতেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সরকারি সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থা এদেশে চালু করা হয়।

এই সংস্কারের ফলে দায়িত্বশীল সরকারের যে দাবি তা কার্যকর হল না, কারণ জনপ্রিয় সংস্কারের বৈশিষ্ট্য হতে পারে এমন কোনও ক্ষমতা এই আইন অনুযায়ী গঠিত পরিষদগুলিকে দেওয়া হয়নি।

মন্টেগুর ঘোষণা ঃ তদানীন্তন ভারত-বিষয়ক সচিব মিঃ মন্টেগু 1917 খ্রীষ্টাব্দের 20 আগস্ট হাউস অফ কমন্স-এ একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন। ঘটনাবহুল ব্রিটিশ শাসনে এই প্রথম ভারতে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

মন্টফোর্ড রিপোর্ট (1918) ঃ ভারতে সাংবিধানিক সংস্কারের উপর এই প্রতিবেদন যুগ্মভাবে পেশ করেন ভারত-বিষয়ক সচিব মিঃ মন্টেগু এবং ভারতে ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ড। 1918 সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন মন্টফোর্ড বা মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড প্রতিবেদন নামে পরিচিত।

'স্বশাসিত উপনিবেশ'-এর দাবির প্রতি কোনও মর্যাদা না দিয়ে অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এই প্রতিবেদনে সেই সব সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়, যেগুলি কংগ্রেস 1916-এর লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে ইতিপূর্বে মুসলিম লীগের কাছে মেনে নিয়েছিল, যেমন, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী। বস্তুত, কংগ্রেস ও লীগের ঐ চুক্তির ভিত্তিতেই মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় আন্দোলন ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার বিকাশ (1919-1940) ঃ

ভারত শাসন আইন 1919 ঃ চেম্‌সফোর্ড প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এই আইন তৈরি হয়। যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়,"ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার অর্জনের লক্ষ্যে স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটাতে হবে।" ব্রিটিশ পার্লামেন্টই ঠিক করবে কখন, কী ভাবে কী গতিতে সাংবিধানিক অগ্রগতি ঘটবে—ভারতের জনগণের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও এক্তিয়ার থাকবে না।

1919 সালের আইনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধিসমূহের বলে 1909 সালের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে পূর্বতন ভারতীয় আইন পরিষদের পরিবর্তে দ্বিস্তর আইনসভা চালু করা হয়— কাউন্সিল অফ স্টেট (উচ্চ কক্ষ) এবং আইন পরিষদ (নিম্ন কক্ষ)। দ্বিস্তর পরিষদীয় ব্যবস্থাকে এই ভাবে ভাগ করা হয়। মনোনীত সদস্য নিয়োগের কিছু ক্ষমতা থাকলেও প্রতিটি পরিষদে নির্বাচিতদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করা হল।

আইনে নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি থেকে সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হল। ভোটাধিকার অনেকাংশে বর্ধিত করা হল। ভোটদানের যোগ্যতা বিভিন্ন ধরণের ছিল এবং মূলত সম্প্রদায়গত সম্পর্ক, বাসস্থান ও সম্পত্তির উপর ভোটদাতার যোগ্যতা নির্ভর করত।

দ্বৈত শাসন ঃ 1919 সালের আইন অনুসারে দ্বৈত শাসনের অভিনব ব্যবস্থা 4টি বৃহৎ প্রদেশে চালু হয়। এগুলি 'গভর্নরের প্রদেশ' বলে পরিগণিত হত। প্রদেশগুলিতে অন্তত আংশিক ভাবে দায়িত্বশীল সরকার চালু করার প্রাথমিক স্তরে প্রাদেশিক সরকারের কাজের পরিধি চিহ্নিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই উদ্দেশ্যে আইনটিতে বিভিন্ন বিধি সংযোজিত করা হয় এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলি 'কেন্দ্রীয়' ও 'প্রাদেশিক'— এইভাবে বিন্যস্ত করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলি স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়, রাজস্ব ও অন্যান্য অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ নিয়মাবলীর মাধ্যমে 'কেন্দ্রীয়' ও 'প্রাদেশিক' বিষয়সমূহের বিস্তারিত শ্রেণী বিন্যাস করা হয়।

1919 সালের আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি ঃ এই আইনের নানা ত্রুটি ছিল। এই আইন 'দাযিত্বশীল সরকার'-এর দাবি পূরণ করতে পারেনি। অধিকন্তু প্রাদেশিক আইনসভাগুলি নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত নানা বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত কোনও আলোচনাই করতে পারত না। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সত্ত্বেও যদিও তাত্ত্বিকভাবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছিল সর্বোচ্চ সংস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে সক্ষম, তবুও 'পূর্বতন চরম কেন্দ্রীভূত সরকারের' পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তৈরির কোনও সদিচ্ছা ওই আইনে ছিল না। ফলে ব্রিটিশ ভারতের সংবিধান এককেন্দ্রিক রূপেই বহাল থাকল। তার উপর আবার প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। গভর্নররা প্রভুত্ব করতেন এবং আর্থিক ক্ষমতার অভাবে মন্ত্রীরা কার্যকরভাবে কোনও নীতি রূপায়িত করতে পারতেন না। মন্ত্রীরা যৌথভাবে পরিষদের কাছে দায়ী থাকতেন না এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে গভর্নরের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হতেন।

কংগ্রেস ও ভারতীয় জনমত এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেনি এবং প্রশাসনকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল করার জন্য অধিকতর সংস্কারের দাবি বাড়তেই থাকল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে কিছু আশার আলো দেখা দিল। কিন্তু 'রাউলাট বিল' নামে যা এল তা দমনমূলক ব্যবস্থার আইনি প্রস্তাব মাত্র। কুখ্যাত এই বিলের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি পাস হল। গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বরাজের জন্য শুরু হল সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন। খিলাফৎ আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ল।

সাইমন কমিশন ঃ 1919 সালের আইনে 1929 সালে একটি কমিশন গঠন করার কথা বলা ছিল। এই কমিশন আইনের কার্যকারিতা নিয়ে তদন্ত করবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করবে। প্রবল গণ অসন্তোষের মুখে ভারতীয় বিধিবদ্ধ কমিশন তথা সাইমন কমিশন দু বছর আগেই অর্থাৎ 1927 সালে গঠন করা হয়। যাই হোক, শুধুমাত্র শ্বেতকায়দের কমিটির সদস্য করায় ভারতীয়রা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন।

পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব ঃ পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে কংগ্রেস ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। কলকাতা অধিবেশনে অবশ্য এক বছরের মধ্যে স্বশাসিত উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আরও একবার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। লবণ-আইন ভাঙার ডাক দিয়ে শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

গোল টেবিল বৈঠক ও শ্বেতপত্র ঃ শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সরকার 1930 সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী কালে, এ ধরণের আরও দুটি বৈঠক হয়। তিনটি বৈঠক শেষে সরকার 1933 সালে মার্চ মাসে নতুন সংবিধানের রূপরেখা সহ একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই রূপরেখায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের বিধান রাখা হয়। কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ও প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গড়ার কথা বলা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শ্বেতপত্রে সরকারের সুপারিশ বিশদভাবে বিবেচনার জন্য দু'কক্ষের একটি যুক্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিনলিথগো এবং কমিটিতে রক্ষণশীল সদস্যরা বেশি ছিলেন। ব্রিটিশ ভারত এবং করদ রাজ্যের প্রতিনিধিদের এই কমিটির নিকট সাক্ষী হিসাবে প্রমাণাদি পেশ করার আহ্বান জানানো হয়। 1934 সালের নভেম্বর মাসে কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে জোরের সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে অন্ততপক্ষে শতকরা 50 ভাগ রাজ্য যোগ দিতে রাজি হলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে।

এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বিল তৈরি করা হয় যা 1934 সালের 19 ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে গৃহীত হওয়ার পর এই বিল রাজকীয় সম্মতি পায় 4 আগস্ট 1935 সালে। ভারত শাসন আইন 1935 নামে এই আইন পরিচিত হয়।

ভারত শাসন আইন 1935 : এই আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলিকে নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে যেখানে করদ রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে যোগ দিতে পারে। 1930 সালের গোল টেবিল বৈঠকের আগে পর্যন্ত ভারত ছিল সম্পূণ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। প্রদেশগুলির যেটুকু ক্ষমতা ছিল তা ছিল কেন্দ্রের দেওয়া। অর্থাৎ প্রদেশগুলি কেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিল। 1935 সালের আইনেই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ধারা রাখা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ নিয়েই গঠিত ছিল না, যুক্ত করা হল করদ রাজ্য ও চিফ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশগুলিকে। 1919 সালের আইনে মূল নীতি ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। এই আইনে এই প্রথমবার প্রদেশগুলির আইন-সিদ্ধ স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হল। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়েই প্রদেশগুলি নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আইনী-ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার অর্জন করল। এই আইনে বর্মাকে ভারত থেকে পৃথক করা হল এবং পৃথকভাবে উড়িষ্যা ও সিন্ধু প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। কেন্দ্রে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার কথা মনে রেখে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া 11 টি গভর্নর শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারত-সচিবের 'প্রভুত্ব, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ' থেকে সম্পূর্ণরূপে 'মুক্ত করা হয়', অর্থাৎ, 'পৃথক আইনি ব্যক্তিত্ব' প্রদেশগুলির ওপর ন্যস্ত করা হল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি প্রশাসনিক ও একটি আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হল। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে অনেক নতুন ক্ষমতা দেওয়া হল। মন্ত্রিসভাকে আইন পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ রাখা হল এবং পরিষদ অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করতে পারত। প্রশ্ন ও অতিরিক্ত সংযোজনীর মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারত আইন পরিষদ। অবশ্য ব্যয় বরাদ্দের শতকরা 80 ভাগ অনুমতি অথবা প্রত্যাখ্যানের অধিকারের বাইরে ছিল। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদ যুগ্ম তালিকা-ভূক্ত বিষয়ের ওপর আইন পাস করতে পারত। অবশ্য দ্বিমত দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রাদেশিক আইনের ওপর গুরুত্ব পেত।

1935 সালের আইনে সাংবিধানিক ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি ছিল সর্বাপেক্ষা অবাস্তবোচিত। করদ রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করেনি এবং যেহেতু "অন্তত অর্ধেক করদ রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যুক্ত হওয়ার" শর্তটি পূরণ করা যায়নি, তাই 1935 আইন অনুযায়ী 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' আর তৈরি হল না এবং ঐ আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশও প্রয়োগ করা গেল না।

ভারত শাসন আইন 1935 অনুসারে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন হয় 1937 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সাফল্য পায়। 836টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস 715টি আসন পায়। মুসলিম লীগ খুবই খারাপ ফল করে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশসমূহ, এমন কি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও। কোনও প্রদেশেই মুসলিম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠাতা পায়নি। বস্তুত, 482টি মুসলিম আসনের মধ্যে তারা মাত্র 51টি আসনে জয়ী হয়।

মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায় এবং বোম্বেতে তারা মোট আসনের প্রায় অর্ধেক পায়। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হয়। পাঞ্জাবে একতা পার্টি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়। বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে 1935-এর ভারত শাসন আইনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দেশকে একটি লিখিত সংবিধান দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এই আইন। অবশ্য ভারতীয় জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা ছিল না। তা ছাড়াও এখানে বহু ক্রটি বিচ্যুতি ছিল। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আইন বেশ কয়েকটি বিষয়ে প্রগতিশীল ছিল। বহু শতাব্দী পরে দেশের প্রশাসনে ভারতীয়রা কিছু দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আইন পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় সরকার গঠন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হতে শুরু করল এবং প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার-কে স্বীকৃতি দেওয়া হল। সময়ে সময়ে গভর্নরদের সঙ্গে মন্ত্রীদের মতবিরোধ দেখা দিত। কিন্তু গভর্নররা কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের মন্ত্রীদের কর্তব্য ও ক্ষমতায় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে খুব একটা হস্তক্ষেপ করতেন না। মন্ত্রীরাও তাঁদের দায়িত্ব পালন করতেন দক্ষতা, নিঃস্বার্থতা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে, ফলে তাঁরা সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এমন কি ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতীয় মন্ত্রীদের যোগ্যতা ও নিপুণতা দেখে বিস্মিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন।'

স্বাধীনতার পথে (1942-1947)

মাত্র দুবছরের জন্য জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী টিকে ছিল। ভারতের আইন পরিষদগুলিতে কোনও আলোচনা না করেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতকে অংশীদার করার প্রতিবাদে 1939 সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। 1940 সালে মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ক্রিপস মিশন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন এক জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে সময় ভারতীয় জনমতের সহযোগিতা পাথেয় হতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল।

সেই জন্য 1942 সালের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠানো হয়। ক্রিপ্‌স মিশন অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিভিন্ন কারণে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে ভারতকে 'স্বশাসিত উপনিবেশ'-এর মর্যাদা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণপরিষদে সংবিধান তৈরি করার ব্যাপারে ভারতীয়দের অধিকার মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অবশ্য নতুন সংবিধান গ্রহণ বা বর্জন করার সুযোগ প্রদেশগুলির ছিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগের কথা না থাকায় মুসলিম লীগ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বাতিল করে। ভারতকে টুকরো টুকরো করার আশঙ্কা আছে এবং যুদ্ধচলাকালীন ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে কার্যকর ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনও সম্ভাবনা নেই জেনে কংগ্রেস ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বাতিল করে। গান্ধীজী প্রস্তাবগুলিকে 'মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক' বা 'পোস্ট-ডেটেড চেক' বলে অভিহিত করেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন : 1942 সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধা শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ইংরেজদের ভারত ছাড়ার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1942 সালের 8 আগস্ট সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে এই দাবি অনুমোদিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, এটা 'করা অথবা মরা'র সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াভেল পরিকল্পনা : ইতিমধ্যে লর্ড লিনলিথগোর পবিবর্তে লর্ড ওয়াভেল ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ওয়াভেল পরিকল্পনায় বলা হয়, ভারতীয়দের নিজেদের তৈরি সংবিধান যত দিন না হচ্ছে তত দিন, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে ভারতীয়-করণ করা হোক। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমতা রেখে রাজনৈতিক নেতাদের কাউন্সিলে নেওয়া হোক এবং একজন করে শিখ ও দলিত প্রতিনিধিও গ্রহণ করা হোক। কাউন্সিলে অভারতীয় সদস্য হিসাবে থাকবেন ভাইসরয় ও সেনাধ্যক্ষ। যুদ্ধদপ্তর সেনাধ্যক্ষের হাতেই থাকবে কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতীয় সদস্যদের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।

সিমলা সম্মেলন : সিমলায় ভাইসরয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। 1945 সালের 25 জুন থেকে 14 জুলাই পর্যন্ত সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ব্যর্থ হয় কারণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ভারতের কথা বলেন আর মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবি আঁকড়ে থাকে।

নির্বাচন এবং ক্যাবিনেট মিশন : 1945 সালের শেষভাগে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচন অনেক পূর্বেই হওয়ার কথা ছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন শেষ হয় এপ্রিল 1946 সালে। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের

ভিত্তিতে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আর পাকিস্তান-এর দাবি নিয়ে লড়াই করে মুসলিম লীগ। ফলাফল দেখা যায় 8 টি প্রদেশে (আসাম, বিহার, বোম্বে, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ইউ পি) কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়। অবশিষ্ট তিনটি প্রদেশে কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হয়। কংগ্রেস অবশ্য অধিকাংশ আসন (102 এর মধ্যে 56) পায় কেন্দ্রীয় আইনসভায়। সাধারণ কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফল খুবই ভাল হয়, এমন কি 1937 সালের তুলনায় এই নির্বাচনে কংগ্রেস যথেষ্ট ভাল ফল করে, কিন্তু মুসলিম সংরক্ষিত কেন্দ্রে কংগ্রেস যথেষ্ট খারাপ ফল করে।

প্রাদেশিক পরিষদগুলির নির্বাচন চলাকালীন 1945 সালের 19 ফেব্রুয়ারি লর্ড পেথিক লরেন্স ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একটি বিশেষ কমিশন ভারতে যাবে এবং ভাইসরয়ের কাজে সাহায্য করবে। এই কমিশনে থাকবেন বিদেশ সচিব, বাণিজ্য-সংক্রান্ত বোর্ডের সভাপতি (স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স), নৌ দপ্তরের প্রধান (এ ভি আলেকজান্ডার)। মার্চ 1946 থেকে মে 1946 পর্যন্ত এই কমিশন ভারতে অবস্থান করে। এই মিশন পৃথক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের দাবি অবাস্তব বলে বাতিল করে দেয়। যেহেতু এই রাষ্ট্রে বহু অমুসলিম জনগণ বাস করবে এবং মুসলিম জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ এই পাকিস্তানের বাইরে অর্থাৎ ভারতে থেকে যাবে সেজন্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি বাতিল করা হয়। আবার সাংবিধানিক অসুবিধা ও বৈষম্যজনিত কারণে কংগ্রেসের শিথিল যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা নাকচ করে এই মিশন। একটি ত্রি-স্তর প্রশাসনের সুপারিশও করে এই মিশন—যার শীর্ষে থাকবে ভারত ইউনিয়ন, মধ্যে থাকবে বিভিন্ন প্রদেশসমূহ এবং নিচে থাকবে করদ রাজ্যসমূহ।

সংবিধান সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশন নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করে ঃ

1) ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন থাকা উচিত। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক, যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং এ জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা এই ইউনিয়নের হাতে থাকা উচিত।
2) এই ইউনিয়নে একটি প্রশাসনিক ও একটি আইন পরিষদ থাকা উচিত। ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই পরিষদ গঠন করতে হবে। এই পরিষদে বড় ধরণের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠলে দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের উপস্থিত সদস্যদের ভোটে এবং পরিষদের সব সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
3) ইউনিয়ন ভুক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত সমস্ত বিষয় প্রদেশের আওতায় থাকবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে প্রদেশগুলি।
4) ইউনিয়নে ন্যস্ত বিষয় ও ক্ষমতা ছাড়া করদ রাজ্যগুলি সমস্ত বিষয় ও ক্ষমতা রাখতে পারবে।
5) প্রশাসনিক ও আইন পরিষদ নিয়ে প্রদেশগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারবে এবং প্রতিটি গোষ্ঠী অভিন্ন প্রাদেশিক বিষয়গুলি ঠিক করতে পারবে।
6) ভারত ইউনিয়ন এবং গোষ্ঠীসমূহের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে কোনও প্রদেশ

তার পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সংবিধানের কোনও ধারার সংশোধনের কথা বলতে পারে, প্রাথমিক ভাবে দশ বছর অতিক্রান্ত হলে এবং তারপর প্রতি দশ বছর অন্তর।

এই প্রস্তাবগুলি করার সময় ক্যাবিনেট মিশন দ্ব্যর্থহীনভাবে জানায় যে সংবিধানের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতামত দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়, ভারতীয়রা যাতে নিজেদের জন্য সংবিধান তৈরির প্রশ্নটির সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে সেই প্রক্রিয়া চালু করাই এর উদ্দেশ্য। এই সুপারিশ প্রয়োজনীয় ছিল কারণ কমিশন উপলব্ধি করেছিল যে এটা না করা পর্যন্ত দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে সংবিধান তৈরির ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার কোন আশাই থাকবে না।

অন্তর্বর্তী সরকার ঃ 1946 সালের 24 আগস্ট প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষিত হয়। সরকারের সদস্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলি, শরৎ চন্দ্র বসু, ডঃ জন মাথাই, স্যার সাফৎ আহমেদ খান, জগজীবন রাম, সর্দার বলদেব সিং, সৈয়দ আলি জাহির, সি. এইচ. ভাবা, সি. রাজাগোপালাচারী—এঁরা সকলেই ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ভাইসরয় এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান রইলেন। পণ্ডিত নেহরু এই পরিষদের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি এবং তাঁর 11 জন সহকর্মী 1946 সালের 2 সেপ্টেম্বর শপথ নেন। এই সরকারে তিনজন মুসলিম সদস্যকেও নেওয়া হয়। মুসলিম লীগ যাতে পরবর্তী কোনও সময়েও যোগ দিতে পারে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়।

অক্টোবরের শেষ দিকে ভাইসরয় মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজি করান। সৈযদ আলি জাহির, স্যার সাফৎ আহমেদ ও শরৎ চন্দ্র বসু—এই তিনজন সদস্যকে বাদ দেওয়া হয়। মুসলিম লীগের পাঁচজন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। অর্থাৎ, মন্ত্রিসভায় শরিক হল মুসলিম লীগ।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঃ 1947 সালের মার্চ মাসে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে ভারতে পাঠানো হয়। 1947 সালের 22 মার্চ তিনি ভারতে আসেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে কাজ করতে পারবে না — তা অন্তর্বর্তী সরকার বা সংবিধান প্রস্তুতি কমিটি যা-ই হোক না কেন — এ সিদ্ধান্ত তিনি অতি সত্বর গ্রহণ করলেন। বুঝলেন ভারতীয়দের হাতে অতি সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা রোধ করা যায়। ইতিমধ্যে এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসও উপলব্ধি করেছিল যে দেশ-ভাগ অনিবার্য এবং অরাজকতা, সন্ত্রাস ও গৃহযুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র পথ। 1947 সালের 15 আগস্ট এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করলেন মাউন্টব্যাটেন এবং ভারত ভাগের একটি ছক করলেন। ব্রিটেনের বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলোচনার

পর 1947 সালের 3 জুন একটি নীতিসংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হল যা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই বিবৃতি দেশ-ভাগের অনিবার্যতা স্বীকার করল। এই পরিকল্পনায় বলা হল, বর্তমান সংবিধান সভা যে সংবিধান তৈরি করবে তা অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না এবং তারা পৃথক সংবিধান সভা চায় কি না জানার জন্য বিবৃতিতে একটি পদ্ধতির কথা বলা হল। এই পরিকল্পনার ফলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারত ও পাকিস্তান- এই দুই অংশে ভারত ভাগ হতে চলেছে।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, 1947 ঃ

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস করল ভারতীয় স্বাধীনতা বিল, 1947 :

1) দুটি স্ব-শাসিত উপনিবেশ স্থাপন করার দিন ঠিক হল 15 আগস্ট 1947।
2) ভারতের অঞ্চলকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ করা হবে। তাছাড়া পাঞ্জাব ও বাংলায় দুটি করে প্রদেশ গঠন করা হবে। যে অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে তা ব্যতীত ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত অঞ্চল নিয়ে ভারত গঠিত হবে।
3) পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং আসামের সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান।
4) ভারতে ব্রিটিশ সম্রাটের দায়-দায়িত্ব এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে 15 আগস্ট 1947-এ।
5) ভারতীয় রাজ্যগুলি যে কোনও রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে।
6) দুটি দেশে দুজন পৃথক গভর্নর জেনারেল স্ব-শাসিত উপনিবেশ শাসনের প্রশ্নে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিত্ব করবে।
7) আইন প্রণয়নের পরিপূর্ণ অধিকার সহ এবং অবশ্যই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব মুক্ত হয়ে দুই দেশে দুটি পৃথক আইনসভা হবে।
8) দুটি গণপরিষদকে অস্থায়ীভাবে সংসদের মর্যাদা দেওয়ার কথা এই আইনে বলা হয়।
9) এই বিলের কার্যকর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার গভর্নর জেনারেলকে সাময়িকভাবে দেওয়ার কথা এই বিলে উল্লেখ করা হয়।
10) পরিশেষে এই আইনে বিদেশ সচিবের কাজ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজের শর্ত নির্ধারণ করা হয় এবং ব্রিটিশ নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনীর উপর রাজকীয় সরকারের এক্তিয়ার ও অধিকার বহাল রাখার কথা বলা হয়।

14-15 আগস্ট 1947 মধ্যরাত্রে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান, দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

তিন

সংবিধানের প্রস্তুতি

গণ পরিষদ ঃ

সাধারণত জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনও সংস্থা একটি সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। সংবিধান বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য এই ধরণের নির্বাচিত সংস্থাকে গণ পরিষদ বলে।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণ পরিষদ গঠনের বিষয়টি যুক্ত ছিল। একটি গণ পরিষদ গঠনের ভাবনা, যেখানে ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের জন্য সংবিধান তৈরি করবে, 1919 সালের আইনের বিরোধিতার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। 1919 সালে মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম ভারতের জন্য গণপরিষদের কথা বলেন, যদিও কথাগুলি সরাসরি বলা হয়নি বা বিশেষ কোনও নামে চিহ্নিত করা হয়নি। 1919 সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে সিমলায় কেন্দ্রীয় আইন পবিষদের উভয় কক্ষের সদস্যদের একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান রচনার জন্য একটি সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত ঐ সভায় গৃহীত হয়। 1923 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা একই উদ্দেশ্যে দিল্লিতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলন ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত উপনিবেশ গণ্য করে সংবিধানের আবশ্যিক উপাদানগুলির একটি রূপরেখা তৈরি করে। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে 24 এপ্রিল দিল্লিতে একটি 'জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় 'কমনওয়েল্‌থ অফ ইন্ডিয়া' বিলের খসড়া তৈরি হয়। সামান্য সংশোধিত আকারে এটি 1925 সালের জানুয়ারিতে দিল্লির সর্বদলীয় সম্মেলনের কমিটির কাছে পেশ করা হয়। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। এরপর একটি খসড়া কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ও বিলটি প্রকাশ

করে। বিভিন্ন দলের 43 জন নেতার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সহ এই বিল ব্রিটেনের শ্রমিক দলের জনৈক প্রভাবশালী সদস্যের কাছে পাঠানো হয়। শ্রমিক দলে এই বিল বিপুল সমর্থন লাভ করে এবং সামান্য পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্স-এ বিলটির 'প্রথম পাঠ' করা হয় কিন্তু শ্রমিক সরকারের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলটি ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায়। তবে শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ভারতে একটি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার এটি ছিল একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা।

জাতীয় দাবির উপরে 1924 ও 1925 সালে বিখ্যাত মতিলাল নেহরু প্রস্তাব গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল, কেননা ভারতের ভবিষ্যত সংবিধান ভারতীয়রাই রচনা করুক, ক্রমবর্ধমান এই দাবির প্রতি এই প্রথম কেন্দ্রীয় পরিষদ সমর্থন জানায়।

1927 সালের নভেম্বর মাসে যখন ভারতীয় সদস্য না নিয়ে সাইমন কমিশন গঠিত হয় সে সময় এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভা থেকে বলা হয় এটি শুধুমাত্র 'জাতীয় দাবি' অস্বীকার কবা নয়, 'ভারতবাসীর প্রতি ইচ্ছাকৃত অপমান'। কারণ এর দ্বারা "ভারতীয়দের শুধুমাত্র হীনতর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করাই হয়নি" উপরন্তু "মাতৃভূমির সংবিধান রচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত কবা হয়েছে।"

ইতিপূর্বে 1927 সালের 17 মে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে মতিলাল নেহরু একটি প্রস্তাব আনেন। ঐ প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সংবিধান তৈরি করতে বলা হয়। সংশোধিত আকারে বিপুল সংখ্যাধিক্যে স্বরাজ সংবিধানের উপর গৃহীত এই প্রস্তাবই পরবর্তী কালে পরিবর্ধিত আকারে মাদ্রাজ অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু পেশ করেন। সে দিনটি ছিল 28 ডিসেম্বর 1927 সাল। বোম্বাইতে 1924 সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে সংবিধানের মূল নীতিগুলি স্থির করার জন্য মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদন, যা 1928 সালের 10 আগস্ট পেশ করা হয়, পরবর্তীকালে 'নেহরু রিপোর্ট' নামে খ্যাতি লাভ করে। এটি ছিল স্বদেশের পূর্ণাঙ্গ সংবিধানের জন্য ভারতীয়দের প্রথম প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে ক্যুপল্যান্ড বলেন, এই প্রচেষ্টা "ভরতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনমূলক নয় এই বক্তব্যের যেমন যোগ্য জবাব" তেমনই "সাম্প্রদায়িক অসুবিধাগুলির সরাসরি মুখোমুখি হওয়ার স্পষ্ট প্রচেষ্টা যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি"। এই প্রতিবেদনে সমকালীন জাতীয় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের রূপরেখার একটি খসড়া তুলে ধরা হয়। এই খসড়ার ভিত্তি ছিল স্বশাসিত মর্যাদার নীতি এবং সংসদীয় ধাঁচে পূর্ণ দায়িত্বশীল

সরকার। সার্বভৌমত্ব ও ভারতীয়দের নিজস্ব অধিকারের কথা সোচ্চারে বলার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবেদনে মৌলিক অধিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অঙ্গরাজ্যগুলির সর্বোচ্চ স্বাধিকার, অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারে অর্পণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদগুলির জন্য যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী, সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রস্তাব করা হয়।

1928 সালের নেহরু প্রতিবেদনে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার সহ ব্যাপক সংসদীয় ব্যবস্থা, বিচারযোগ্য মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে যে সব কথা বলা হয়েছিল মূলত 21 বছর পর 1949 সালের 26 নভেম্বর গৃহীত স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সেগুলিই অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর প্রকাশিত শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়। একটি সংসদীয় যুক্ত কমিটি ঐ প্রস্তাব পরীক্ষা করে বলেন: "ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ক্ষমতা মঞ্জুর করা এই মুহূর্তে বাস্তবোচিত নয়।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 1934 সালের জুন মাসে বলেন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদে গৃহীত সংবিধান শ্বেতপত্রের একমাত্র সন্তোষজনক বিকল্প হতে পারে। এই প্রথম গণপরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট দাবি তোলা হল। সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে যুক্ত সংসদীয় কমিটির (1933-34) সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি 1934 সালের 5-7 ডিসেম্বর পাটনা অধিবেশনে একটি প্রস্তাব নেয়। গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি সংবিধানই একমাত্র বিকল্প—এ কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা এবং গোল টেবিল বৈঠকে গণপরিষদ গঠনের দাবি তীব্র করে তোলে। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা। পূরণের জন্য প্রণীত 1935 সালের ভাবত শাসন আইন সূচিত হয় গোল টেবিল বৈঠকেই। 1936 সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ঘোষণা করে বহিরাগতদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া কোনও সংবিধান ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়দের ভোটে নির্বাচিত একটি গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানই ভারতীয় জনগণ গ্রহণ করতে পারে।

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস 1935 সালের ভারত শাসন আইনের বিরোধিতা ও গণপরিষদ গঠনের দাবি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে বিরাট জয়ের পর 1937 সালের 18 মার্চ দিল্লিতে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস খুব গুরুত্ব সহকারে নির্বাচকমণ্ডলীর গণপরিষদ গঠনের দাবির প্রতি সমর্থনের কথা তুলে ধরে। গণপরিষদের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি সংবিধান তৈরি করার ইচ্ছা কংগ্রেস ব্যক্ত করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই গণপরিষদ গঠন করার কথা বলা হয়। 1937 সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে

আইনসভার কংগ্রেস সদস্যদের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এই দাবির প্রতি সোচ্চার সমর্থন জানানো হয়। 1937 সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ সহ যে সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য পুনরায় গণপরিষদ গঠনের দাবি উল্লেখ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

1939 সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 14 সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণপরিষদের দাবি পুনরায় উল্লেখ করে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেয়। 19 নভেম্বর 1939 'হরিজন' পত্রিকায় 'একমাত্র পথ' নামে গান্ধীজীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি অভিমত দেন, "জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত সম্পূর্ণ দেশজ একটি সংবিধান একমাত্র গণপরিষদই তৈরি করতে পারে।" তিনি ঘোষণা করেন সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যার সঠিক সমাধানের একমাত্র পথ গণপরিষদ গঠন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি সহ পরোক্ষভাবে হলেও 1940 সালের "আগস্ট প্রস্তাবের" মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার এই প্রথম সরকারিভাবে গণপরিষদের দাবি অনুমোদন করে। ক্রিপ্‌স প্রস্তাব অবশ্য আগস্ট প্রস্তাবের চাইতে উন্নততর, কেন না এ সংবিধান তৈরি করার ভার এখানে আর প্রাথমিক ভাবে নয়, পরিপূর্ণ ভাবে ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবিত সংবিধান প্রস্তুতি কমিটি যে সংবিধান গঠন করবে, ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর 1945 সালের মে মাসে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

জুলাই মাসে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এল। 1945 সালের 19 সেপ্টেম্বর লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় নীতি ঘোষণা করে বলেন, তাঁর সরকার যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধান প্রস্তুতি সভা আহ্বান করবেন। লর্ড ওয়াভেল 1943 সালে লর্ড লিন্‌লিথগোর পরিবর্তে ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন।

ক্যাবিনেট মিশন বুঝতে পারে সংবিধান তৈরির জন্য সবচেয়ে ভাল পন্থা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে গণপরিষদ গঠন করা। কিন্তু এর জন্য যে বিলম্ব হবে তা মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। তাই "সাম্প্রতিক নির্বাচনে গঠিত প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে এ কাজে ব্যবহার করা একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা" বলে তাদের মনে হয়। তাদের ভাষায় এটি "সবচেয়ে ভাল ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা"। এই পরিস্থিতিতে মিশন সুপারিশ করে, সংবিধান প্রস্তুতি সভায় প্রদেশগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে মোটামুটি ভাবে প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসীর একজন প্রতিনিধি থাকবেন। এইভাবে প্রদেশগুলির জন্য বরাদ্দ আসন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করা হবে। শিখ, মুসলিম ও সাধারণ—মোটামুটি এই তিন ভাগে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে আসন ভাগ করার কথা বলা হয়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন প্রাদেশিক পরিষদের ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যের ভোটে।

একক বিনিময় যোগ্য আনুপাতিক ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মতোই একই ভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ঠিক করা হবে, তবে তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনার মাধ্যমে পরে ঠিক করার কথা বলা হয়। ঠিক করা হয়, গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে 385 (292 জন প্রতিনিধি 11টি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ থেকে এবং 93 জন ভারতীয় রাজ্যগুলি থেকে)। এছাড়া চিফ কমিশনার শাসিত দিল্লি, আজমীর, মারওয়ারা, কুর্গ ও ব্রিটিশ বালুচিস্তান থেকে একজন করে প্রতিনিধি গণপরিষদে যোগ দেবেন।

ক্যাবিনেট মিশন সংবিধানের একটি মূল পরিকাঠামো সুপারিশ করে এবং গণপরিষদের জন্য কিছু পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে। 1946 সালের জুলাই আগস্ট মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত প্রদেশের জন্য নির্ধারিত 296টি আসনের নির্বাচন শেষ হয়। কংগ্রেস 9টি ব্যতীত সাধারণ সবকটি আসন সহ মোট 208টি আসনে জয়ী হয়। মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত 78টি আসনের মধ্যে 73টিতে জয়ী হয়। পবিষদের দলগত অবস্থান ছিল: কংগ্রেস 204, মুসলিম লীগ 73, ইউনিওনিস্ট 1, ইউনিওনিস্ট মুসলিম 1, কৃষক প্রজা 1, ইউনিওনিস্ট তফসিল জাতি 1, তফশিল জাতি ফেডারেশন 1, শিখ (অকংগ্রেসি) 1, কমিউনিস্ট 1, নির্দল 4।

দেশভাগ ও 1947-এর 14-15 আগস্ট দেশের স্বাধীনতার পর গণপবিষদ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার বন্ধনমুক্ত হল এ কথা বলা যেতে পারে। এটি সার্বভৌম সংস্থায় পবিণত হল এবং এদেশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতার পবিপূর্ণ উত্তবাধিকারী হল। উপরন্তু তেসরা জুনের পরিকল্পনা মেনে নেওয়াতে মুসলিম লীগ সদস্যরাও সভায় যোগ দেন। বেশ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা 1947 সালের 28 এপ্রিল গণপরিষদে যোগ দেন। 1947 সালের 15 আগস্টের মধ্যে প্রায় সব রাজ্যই গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বাকি রাজ্যগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিনিধি পাঠায়।

ভারতের সমস্ত রাজ্য ও প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী, বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে গণপরিষদ বিবেচিত হল। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন সহ ভারতের জন্য তৈরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যে কোনও আইন পরিবর্তন ও বাতিল করার ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল।

নির্ধারিত দিন 1946 সালের 9 ডিসেম্বর সোমবার সকাল এগারোটার সময় গণপরিষদের সভা শুরু হয়। কয়েকদিন অধিবেশন চলার পর 1946 সালের 13ই ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুন্দর সুন্দর শব্দে রচিত এই খসড়াকে ভবিষ্যতের সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক ভারতের মুখবন্ধ বলা যায়। ঐ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামো, অবশিষ্ট

ক্ষমতা স্বশাসিত সংস্থার হাতে অর্পণ, এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়। "সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও আইনের চোখে সমতা, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনা, সংঘবদ্ধ হওয়া ও কাজ করার স্বাধীনতা" সকলের জন্য নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া শোষিত শ্রেণী ও আদিবাসী ও উপজাতিদের যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। এই ভাবেই এই প্রস্তাব গণপরিষদকে দিয়েছিল পথ নির্দেশকারী নীতি ও দর্শন, যা তাদের সংবিধান তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। 1947 সালের 22 জানুয়ারী এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

সংবিধান প্রণয়ন

সংবিধান তৈরির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য গণপরিষদ বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করে, যেমন কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিষয়ক কমিটি, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, সংখ্যালঘু কমিটি প্রভৃতি। এর মধ্যে কয়েকটির নেতৃত্বে ছিলেন নেহরু অথবা প্যাটেল। সংবিধানের মূলনীতিগুলি প্রণয়নের জন্য নেহরু ও প্যাটেলের প্রশংসা করেন গণপরিষদের সভাপতি। কঠোর পরিশ্রম, সুশৃঙ্খল মনোভাব নিয়ে কমিটিগুলি মূল্যবান প্রতিবেদন তৈরি করে। মৌলিক অধিকার, কেন্দ্রীয় সংবিধান, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, প্রাদেশিক সংবিধান, সংখ্যালঘু, তফসিলী অঞ্চল, তফসিলী উপজাতি প্রভৃতি কমিটির প্রতিবেদনসমূহ গণপরিষদের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ সভায় আলোচিত হয়। অন্যান্য কমিটির সুপারিশগুলি পরবর্তী সময়ে খসড়া কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়।

সংবিধানের প্রথম খসড়া তৈরি করে পরিষদ অফিসের উপদেষ্টা শাখা 1947 সালের অক্টোবর মাসে। এই খসড়া প্রস্তুতির আগে ব্যাপক পরিমাণে কাগজ-পত্র সংগৃহীত হয় এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে তা পাঠানো হয় তিন সিরিজে "সংবিধানের নজির" নামে, যার মধ্যে ছিল প্রায় 80টি দেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি। 1947 সালের 28 আগস্ট গণপরিষদ ডঃ বি আর অম্বেদকরকে খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্ব এবং সভার সিদ্ধান্তানুসারে সাংবিধানিক উপদেষ্টা কর্তৃক প্রণীত ভারতের সংবিধানকে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব প্রদান করে।

খসড়া কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ভারতের সংবিধানের খসড়া 1948 সালের 21 ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের সভাপতির কাছে পেশ করা হয়। বহু প্রস্তাব, মন্তব্য, সমালোচনা এবং সুপারিশ সংশোধনের জন্য গৃহীত হয় ও খসড়া কমিটিতে বিবেচিত হয়। সমস্ত প্রাপ্ত মন্তব্য, সমালোচনা, সুপারিশ এবং সে সম্পর্কে খসড়া কমিটির মতামত বিশ্লেষণ করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এই বিশেষ কমিটির প্রস্তাবগুলি পুনরায় খসড়া কমিটিতে আসে এবং বেশ কিছু সংশোধনী

গৃহীত হয়। খসড়া কমিটি আলোচনার সুবিধার্থে সংশোধিত খসড়া সংবিধান পুনরায় ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 1948 সালের 28 অক্টোবর গণপরিষদের সভাপতির কাছে সেই খসড়া পেশ করা হয়। 4 নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করার সময় ডঃ অম্বেদকর সাধারণ ভাবে কিছু সমালোচনার জবাব দেন। 'সংবিধানের খসড়াটিতে মৌলিকত্ব খুব সামান্যই আছে' এই সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন ঃ

বিশ্ব ইতিহাসের বর্তমান সময়ে প্রণীত কোনও সংবিধানে নতুন কিছু থাকতে পারে কি না এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করতে পারেন। প্রথম লিখিত সংবিধান তৈরি হওয়ার পর একশো বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে। বহু দেশ নিজেদের লিখিত সংবিধান তৈরি করার সময় এই সংবিধানকে অনুসরণ করেছে। সংবিধানের উদ্দেশ্য অনেক পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সংবিধানের মৌলিক উপাদানগুলি সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। এই তথ্যানুসারে সমস্ত সংবিধানের মূল ধারাগুলি একই রকম হতে বাধ্য। বহু বিলম্বে রচিত সংবিধানে নতুন কিছু যদি থাকে তা হল ত্রুটি দূর করার জন্য পরিবর্তন অথবা কোনও দেশের বিশেষ প্রয়োজন মতো ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, অন্য দেশের সংবিধানের অন্ধ অনুকরণ, এই অভিযোগের ভিত্তি হল আমাদের সংবিধানটি মনোযোগ সহকারে না পড়া।

ভারত শাসন আইন 1935-এর বেশ কিছু অংশ খসড়া সংবিধানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এই অভিযোগের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি না। ভাল কিছু গ্রহণ করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, নেই কোনও চৌর্যাপরাধ। একটি সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলি কারও সংরক্ষিত সম্পত্তি নয়।

1948 সালের 15 নভেম্বর থেকে 1949 সালের 17 অক্টোবর পর্যন্ত গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের প্রতিটি ধারা ধরে আলোচনা হয়। সবশেষে গৃহীত হয় প্রস্তাবনা অংশটি। এরপর খসড়া কমিটি আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি পাশ করায় চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেন এবং তা গণপরিষদে পেশ করেন।

সংবিধানের দ্বিতীয় পাঠ 1949 সালের নভেম্বরে শেষ হয়। পরের দিনই সভা তৃতীয় পাঠ শুরু করে ডঃ অম্বেদকরের "গণপরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত সংবিধান গ্রহণ করা হোক" এই প্রস্তাব সহ। 1949 সালের 26 নভেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐদিন ভারতের জনগণ গণপরিষদে গৃহীত আইনানুগ সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান নিজেদের উপহার দিলেন। সংবিধান তৈরির মতো ব্যাপক ও দুরূহ কাজ গণপরিষদ তিন বছরের কম সময়ে শেষ করলেন।

সংবিধান গ্রহণ করাটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর এবং গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 25 ও 26 নভেম্বর গণপরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় সতর্ক ও বিচক্ষণ বক্তব্য রাখেন। ডঃ অম্বেদকর বলেন ঃ

"আমি মনে করি বদ লোকের হাতে পড়লে একটি ভাল সংবিধান নষ্ট হয়ে যাবে। আবার

একটি সংবিধান যত বাজেই হোক কিছু ভাল লোকের তত্ত্বাবধানে থাকলে তা ভাল বলে মনে হতে পারে। সংবিধানের প্রকৃতির ওপর পুরোপুরি ভাবে সংবিধানের প্রয়োগ নির্ভর করে না। সংবিধান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন—আইনসভা, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে পারে। যে সমস্ত বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ নির্ভরশীল তা হল জনগণ ও রাজনৈতিক দল, যা জনগণ সৃষ্টি করে তাদের ইচ্ছা ও রাজনীতিকে রূপায়ণের হাতিয়ার হিসাবে। ভারতের জনগণ এবং তাদের দলগুলি কেমন আচরণ করবে কে বলতে পারে?

জাতিভেদ ও ধর্মান্ধতার মতো পুরনো শত্রু ছাড়াও আমরা পরস্পরবিরোধী বহু রাজনৈতিক দল পেতে চলেছি। ভারতীয়রা দেশের উর্ধ্বে নিজের স্বার্থকে রাখবে, না দেশকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে রাখবে তা আমি জানি না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে রাজনৈতিক দলগুলি যদি দেশের উর্ধ্বে দলীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেয় তবে আমাদের স্বাধীনতা দ্বিতীয়বারের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে যাবে। এই পরিণতির বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

সমাপ্তি ভাষণে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, মোটের ওপর একটা ভাল সংবিধান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আশা করেন এর দ্বারা দেশকে ভালভাবে সেবা করা যাবে। কিন্তু তিনি আরও বলেন ঃ

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ্য চরিত্রবান ও সৎ হলে একটি ত্রুটিপূর্ণ সংবিধানকে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে যদি এগুলির অভাব থাকে তা হলে সংবিধান দেশকে কোনও সাহায্যই করতে পারবে না। একটি সংবিধান যন্ত্রের মতো প্রাণহীন। যাঁরা একে ব্যবহার করেন, কাজে লাগান তাঁদের জন্যই সংবিধান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আজ ভারতের দরকার একদল সৎ মানুষ, যাঁদের কাছে দেশের স্বার্থই সব কিছুর উর্ধ্বে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ঐক্যবিনষ্টকারী প্রবণতা আছে। আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ, জাতি ভেদ, ভাষাগত ভেদাভেদ, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি আছে। তাই প্রয়োজন হল দৃঢ় চরিত্রের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ—যাঁরা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও এলাকাব জন্য দেশের স্বার্থগুলি বিসর্জন দেবেন না, বিরোধ বিভেদ সঞ্জাত সংস্কারের উর্ধ্বে যাঁরা উঠতে পারবেন। আমরা শুধু এটুকু আশা করতে পারি যে এদেশে এমন মানুষের সংখ্যা অসীম।

গণ পরিষদের শেষ দিনে 1950 সালের 24 জানুয়ারী সদস্যবৃন্দ সংবিধানে তাঁদের স্বাক্ষর দিলেন। প্রাজ্ঞ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আমাদের সংবিধানের প্রধান স্থপতি। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কিছু বিচারপতি, মহান দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপরিষদ ঐ সময় অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র পেত এমন কল্পনা করা কষ্টকর।

স্বাধীনতার পর যে সমস্ত সংস্থাকে আমরা বজায় রাখলাম বা সংবিধানে সৃষ্টি করলাম সেই সংস্থাগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে ভারতের মাটিতেই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়েছে এবং যাদের কাজ-কর্মের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন সেই সমস্ত পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ভিত্তি করেই নতুন সংস্থা তৈরি করতে সংবিধান প্রণেতারা আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজ শাসনকে প্রত্যাখ্যান করলেও

সংবিধান ইংরেজ শাসনকালে গড়ে ওঠা সংস্থাগুলিকে বাতিল করেনি। এই অর্থে আমাদের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত নয়।

তাছাড়া সংবিধান তৈরি এবং প্রতিষ্ঠান গড়া একটি সক্রিয় পদ্ধতি। 1949 সালের 26 নভেম্বর যখন ভারতের জনগণ তাদের গণ পরিষদে "সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ ও অর্পণ করেন" তখনই সেই পদ্ধতি শেষ হয়ে যায়নি। এমন কি 1950 সালের 26 জানুয়ারি, যে দিন থেকে সংবিধান কার্যকর হয়, সেদিন থেকেই এর কাজের ধারা প্রসারিত হয় বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে। ভাল বা মন্দ যা-ই হোক না কেন সংবিধানের বিকাশ ঘটছেই এবং নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়ে চলেছে।

সংবিধান তৈরি করা ছাড়াও গণ পরিষদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল—যেমন, জাতীয় পতাকা গ্রহণ করা, জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা, কমনওয়েলথের সদস্য পদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা, এবং কয়েকটি অপরিহার্য সংবিধি গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

চার

সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নানা দিক থেকে ভারতের সংবিধান অভিনব। অনেক বৈশিষ্ট্য আছে ভাবতের সংবিধানে। আর এই বৈশিষ্ট্যই তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

সংবিধানের আয়তন ঃ
পৃথিবীর যে কোনও দেশের সংবিধানের তুলনায় ভারতের সংবিধান অনেক বড়। বিভিন্ন বিষয়ে বিশদে লেখা আছে এখানে। এমন কি, যে বিষয়গুলি সাধারণ আইন বা প্রশাসনিক নির্দেশের আওতায় পড়ে তারও উল্লেখ আছে ভারতের সংবিধানে। এমন হওয়ার কারণ, 1935 সালের ভারত শাসন আইনের মতো একটি বিধিবদ্ধ আইনকে আশ্রয় করে সংবিধানের কাজ শুরু হয়। এই আইনের অনেক অংশও সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু বিষয়কে সংবিধান প্রণেতারা সমস্ত রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন। আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ছাড়াও প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। কিন্তু ভারতে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলি একই সংবিধানের আওতায় পড়ে। ভরতের বিশাল আয়তন, তার বৈচিত্র্য ও জটিলতার জন্য বেশ কিছু অঞ্চল ও জনসমষ্টির স্বার্থে, কিছু বিশেষ ব্যবস্থা অস্থায়ীভাবে হলেও সংবিধানে রাখতে হয়েছে। এই সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতার কথাও বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে ভারতের সংবিধানে। মার্কিন সংবিধানে এমনটি নেই, সীমাবদ্ধতা সেখানে কোর্টের রায়ে ঠিক হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্ম-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ এবং নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের সংবিধানে। আইনের এক্তিয়ারে না

পড়লেও এই নীতি ও কর্তব্যের দ্বারা রাষ্ট্র ও নাগরিকরা চালিত হবেন, এটাই আশা করা হয়।

সংবিধানের ধরন

লিখিত বা অলিখিত ঃ সংবিধান লিখিত হতে পারে—যেমনটি হল মার্কিন সংবিধান। আবার ইংল্যান্ডের সংবিধানের মতো তা অলিখিত প্রথা-নির্ভরও হতে পারে। ভারতের সংবিধান লিখিত হলেও এতে প্রথা ও রীতিনীতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনমনীয় বা নমনীয় ঃ সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি অনুযায়ী সংবিধানকে নমনীয় বা অনমনীয় বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন সহজসাধ্য নয়, সেজন্য তাদের অনমনীয় সংবিধান বলা হয়। বলা যায় আমাদের সংবিধানে এই দুই রীতি সমন্বয়ে রচিত। সংবিধানের 2, 3, 4 ও 169 অনুচ্ছেদ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অর্থাৎ সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের সমর্থনে সংশোধন করা যায়। 368 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের ব্যাপক অংশ সংশোধন কবা যায়। এজন্য প্রয়োজন হয় সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সাংসদদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করার জন্য সংসদের উভয় কক্ষের বিশেষ গরিষ্ঠতা ছাড়াও ন্যূনতম অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। গত 45 বছরে আমাদের সংবিধান 76 বার সংশোধন করা হয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে ভারতের সংবিধান অনমনীয় ধারণাটি নিতান্তই ভ্রান্ত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক ঃ সংবিধানসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আমেরিকার সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় আর যুক্তরাজ্যের সংবিধান এককেন্দ্রিক। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাজ্য সবকারগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণত একটি অনমনীয়, লিখিত সংবিধান থাকে। সংবিধান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা ভাগ করে দেবে। ফলে উভয়েই নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাগুলি ভোগ করে, যেগুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারসমূহ ছেড়ে দিতে রাজি হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি স্বাধীন সুপ্রিম কোর্ট থাকে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে।

ভারতের সংবিধানকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রপন্থী প্রবণতাসহ যুক্তরাষ্ট্রীয়

কাঠামোগত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু কার্যত এককেন্দ্রিক, স্বাভাবিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু জরুরি অবস্থার মতো বিশেষ সময়ে এককেন্দ্রিক হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রভৃতি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আসলে কোনও একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে আমাদের সংবিধানকে ফেলা যায় না, দুই ব্যবস্থার প্রভাবই আমাদের সংবিধানে পড়েছে। ভারতের সংবিধানকে এককেন্দ্রিক বলা যায় না কারণ সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক ও আইন বিষয়ক ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয় রাজ্যের ক্ষমতা ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করার জন্য অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আবার এটি সঠিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নয় কেননা কেন্দ্রের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা রাখা হয়েছে। ডঃ অম্বেদকর বলেন ঃ অনমনীয়তা ও আইনী প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুটি দুর্বল দিক। ভারতীয় ব্যবস্থা সেদিক দিয়ে অপূর্ব। এতে রয়েছে দ্বৈত ব্যবস্থা। এক নাগরিকত্ব সত্বেও সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়ে ওঠে । 249 অনুচ্ছেদের বলে কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য তালিকায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। সংবিধানের 356 ও 357 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, এই অভিযোগে কেন্দ্র যে কোনও রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। 352 থেকে 354 অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধনাকে পরিপূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক রূপে পরিবর্তন করা যায়। জরুরি অবস্থার সময়ে কেন্দ্রের প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়েও করতে পারে। এমন কি 2, 3, 4 অনুচ্ছেদ অনুসারে শুধুমাত্র সংসদের সাধারণ গরিষ্ঠতায় নতুন রাজ্য গঠন, যে কোনও রাজ্যের নাম ও সীমার পরিবর্তন করা যায়।

সংবিধানের বিশাল আয়তন, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক জটিল বৈচিত্র্যের মধ্যে এই অভিনব সংমিশ্রণের কাবণ খুঁজে পাওয়া যায়। গণপরিষদে গ্রহণের জন্য খসড়া-সংবিধান পেশ করে খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ বি আর অম্বেদকর 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দের পরিবর্তে 'রাজ্যসমূহের' একটি ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

> খসড়া কমিটি ' পরিষ্কারভাবে বলতে চায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি বা অঙ্গরাজ্যগুলির ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষমতা নেই। যুক্তরাষ্ট্র একটি ইউনিয়ন কেননা একে নষ্ট করা যায় না। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশ ও দেশের মানুষকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করা হলেও দেশটি অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণ একই উৎস থেকে উৎসারিত।

মুল সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' বা 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টই সংবিধানকে কখনও যুক্তরাষ্ট্রীয় কখনও আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় আবার কখনও দুটি বিপরীত ব্যবস্থার সমন্বয় বলেছেন। (*কেন্দ্র বনাম রাজস্থান সরকার* AIR 1977 SC 1361)।

সংসদীয় অথবা রাষ্ট্রপতি-প্রধান ব্যবস্থা :

ভারত একটি প্রজাতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বেসর্বা। সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত এবং তাঁর নামেই সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানও তিনি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো তিনি ক্ষমতাবান নন। আমাদের রাষ্ট্রপতি আসলে নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক প্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিসভার হাতে। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সংসদীয় রীতি গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকার। সেখানে ক্ষমতা ভাগ করা আছে। প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁকে অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীদের আইনসভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী করা হয়। তাঁরা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। বলা যায় সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি প্রশাসনিক বিভাগের সুস্থিতি বজায় রাখতে আগ্রহী।

আমরা ব্রিটিশ পদ্ধতি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি মনে করা ভুল। অনেক পার্থক্য ও ব্যতিক্রম আছে। যেমন ব্রিটিশ সংবিধান এককেন্দ্রিক কিন্তু আমাদের সংবিধান মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয়। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রে বংশানুক্রমিক রাজা আছেন, আমাদের প্রজাতন্ত্রে আছেন নির্বাচিত বাষ্ট্রপতি। ব্রিটিশদের লিখিত সংবিধান নেই, যা আমাদের আছে। সেজন্য আমাদের সংসদ সার্বভৌম নয়, সংসদে গৃহীত আইন বিচার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ। আমাদের সংবিধান মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছে। শুধুমাত্র প্রশাসন নয়, আইনসভার বিরুদ্ধেও এই অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়। ইংল্যান্ডে এমন কোনও রীতি নেই।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ভাল, এমন একটা অভিমত আমাদের দেশে চালু আছে। সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য সংসদীয় ব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দেন, কারণ তাঁরা এই নীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাও ছিল। স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনিক প্রধান সংবিধানের জন্য নয়, দায়িত্বশীল সরকারের জন্যই দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা। সেজন্য নির্দিষ্ট মেয়াদী এবং অপসারণ করা প্রায়-অসম্ভব এমন রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ভারতে বহু-ভাষী সমাজ, বিশাল আয়তন, নানান বৈচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের টানা-পোড়েন আছে। তাই তাঁরা মনে করতেন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সংসদীয় প্রথাই সর্বোত্তম।

সংসদীয় সার্বভৌমত্ব বনাম বিচার বিভাগীয় আধিপত্য :

ইংল্যান্ডের সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদই প্রধান এবং সার্বভৌম। তত্ত্বগতভাবে অন্তত

সংসদের ক্ষমতা সীমাহীন। সেখানে লিখিত সংবিধান নেই, নেই আইনসভার উপর বিচার বিভাগের খবরদারি। বিচার বিভাগ সংসদে গৃহীত আইনের পর্যালোচনা করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট (প্রধান ধর্মাধিকরণ) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধিকার ভোগ করেন। প্রয়োজনে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখে। সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টই প্রধান।

ভারতের সংবিধান মধ্যপন্থা নিয়েছে। ব্রিটিশ সংসদের সার্বভৌমত্ব ও আমেরিকার বিচার বিভাগীয় আধিপত্যের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে ভারতের সংবিধানে। আমাদের লিখিত সংবিধানে প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। কারোর পক্ষে, এমন কি সংসদের পক্ষেও সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার সুযোগ নেই। নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়েই সর্বোচ্চ। সুপ্রিম কোর্ট সংসদে গৃহীত যে কোনও আইনকে সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিতে পারেন। আবার কিছু বিধি নিষেধ সত্ত্বেও সংসদ সংবিধানের অধিকাংশ সংশোধন করতে পাবে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ঃ

গণপরিষদে ডঃ অম্বেদকর বলেন ঃ "সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে আমবা একজনের একটি ভোটই বুঝি।" প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংবিধান প্রণেতাবা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে মত দেন। কোনও রকম পার্থক্য ব্যতিরেকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের ভোটাধিকার স্বীকৃত। ব্যাপক দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যময়। পশ্চিমী উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে কয়েক দফায়।

মৌলিক অধিকারের সনদ ঃ

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতারা জনগণের জন্য স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো মানবিক অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের বিশেষ সমস্যার জন্য ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি সংবিধানে উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে গৃহীত মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের পক্ষেও অলঙ্ঘনীয়। কোনও নাগরিকের স্বাধীনতা খর্ব করে কোনও আইন চালু হলে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে তার বৈধতা নিয়ে মামলা করা যায়। সংবিধানে এ বিষয়ে কোনও বিধি নিষেধের উল্লেখ না থাকলে ওই আইন বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ সংবিধান মৌলিক অধিকার প্রয়োগের প্রথা পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মার্কিন সংবিধান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মৌলিক অধিকারের কথা বলেছে কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত অধিকারের কোনও উল্লেখ নেই। কারণ একজনের ব্যক্তিগত অধিকার অন্যের ব্যক্তিগত অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে তার ন্যায্যতা বিচার করেন মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য নির্দিষ্ট পরিসরেই বিধি নিষেধগুলিও

উল্লেখ করেছেন। আর সেজন্য ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে আমাদের সংবিধানে।

নির্দেশাত্মক নীতি ঃ

আইরিশ সংবিধানের মতো ভারতের সংবিধানেও নির্দেশাত্মক নীতি গৃহীত হয়েছে। জনগণের আর্থ-সামাজিক অধিকারেব অধিকাংশই এই অভিনব নীতির অন্তর্গত। বিচারযোগ্য নয় তবুও এই নীতিগুলি দেশ শাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন বিভাগ সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করার আগেই সংবিধান প্রণেতারা আদর্শ নীতি হিসাবে এগুলি গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র আইনসভায় নয় বিচারালয়েও নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

নাগরিকত্ব ঃ

পরিপূর্ণ ভারতীয় ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও সংবিধান প্রণেতারা একক নাগরিকত্বের সুপারিশ করেছিলেন। আমেরিকাব মতো কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির জন্য আলাদা নাগরিকত্বেব রীতি আমাদেব এখানে নেই। কাশ্মীর এবং উপজাতি অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র দেশের সর্বত্র প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান।

মৌলিক কর্তব্য ঃ

1976 সালে 42 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে একটি নতুন অংশ 'মৌলিক কর্তব্য' শিরোনামে সংবিধানে গৃহীত হয়। এই অংশে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যতিবেকে কোনও অধিকার অটুট থাকে না এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত নাগরিকদের অধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয হল নাগরিকদেব মৌলিক কর্তব্যের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, আমরা আজও তা করে উঠতে পারিনি।

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ঃ

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সহ স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে গ্রহণ কবা হয়েছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে এক অভিন্ন বিচার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য, ফৌজদাবি ও দেওয়ানি, এমন কি সাংবিধানিক সমস্ত আইন এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। আমেরিকার মতো কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে ভিন্ন বিচার ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই। বিভিন্ন আদালতের সমন্বয়ে গোটা বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এটা নাগরিক অধিকারের ধারক ও বাহকই শুধু নয় বিভিন্ন বিষয়ে সালিশি করা এবং সময়ে সময়ে সংবিধানের ব্যাখা করাও বিচার বিভাগের কাজ। সুপ্রিম

কোর্টের রায় এদেশে বিচারের শেষ কথা। অন্তঃরাজ্য বিরোধ সহ্ কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধেও সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা করে থাকে।

উপসংহার ঃ

ভারতের সংবিধান অত্যন্ত সুসংবদ্ধ একটি দলিল। নানা দিক থেকে এই্ সংবিধান অভিনব। কোনও নির্দিষ্ট ধাঁচে এই্ সংবিধানকে ফেলা যায় না। একই্ সঙ্গে তা কঠিন এবং নমনীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক, রাষ্ট্রপতি-প্রধান ও সংসদীয়। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও জনগণের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সহ্ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এই্ সংবিধান। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ও বিচার বিভাগীয় আধিপত্যের মধ্যে এটি সমন্বয় রক্ষা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে গৃহীত সংবিধান বাতিল এবং বিলীন হয়ে গেলেও, আমাদের সংবিধান সার্থকভাবে অনেক সংকট কাটিয়ে উঠেছে। এই্ ঘটনা আমাদেব সংবিধানের গতিময়তা, ব্যাপ্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার নির্দশন।

পাঁচ

প্রস্তাবনা

সংবিধানের মৌলিকতা ও দর্শন

আশা কবা যায় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যেই তার মূল্যবোধ ও দর্শন প্রতিফলিত হবে এবং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় আনতে চান, তার উল্লেখ থাকবে।

গণপরিষদে গৃহীত আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ‘‘আমরা ভারতের জনগণ’’ সব নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতার ব্যবস্থা করে এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটিয়ে ভারতকে একটি ‘সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে’ পরিণত করার সঙ্কল্প করছি। ন্যায়বিচারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, স্বাধীনতা বলতে চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা বোঝানো হয়েছে, এবং সমতা বলতে মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে।

কার্যত, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ হল ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এই বনিয়াদই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। চরম লক্ষ্য হল ‘‘ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত কবা।’’ অর্থাৎ, প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ‘ভারতের জনগণ’ই সংবিধানের মূল প্রেরণা শক্তি, ভারতীয় রাজনীতিতে সার্বভৌমত্ব জনগণের উপরেই ন্যস্ত, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং জাতির ঐক্য সুনিশ্চিত।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই প্রস্তাবনায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যার আর্নেস্ট বেকার এই প্রস্তাবনা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের মুখবন্ধে তিনি এই প্রস্তাবনা উদ্ধৃত করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এটি পড়েই তাঁর কাজের মূল প্রতিপাদ্যটি সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তিনি বলেন, "পড়ার সময় আমার মনে হল তাঁর পুস্তক সম্পর্কিত যুক্তিসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে আছে। ফলে মূল বক্তব্য হিসাবে একে ব্যবহার করা যায়।"

বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করেছেন, সংবিধান প্রণেতাদের মনের চাবিকাঠি হল এই প্রস্তাবনা। সংবিধানের বিশেষ কোনও শব্দ অস্পষ্ট বা হেঁয়ালি মনে হলে প্রণেতারা কী বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় প্রস্তাবনার সাহায্যে। জানা যায় একটি বিশেষ শব্দ কোন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে—ব্যাপক অথবা সঙ্কীর্ণ অর্থে। তৎসত্ত্বেও বিচারপতি গজেন্দ্র গডকর বলেন, প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। তা ছাড়া আইনসভা অথবা রাষ্ট্রের অন্য কোনও সংস্থাকে প্রস্তাবনা বিশেষ কোনও ক্ষমতা অর্পণ করে না। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় প্রস্তাবনার মূল কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান রাজ্যের মামলায় বিচারপতি মাধোলকর বলেন, প্রস্তাবনা "বিশেষভাবে বিবেচনা প্রসূত", "অগ্রগতি সূচক" এবং "সংবিধান প্রণেতারা এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।" সংবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্তসার হল প্রস্তাবনা। অন্য ভাবে বলা যায় প্রস্তাবনায় যে ধারণার কথা বলা হয়েছে, তার প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সংবিধানে। সুপ্রিম কোর্টের আগের রায়, যেখানে বলা হয়েছে, প্রস্তাবনা সংবিধানের অঙ্গ নয়, সেটি পুনরায় বিবেচনা করা উচিত। বিচারপতি হিদায়েতুল্লা প্রস্তাবনাকে সংবিধানের সহায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সংবিধান প্রণেতাদের যে ইচ্ছা প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি অনুভূত হয়েছে।

গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় বিচারপতি হিদায়েতুল্লা বলেন, সরকার কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাজ করবেন তার উল্লেখ আছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। প্রস্তাবনা হল সংবিধানের প্রাণস্বরূপ, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের কিছু মৌলিক প্রশ্নে আমাদের মত ও বিশ্বাসই হল আমাদের প্রস্তাবনা—যে মানদণ্ড থেকে আমাদের কখনও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়, যে দায়িত্ব আমাদের কখনও ঝেড়ে ফেলা উচিত নয়।

পরবর্তীকালে *ভারতী চন্দ্র ভবন বনাম মহীশূর রাজ্য* মামলায় (AIR 1970 SC 2042) সুপ্রিম কোর্ট বলেন প্রস্তাবনায় যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার

পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের পরিধি আরও ভালভাবে বোঝা যেতে পারে।

মনে হয় বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এটা অনুধাবন করতে পারেননি যে আমাদের সংবিধানের যে কোনও অংশের মতো প্রস্তাবনাও গণপরিষদে আলোচিত হয়েছে, বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে এবং এর সঙ্গে কোনও আইনসভায় আলোচিত হয়নি এমন আইনের প্রস্তাবনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রস্তাবনাটি চূড়ান্ত ভোটে দেওয়ার সময় গণপরিষদের সভাপতি বলেন, "প্রস্তাবনা সংবিধানের অঙ্গ কি না এটাই প্রশ্ন"। যথোপযুক্তভাবে সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী সময়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় অধিকাংশ বিচারপতি গণপরিষদের বিতর্কের উল্লেখ করে রায় দেন যে, প্রস্তাবনা সংবিধানেরই অঙ্গ। বিচারপতি সিক্রি বলেন সংবিধানের প্রস্তাবনার আইনগত ইতিহাস এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রস্তাবনা শুধুমাত্র সংবিধানের অঙ্গ নয়, এই অংশ "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রস্তাবনার মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংবিধানের ব্যাখ্যা করা উচিত।" 368 অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রস্তাবনা ও সংবিধানে উল্লিখিত ভাবধারার নিরিখে সংবিধানের যে কোনও ধারাকে সংশোধন করা যায়। কার্যত, সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য মুল উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায় প্রস্তাবনায় উল্লিখিত শব্দগুলির মধ্যে, আর এ কথাও ঠিক যে সংবিধানের মূল উপাদানগুলির পরিবর্তন করে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। যদিও মুল উপাদানগুলি কী তার বিশদ কোনও ব্যাখ্যা কোথাও দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত শব্দগুলি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহামান্য আদালতের ভাষায় "আমাদের সংবিধানের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে প্রস্তাবনার মূল উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে। এই উপাদানগুলির কোনও একটিকে সরিয়ে ফেললে পরিকাঠামো ধসে যাবে এবং সেই একই সংবিধান থাকবে না। সংবিধান তার পরিচিতি হারাবে। অর্থাৎ, সংবিধানের মূল উপাদান বা বৈশিষ্ট্য যা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে তা 368 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশে বি জে পি সরকারের বরখাস্ত হওয়ার বিষয়ে এস আর. বোম্মাই মামলাটিতে বিচারক রামস্বামী অভিমত প্রকাশ করেন ঃ

> প্রস্তাবনাটি সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতান্ত্রিক সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, দেশের ঐক্য-সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনি পর্যালোচনা—এগুলি হল সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

যদিও প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অলঙ্ঘনীয় অঙ্গ বলে বর্তমানে মনে করা হয়, তাহলেও এ কথা ঠিক যে প্রস্তাবনা কোনও ক্ষমতার উৎস নয়, নয় কোনও সীমাবদ্ধতা। বেরুবাড়ি মামলায় প্রথম এই মূল্যায়ন করার পর *ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজনারায়ণ* মামলায় (AIR 1975 SC 2291) বিচারপতি ম্যাথু একই মন্তব্য করেন।

জরুরি অবস্থার সময় 1976-এর 42 তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দ দুটি যোগ করা হয়। তাছাড়া "জাতির ঐক্য" সংশোধন করে "জাতির ঐক্য ও সংহতি" লেখা হয়। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় এই বিশেষণগুলি ব্যাখ্যামূলক এবং রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও পরিবর্তন বহন করে না, কারণ আইন প্রণয়নকারীরা মনে করেন সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির কথা প্রস্তাবনাতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং সংবিধানের অন্যত্রও এর উল্লেখ রয়েছে।

সংবিধানের জনকরা যা বিশ্বাস করতেন, প্রজাতন্ত্রের মানুষকে যার ভিত্তিতে তাঁরা উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন এবং যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মকে পথ দেখাবে বলে তাঁরা আশা করতেন, সংবিধানের সেই মৌলিক সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলি, 42 তম সংবিধান সংশোধনের পর যা দাঁড়াল, তা হল সার্বভৌমত্ব, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ব্যক্তির মর্যাদা, জাতির ঐক্য ও সংহতি।

সার্বভৌমত্ব

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে সার্বভৌমত্ব হল সর্বোচ্চ ক্ষমতা যা কখনও ভিতর বা বাইরের কোনও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে কুলে বলেছেন."চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এমন একটি ব্যবস্থা যা অন্যের আধিপত্য স্বীকার করে না"।

সার্বভৌমত্বের এই ঐতিহ্যগত ধারণায়, আজ কোনও রাষ্ট্রকেই সম্পূর্ণ সার্বভৌম বলা যায় না। রাষ্ট্রপুঞ্জ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিটি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ, আন্তর্জাতিক চুক্তি, বোঝাপড়া, সম্মেলন প্রভৃতি সার্বভৌমত্বের উপর কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, সার্বভৌমত্বের রাশ টেনে ধরে এবং কিছু পরিমাণে খর্বও করে।

সার্বভৌম সুমতা সম্পর্কে ভারতের সংবিধান নির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেনি। একমাত্র প্রস্তাবনার মধ্যেই সার্বভৌমত্বের উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের প্রেরণার উৎস কারা তা বোঝা যায় প্রস্তাবনা থেকে। "আমরা জনগণ" শব্দ দুটি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কথা মনে করিয়ে দেয়।_কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ"। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও পূর্বের খসড়াগুলি থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রস্তাবনায় "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ" বলে এক জাতির কথা বলা হচ্ছে না। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের 13টি রাজ্যের জনগণ যারা সম্মিলিত ভাবে থাকতে চায় তাদের কথা বলা হয়েছে। অপর দিকে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতের রাজ্যগুলির জনগণের কথা বলা হয়নি।

আমাদের সংবিধানটিকে আমেরিকার মতো রাজ্যগুলির দ্বারা অনুমোদিত করার প্রয়োজন হয়নি। আমরা ভারতের জনগণ "এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ, নিজেদের অর্পণ" করছি বলে সংবিধান প্রণেতারা এ কথা বোঝান যে আমরা ভারতেরই জনগণ, কোনও রাজ্যের নয়, সার্বভৌমত্ব সারা দেশের জনগণের, কোনও বিশেষ রাজ্যের নয় এবং কোনও রাজ্যের জনগণ দ্বারা সংবিধান গৃহীত হয়নি, সারা দেশের জনগণের সংঘবদ্ধ প্রয়াসেই সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে। আমাদের এখানে এক জাতি, একটি সংবিধান ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা—এই ভাবনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সার্বভৌমত্বের বিভাজন রয়েছে এবং সংবিধানে নির্দিষ্ট পরিধিতে, কেন্দ্র বা রাজ্য সার্বভৌম। কিন্তু ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন থাকা সত্ত্বেও, সার্বভৌমত্বের কোনও বিভাজন করা হয়নি। জরুরি অবস্থার সময় জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র 249 অনুচ্ছেদ বলে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এক এবং অদ্বিতীয় এবং তা অবিভাজ্য। কোনও রাজ্য বা জনগোষ্ঠী আমাদের সংবিধান রদ করতে পারে না বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আমেরিকায় ইউনিয়নকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার জন্য, গৃহযুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সংবিধান প্রণেতারা গোড়াতেই এই ব্যবস্থা কার্যকর করেন এবং তাই আমাদের রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনও অধিকার নেই।

সংবিধানের 1(3)(c) অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে ভারত বিদেশি অঞ্চল দখল করতেও পারে। কিছু সাংবিধানিক প্রয়োজনে কেন্দ্র কিছু এলাকা অন্যের কাছে ছেড়েও দিতে পারে (*মগনভাই ঈশ্বরভাই প্যাটেল বনাম ভারত সরকার* (1970) ও SCC 100) সংবিধানের 2, 3 এবং 4 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সাধারণ আইনের মাধ্যমে নতুন রাজ্য গ্রহণ অথবা স্থাপন, বর্তমান রাজ্যের নাম পরিবর্তন বা সীমানার অদল বদল করতে পারে। আর নাগরিকত্বের প্রশ্নে ভারতে সকল অধিবাসীর জন্য একক নাগরিকত্ব বর্তমান। আমেরিকার মতো রাজ্য ও কেন্দ্রের দ্বৈত নাগরিকত্ব ভারতে নেই।

অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমস্ত পুরাতন বৈশিষ্ট্য, যেমন খণ্ডিত সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের স্বশাসন প্রভৃতি আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রদ করা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধান প্রণেতারা চিরকালের জন্য এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে আমাদের দেশে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত সংস্থাই তাদের ক্ষমতার উৎস হিসাবে জনগণকেই জানে।

সমাজতন্ত্র :

সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে কোনও রাজনৈতিক মতবাদের উল্লেখ করেননি। এমন কি, কোনও অর্থনৈতিক মতবাদে সংবিধান আবদ্ধ থাকুক তাও তাঁরা চাননি। সেজন্য তাঁরা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করতে রাজি হননি। কিন্তু প্রস্তাবনায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায় এবং সমান সুযোগ ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। 1976 সালের 42তম সংবিধান সংশোধন আইন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট বোঝাতে "সমাজতন্ত্র" শব্দটি ব্যবহার করে। সংশোধিত প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সার্বভৌমত্বের পরই সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

সংবিধানের 45তম সংশোধনী বিলে 'সমাজতন্ত্রী'র সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সমাজতন্ত্রী' শব্দের অর্থ হল, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও রকম সংজ্ঞা ব্যতিরেকে বিলটি 44তম সংশোধনী হিসাবে গৃহীত হয়। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ বিভিন্ন রকম এবং একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অভিধানে অবশ্য বলা হয় উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে—অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা সরকারি মালিকানায় থাকবে এবং ব্যক্তি মালিকানায় বা মুক্ত-বাজার থাকবে না।

আর, জীবনযাত্রার মান, মর্যাদার ক্ষেত্রে সব রকমের বৈষম্য দূর করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। তাছাড়া প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির অন্তর্ভুক্তির ফলে সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আদালতসমূহ অনেক বেশি বেশি করে জাতীয়করণের পক্ষে কথা বলছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ সমর্থন করছেন এবং সম কাজে সম মজুরির দাবি স্বীকার করছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা :

অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে "আধ্যাত্মিক নয়", "ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা নেই", "যে মত সমস্ত ধর্মবিশ্বাস, উপাসনা অস্বীকার করে", "অধার্মিক" ইত্যাদি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় বলা হয়েছে "উপযোগবাদী নীতি" যা মানব সমাজের দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উন্নতির কথা বলে, যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক ধর্মীয় বক্তব্যকে স্বীকার বা অস্বীকার করে না। সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল অতিপ্রাকৃত অনুমান থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের স্বশাসিত পরিমণ্ডল গড়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা।

পশ্চিমী দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যক্ষ রূপ এবং বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করার চেষ্টা করেছিলেন এ. আর. ব্ল্যাকশিল্ড। তিনিও স্থায়ী এবং গ্রহণযোগ্য কোনও সংজ্ঞা দিতে পারেননি। উপসংহারে তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ঠিক ধর্মের বিপরীত নয়

আবার ধর্মকে ব্যাখ্যা করাও খুব সহজ কাজ নয়। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সঠিক ভাবে বোঝা যায় ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহনীয়তা এবং যুক্তিবাদ, জড়বাদ ও মানবতার পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার কেতাবী সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ডি. ই. স্মিথ নিম্নোক্ত বয়ানে ঃ

> একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমষ্টির ধর্মীয় অধিকাব স্বীকার করে; সাংবিধানিক ভাবে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখায় না, এমন কি কোনও ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আগ্রহ দেখায় না।

বিচারপতি দেশাই বলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ একজন ব্যক্তির ধর্মীয় আনুগত্যের কথা বিবেচনা না করে নাগরিক হিসাবেই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করে, কোনও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে না বা কোনও ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না বা ধর্ম প্রসারে কোনও ভূমিকা নেয় না। ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্ট্রের কিছুই করার থাকে না যদি না কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় বা দেশের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করে।

জে বি বুখারি বনাম বি আর মেহরা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স মামলায় (1975 Suppl SCR 281) বিচারপতি এম. এইচ. বেগ বলেন ঃ

> ধর্মীয় মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে, ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মঙ্গল কবাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। জাত-পাত ও ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন। মেটল্যান্ড মনে করেন যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারেব অস্তিত্ব বা প্রয়োগ বা যে কোনও পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা, অধিকার বা এতদ্‌সংক্রান্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে তার ধর্মাচরণ বা ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
>
> আমাদের সংবিধান এবং সংবিধানকে কেন্দ্র করে গৃহীত আইনসমূহ যে কোনও নাগরিককে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুখী ও সৌভ্রাত্রমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেয় এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আইন ও রাজনীতির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক মেনে চলে। তবে অন্যেব অধিকারভুক্ত ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বহিরাক্রমণকে আমাদের সংবিধান অনুমোদন করে না। কোনও ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিনা এই প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে সংবিধানের নির্দেশের নিরিখে আদালত তা নিষ্পত্তি করে।

ধর্মের মোড়কে আছে শুধুমাত্র এই অজুহাতে ক্ষতিকর এবং শোষণমূলক কোনও ঘটনা আইনের আওতার বাইরে থাকতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু সমাজে বা মুসলিম শাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় বলে বিচারপতি গজেন্দ্র গদকর, ধাওয়ান এবং বেগ বিশ্বাস করতেন। বিচারপতি বেগ মনে করতেন,

"ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মের মধ্যে একটি সুখী ও সংহত সমন্বয় সম্ভব।" প্রাচীন আইনবিজ্ঞানের উপর ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় মনু ও পরাশর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিচারপতি বেগ বলেন ঃ

> পুরাকালের বিচারকরাও মনে করতেন এক প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা, এমন কি মৌলিক আইনসমূহ ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। এ বিষয়ে এক সমাজের সঙ্গে যে অন্য সমাজের পার্থক্য থাকে শুধু তা-ই নয়, একই জাতি বা সমাজের দুটি প্রজন্মের মধ্যেও মত-পার্থক্য থাকে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও আনুষ্ঠানিক ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

পশ্চিমী দুনিয়ার মতো ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা গির্জা ও রাষ্ট্রের সংঘাতের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়নি। সম্ভবত ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তার নানাত্ববাদে সাড়া দেওয়া অথবা ছোট বড় সব সম্প্রদায়ের প্রতি সম দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার যে ইচ্ছা সংবিধান প্রণেতারা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ নিহিত আছে। আমরা সাধারণ আলোচনায় প্রায়শই সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত শব্দ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে ব্যবহার করি।

গণপরিষদে গৃহীত প্রস্তাবনার মূল পাঠে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় 42তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই বিশেষণটিও যুক্ত হয়। 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' এই অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই শব্দটির মাধ্যমে। অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সকল ধর্মের প্রতি সমান ব্যবহার, সমান শ্রদ্ধা যার অর্থ ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় নিবপেক্ষতা।

এটাই স্বাভাবিক এবং একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, কারণ আসল কথা হল যে পশ্চিমী ব্যাখ্যায় সেকুলারিজমের যে সংজ্ঞা পাই, তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটুকু বোঝায় যে আমাদের বাষ্ট্র ঈশ্বরতান্ত্রিক পুরোহিত শাসিত রাষ্ট্র নয়, আমাদের রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনও ধর্ম নেই। তার চোখে সব ধর্মই সমান এবং রাষ্ট্র ধর্মের নিরিখে নাগরিকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করে না।

বিচারপতি গজেন্দ্র গদকর ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে এর অর্থ, সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে এবং নাগরিক হিসাবে তার অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না। তাছাড়া রাষ্ট্র, ধর্ম-বিরোধী নয় অবার অধার্মিকও নয়। রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সমান স্বাধীনতা দেয়। "আইনসঙ্গত ধর্মীয় আচরণ- বিধি ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আইনসঙ্গত কাজকর্মেব" মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা। এম. সি. শীতলবাদও মনে করতেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করা উচিত এবং ধর্মের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করা উচিত নয়।

42তম সংবিধান সংশোধনের পূর্বে একমাত্র 25 (2) অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের উল্লেখ ছিল, যেখানে ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত 'ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়াকলাপ' নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হয়। এখানে সহজেই অনুমেয় যে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে অধার্মিক বা বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচরণ ব্যতীত অন্যান্য কাজকর্ম। 42তম সংবিধান সংশোধনী আইনে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি গৃহীত হলেও তার প্রকৃত ব্যাখা দেওয়া হয়নি। মনে করা হয়েছিল এই সংযুক্তি সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে আরও দৃঢ় এবং বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরবে। *কেশবানন্দ ভারতী বনাম মির্নাভা মিল্‌স* মামলায় ধর্মনিরক্ষেতা, সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। তাছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার গ্যারান্টি রয়েছে এতে। *গুজরাট রাজ্য বনাম সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি* মামলায় 1974 সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, যদিও সংবিধানের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ নেই তথাপি সংবিধান প্রণেতারা যে একটি ধর্মরিপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

45তম সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চরিত্রকে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত করা। যাই হোক এই বিল 44তম সংশোধনী হিসাবে আইনে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের তালিকা বাতিল করা হয়। তাছাড়া প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের সংবিধানে কোথাও এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলেনি যে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটবে না, বা ধর্মীয় বিতর্কিত বিষয়, অর্থ, উপাসনা-স্থল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।

শাহবানু মামলায় মুসলিম মৌলবাদীদের চাপের কাছে আইন প্রণয়নকারীদের নতি স্বীকার কবতে হয়। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাও সকলের জন্য সমান অধিকারের মূল সুবকে উপেক্ষা করে, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে নাকচ কবার জন্য "মুসলিম মহিলা (বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার) আইন, 1986" পাশ করতে হয়।

এস. আর. বোম্মাই মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট, তিনটি রাজ্যে বি জে পি সরকার বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তটিকে উচিত মনে করেন কারণ তা সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।

ভারতের সাংবিধানিক আইনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের কার্যকর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সংবিধানের 14,15,16,19, 25-28, 44 প্রভৃতি অনুচ্ছেদে, এমন কি অসংশোধিত মূল প্রস্তাবনায় স্বাধীনতার অর্থ অন্য সব কিছুর সঙ্গে বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতাও বোঝায়। অন্য ভাবে বলা যায়, সকলের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা, এই আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারে সোচ্চার ছিল, প্রস্তাবনাটি মর্যাদা ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা এবং ভারতের সকল জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের নীতির মাধ্যমে এই অঙ্গীকার আরও শক্তপোক্ত হয়েছে।

সংবিধান প্রণেতারা জাতি ধর্ম বর্ণের সমস্ত বৈচিত্র্যকে ছাড়িয়ে যাবে এমন একটি উৎকৃষ্ট জাতির কথা ভেবেছিলেন। তাঁরা ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না কিন্তু আশা

করতেন, রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা হবে এবং ধর্মীয় মতপার্থক্য জাতি গড়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক সংঘাতমুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ ব্যবস্থার কথা সংবিধানে ভাবা হয়েছিল। এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল, যেখানে আইনে জাত পাত ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। সংবিধান এমন একটা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ কোনও সুবিধা ভোগ করে না বা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার পায় না এবং সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার বিভিন্ন ভাবে রক্ষা করা যায়।

সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা, জরুরী কঠোর আইন তৈরি করা এবং প্রচলিত আইনকে শক্ত হাতে প্রয়োগ করা আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কোনও ব্যক্তি বা দল যাতে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্যই এটা করা দরকার।

গণতন্ত্র ঃ

সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরক্ষেতার মতো বিভিন্ন মানুষ গণতন্ত্রেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে। গ্রীক শব্দ Demos মানে 'জনগণ' এবং 'Karatos' মানে সরকার বা শাসন। সেইজন্য গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। এদিকে একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র মানে এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন। অভিজাততন্ত্র বা বহুতন্ত্রের অর্থ বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির শাসন। গণতন্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলি হল, জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত বা পেশাগত প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে আইনের চোখে সকলের সমতা এবং নিজেকে শাসন করা ও নিজের সমস্যা নিজের মতো করে মেটানোর অধিকার। গণতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয়, জনগণ নিজেই নিজের প্রভু। নিজেদের শাসন করা বা কীভাবে শাসিত হবে এবং কাদের দ্বারা শাসিত হবে তা ঠিক করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার জনগণেরই।

ক্ষমতা ও প্রাধান্যের জন্য মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ করে চলেছে গণতন্ত্র তা স্বীকার করে। সংঘর্ষের এই মার্জিত রূপই গণতন্ত্র। সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিবর্তে গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যয় বা বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়। বুলেটের পরিবর্তে ব্যালট ব্যবহৃত হয়। আমরা একসঙ্গে বসি, কথা বলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমাদের সংকল্প, ভাবনা এবং যুক্তির দ্বারা আমরা একে অন্যকে জয় করার চেষ্টা করি, অন্যকে স্বমতে নিয়ে আসি।

প্রাচীন ভারতের গ্রাম-ব্যবস্থায় এবং গ্রীক নগর-ব্যবস্থায় সমস্ত নাগরিকের শাসন সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার জন্য এক জায়গায় মিলিত হতেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এ ধরণের ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ জনপ্রিয় গণতন্ত্র বলা হয়। এই ক্ষেত্রে বলা যায়, রাজনৈতিক ও আইনগত

সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতেই থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক ইউনিটের আকার ও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি এবং আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সৃষ্টির ফলে সকল মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করা, সুস্থভাবে সব বিষয় আলোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আইন করার পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রের প্রশাসন দিন দিন আরও বেশি জটিল হয়ে উঠছে। এজন্য সমস্ত ধরণের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ব্যতিক্রম কয়েকটি সুইশ ক্যানটন যেখানে পাউরুটির দাম বাড়বে কিনা, বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ থাকবে কি না জাতীয় সিদ্ধান্তগুলিও জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হয়। কোথাও কোথাও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে জনমত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, জাপান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সংবিধান সংশোধন করার জন্য ঐ দেশগুলির সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সাধারণ ভাবে বিভিন্ন দেশের জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যক্ষ ভোটে অংশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আধুনিক গণতন্ত্র হল পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র—যেখানে আইন প্রণয়ন ও সরকার গঠন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা করে থাকেন।

আমাদের সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা কোনও সংবিধান সংশোধনীর সাহায্যেও পরিবর্তন করা যায় না। গণতন্ত্রের প্রকারভেদ আছে যা সমানভাবেই প্রতিনিধিত্বকারী ও আইনসঙ্গত।

আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছি। সংবিধান প্রণেতারা দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে শিক্ষা, সম্পত্তি, আয়কর, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাধিকার অর্পণ করে ব্যাপকতম প্রতিনিধিত্বের চেষ্টা করেছেন। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 18 বছর হলেই ভোট দিতে পারে সংবিধানের 326 অনুচ্ছেদ অনুসারে এবং প্রশাসন আইনসভার নিম্নতর কক্ষের কাছে সংবিধানের 75 (3) এবং 164 (2) অনুচ্ছেদ অনুসারে দায়বদ্ধ থাকে।

প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র ঃ

সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে সাধারণ মানুষই প্রধান। সেখানে কোনও সুবিধাভোগী শ্রেণী নেই, সমস্ত সরকারি কার্যালয় সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত এবং সরকার সেখানে কোনও বাছবিচার করেন না। এখানে কোনও বংশানুক্রমিক শাসক থাকে না এবং রাষ্ট্রের প্রধান নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণভাবে তাঁকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়। সাধারণতন্ত্রী সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুলে বলেন, "জনগণের পছন্দ করা প্রতিনিধিদের সরকার।" বিচারপতি হিদায়েতুল্লার মতে, "সাধারণতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতা অন্তিম বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল, রাজা বা ঐ জাতীয় কোনও একজন ব্যক্তির উপর নয়"। একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলতে আমরা সাধারণভাবে এমন একটি রাষ্ট্রকে বুঝি যেখানে একজন নির্বাচিত

রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত সরকার আছে। ফেডারেলিস্ট গ্রন্থে ম্যাডিসন বলেছেন ঃ

> সাধারণতন্ত্র এমন একটি সরকার যার সমস্ত ক্ষমতার উৎস প্রত্যক্ষ বা প ·াক্ষভাবে জনগণ এবং প্রশাসনে যে ব্যক্তিরা থাকেন, তাঁরা স্বল্পমেয়াদের জন্য বা যতদিন আস্থা বজায় রাখেন ততদিনের জন্য, জনগণের ইচ্ছানুসারে শাসন করতে পারেন।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ব্যাপকতম অর্থে সাধারণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। 1950 সালের 26 জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়। ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যেব অবসান ঘটে। দেশের প্রধান রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন। আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান. বিশেষ সুবিধাভোগী কোনও শ্রেণী নেই, জাতি ধর্ম বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমস্ত সরকারি দপ্তরের দবজা খোলা থাকে।

কমনওয়েলথের সদস্যপদ ঃ স্বাধীনতার পর ভাবত কমনওয়েলথের সদস্য পদ গ্রহণ করলেও আত্মমর্যাদার সঙ্গে কখনও আপস করেনি। সাধারণতন্ত্র হিসাবে নিজের সার্বভৌমত্ব কখনও বিসর্জন দেয়নি। কার্যত কমনওয়েল্‌থেরই যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ থেকে এটি বিভিন্ন দেশের কমনওয়েল্‌থ হিসাবে গড়ে ওঠে। এটি হল কতকগুলি পূর্ণ সার্বভৌম দেশের মুক্ত সংগঠন এবং সেই মুক্ত সংগঠনের প্রতীক হলেন ব্রিটিশ রাজ। কমনওয়েল্‌থ সুনির্দিষ্টভাবে ভারতকে স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে গ্রহণ করেছিল। নতুন কমনওয়েল্‌থ সম্পর্কে নেহরু বলেন· "এটি স্বাধীন ইচ্ছার চুক্তি এবং যে কোনও সময় স্বাধীন ইচ্ছায় তা খারিজ করা যায়।" রাষ্ট্রের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক চরিত্রকে কমনওয়েল্‌থ কোনও ভাবে নষ্ট করতে পারেনি।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ঃ রাজনীতিতে গণতন্ত্র বলতে প্রত্যেক নাগরিকের নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাকে বোঝায়। সমস্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে "এক ব্যক্তি একটি ভোট" নীতি গৃহীত হয়েছে যার ফলে উচ্চশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা দরিদ্র, বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি বা শ্রমিক সকল মানুষের সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য সংবিধান প্রণেতারা নাগরিকদের ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্যেই গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি। ভারতের মতো গরিব দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতিরেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন বলে তাঁরা মনে করেন। ডঃ অম্বেদকর মনে করতেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তি না হতে পারলে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থহীন। পরবর্তী সময়ে জওহরলাল নেহরু বলেন, তাঁর কাছে একটা লক্ষ্যে

পৌঁছবার মাধ্যম হল গণতন্ত্র। আর প্রয়োজনীয় কিছু অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে সুস্থভাবে একটি ভদ্র জীবন যাপন করাই হল সেই লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে গণতন্ত্র সফল হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র সার্থক হয়। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে রাজনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল হয় এবং অবশেষে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে আমরা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের—"যার অর্থ সকলের কিছু উন্নতির জন্য কাজ করা"—দিকে এগিয়ে যাব। একেই হিতসাধক রাষ্ট্র বলে। একে অন্য ভাবেও বলা যায়,"অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাওয়া"। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিক যাতে "সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পান" সে কথা বলা হয়েছে আর তার মধ্য দিয়েই পূর্বের বক্তব্য পরিষ্কার করা হয়েছে।

ন্যায়বিচার ঃ

প্রস্তাবনায় সংবিধানের সকল নাগরিকের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের নিজেদেব মধ্যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন কবার অর্থ ন্যায়বিচার। প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের চাইতেও ন্যায়বিচারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবনায় বিচারের ধারণা যথেষ্ট ব্যাপক। আদালতের বারের আইনী গণ্ডির মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের আদালতগুলি আইনের অনুশাসন দ্বারা চালিত হয়। ন্যায়বিচারের অর্থ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়কে রাজনৈতিক ন্যায়ের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ, উপাধির জন্য নাগরিকরা যে সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন তা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক যাতে সমান ব্যবহার পায়, সামাজিক ন্যায়- বিচার সেই ব্যবস্থাই করে। সংবিধানের 15 অনুচ্ছেদে প্রকাশ্য স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় না। 38 অনুচ্ছেদে জনগণের কল্যাণের জন্য "দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার" কথা বলা আছে। জওহরলাল নেহরুর ভাষায়: "অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের ওপর সামাজিক ন্যায়বিচারের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, সামাজিক ন্যায়ের আবেগের জন্যই লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

মানুষের পক্ষে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রসবকালীন সাহায্য, ছুটি, অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের আর্থিক উন্নতি ও ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদান নিষিদ্ধ করা (23 ও 43 অনুচ্ছেদ) প্রভৃতি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের অর্থ গরিব ও ধনীদের সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের

মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা। প্রত্যেক নাগরিক যাতে প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে পারে, সমষ্টির ব্যবহারে লাগে এমন উপাদানসমূহের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যাতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে যাতে সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত না হয়, উৎপাদনের মাধ্যম যাতে জনস্বার্থ বিরোধী না হয়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য যাতে সমকাজে সমমজুরি পাওয়া যায়, শিশু ও নারীকে যাতে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা না হয়, অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য বয়স ও সামর্থ্যের অনুপযোগী কোনও কাজ নিতে নাগরিকরা যাতে বাধ্য না হন, সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সম্ভ্রম নিয়ে ও স্বাধীনভাবে শিশুরা যাতে বেড়ে ওঠে, শোষণের বিরুদ্ধে শৈশব ও যৌবনকে যাতে রক্ষা করা যায় সেজন্য সংবিধানের 39 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এসবই করা হয়েছে অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভাবনা থেকেই।

কার্যত সংবিধানের চতুর্থ অংশে 36-51 অনুচ্ছেদে ন্যায়বিচার সমৃদ্ধ একটি নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য কাজের, শিক্ষার এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পাওয়ার অধিকার, মানুষের কাজ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রসবকালীন সাহায্য, শ্রমিকদের জন্য জীবন ধারণের মজুরি প্রভৃতি; শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, দুর্বল শ্রেণীসমূহের জন্য শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নতি, বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে মুক্ত করা প্রভৃতির উল্লেখ আছে সংবিধানের ঐ সমস্ত অনুচ্ছেদে।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার অধিকার রাজনৈতিক ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে সংবিধানের 16 অনুচ্ছেদে এবং 325 ও 326 অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

নেহরু ও অম্বেদকরের মতো সংবিধানের জনকরা পরিষ্কারভাবে মনে করতেন যে অর্থনৈতিক ন্যায় ব্যতিরেকে রাজনৈতিক ন্যায়বিচার অর্থহীন। আমাদের সমাজে যেখানে জাত পাত ও ধর্মের বৈষম্য রয়েছে সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার যথেষ্ট নয়। ডঃ অম্বেদকর বলেছিলেন ঃ

> 1950 সালের 26 জানুয়ারি আমরা পরস্পর-বিরোধী এক জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। রাজনীতিতে 'সাম্য' থাকবে আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে থাকবে অসাম্য। রাজনীতিতে একজন ব্যক্তি একটি ভোট এবং প্রতিটি ভোটের একই মূল্য, এই নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। আর আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য, আমরা এই গৃহীত নীতিকে অস্বীকার করেই যাব।

স্বাধীনতা ঃ

লাতিন 'লিবার' শব্দ থেকে লিবার্টি শব্দটি এসেছে যার অর্থ বন্দিত্ব, দাসত্ব, ক্রীতদাস প্রথা, স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি বা 'স্বাধীনতা'। মুক্ত পশ্চিমী দুনিয়ার ঐতিহ্য এবং সরকারের

অবাধ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা প্রধানত একটি নেতিবাচক ধারণা। এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগের সমতা, চুক্তি ও প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনতায় সরকারের হস্তক্ষেপ না করার অর্থ 'স্বাধীনতা'। কিন্তু আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্যের অনুপস্থিতি বলে উল্লেখ করা হয়নি বরং সদর্থকভাবে স্বাধীনতাকে "চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার অধিকার" বলা হয়েছে। এটি বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতাকে সন্নিবেশিত করেছে যা আমাদের সংবিধানের অন্যতম অংশ "মৌলিক অধিকারে" স্থান পেয়েছে এবং ব্যক্তি ও জাতির বিকাশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 19 অনুচ্ছেদে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং 25-28 অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে যেখানে চিন্তা মতপ্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম এবং উপাসনার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ইতিবাচক পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার অর্থ, একজন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। পুনরায় উল্লেখ করতে হয়, স্বাধীনতার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতার পার্থক্য আছে। চিন্তা, মত-প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, যা মৌলিক অধিকার রূপে পরিচিত, এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়।

সমতা ঃ

ফরাসি বিপ্লবের নেতারা বিশ্বাস করতেন আইনের চোখে সব মানুষই সমান। আইন যদি কাউকে শাস্তি দেয় বা রক্ষা করে তা অবশ্যই বৈষম্যহীন ভাবে করা হবে। নিজ নিজ যোগ্যতা, গুণ ও মেধা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক সরকারি পদ, সম্মান ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে যোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'সমতা'র অর্থ সকল নারী-পুরুষ সমস্ত পরিস্থিতিতে সমান নয়। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। আমাদের প্রস্তাবনায় সমতার যে কথা বলা হয়েছে তা মর্যাদা ও সুযোগের সমান অধিকার। এর আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিব্যাপ্তি আছে। আইনের চোখে সব নাগরিক সমান এবং দেশের আইন সকলকে একই রকম সুরক্ষা দিতে বাধ্য। জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ভিত্তিতে প্রকাশ্য স্থানে প্রবেশ এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রকম বৈষম্য করা যাবে না। ভোট দেওয়ার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমান ভাবে যোগ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা মানে একই রকম যোগ্যতা ও পরিশ্রমের জন্য একই রকম বেতন দেওয়া। তাছাড়া কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী অন্য ব্যক্তি বা শ্রেণীকে শোষণ করবে না। মর্যাদা ও সুযোগের সমতা — এই ধারণার সুসংহত উল্লেখ আছে সংবিধানের 14 থেকে 18 অনুচ্ছেদে।

ভ্রাতৃত্ব ঃ

ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা প্রভৃতি শব্দগুলি তখনই প্রাসঙ্গিক বা অর্থযুক্ত যখন

নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়, ধম বর্ণ ভাষায় বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা সবাই একই মায়ের অর্থাৎ ভারতমাতার সন্তান, এই বোধ দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে। অভিন্ন নাগরিকত্বের যে ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে আছে তার উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের মধ্যে সংহতি ও একতা গড়ে তোলা। কোনও রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য যে মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে যে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের কথা বলা হয়েছে সবই সৌভ্রাতৃত্ব প্রসারের জন্য। সংবিধানের IV A অংশে, যেখানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, এই ধারণার কথা আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার, ধর্ম বর্ণ ভাষার বিভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে আমরা সবাই ভারতমাতার সন্তান, এই বোধ প্রচার করার দায়িত্ব সকল নাগরিকের উপর বর্তায়। কার্যত, ভ্রাতৃত্বের ধারণা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার চাইতে অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ, ধর্মের স্বাধীনতা, সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা—এই সব কিছুর চাইতে, ভ্রাতৃত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে বিচারপতিরা এ বিষয়ে যথোচিত গুরুত্ব দেননি। গণপরিষদে ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ অম্বেদকর বলেন ঃ

> ভ্রাতৃত্ব কাকে বলে? সকল ভারতবাসীরা সহমর্মিতা, আমরা এক জাতি, এক প্রাণ — একেই সৌভ্রাতৃত্ব বলে। এই নীতির ফলে সমাজে একতা ও সংহতি বোধ জাগে। এই বোধ অর্জন করা খুবই কঠিন।

সৌভ্রাতৃত্বের একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আছে যা আমাদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (সমগ্র পৃথিবীটা যেন একটা পরিবার), এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের 51 অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

ব্যক্তির মর্যাদাবোধ ঃ

ব্যক্তির মর্যাদাবোধ রক্ষা করবে এবং তার প্রসার ঘটাবে ভ্রাতৃত্ববোধ এমনটাই আশা করা হয়। ব্যক্তির মর্যাদা সংবিধান প্রণেতাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা, সাম্যের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তির জীবনের মান উন্নয়ন করাই লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করা ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক কাজের পরিবেশ তৈরি করা ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিন্ত করার জন্য সংবিধান প্রণেতারা নির্দেশাত্মক নীতি অধ্যায়ে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেন। অস্পৃশ্যতা মানুষের মর্যাদা হানি করে। সেজন্য সংবিধানের 17 অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা বিলোপের কথা বলা হয়েছে। নিজের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কোনও নাগরিক সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন।

ঐক্য ও জাতীয় সংহতি ঃ

ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করার জন্য জাতি গড়া এবং তার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা প্রয়োজন। আমাদের মতো একটা বহুত্ববাদী এবং বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আশা করতে পারি। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ব্যতিরেকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াসে সফল হতে পারি না এবং দেশের স্বাধীনতা, স্বদেশবাসীর সম্মান বা গণতন্ত্রকেও বজায় রাখতে পারি না। সেজন্য 51 A অনুচ্ছেদে সঙ্গতভাবে প্রত্যেক নাগরিককে ভারতের ঐক্য সংহতি এবং সার্বভৌমত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরা ও রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্তত যে সমস্ত ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হতে পারে, সেই সব ক্ষেত্রে আশা করা যায় প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের মধ্যে সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে যাবেন, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠবেন। তা যদি না হয় জাতি গড়া একটা অসম্ভব কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার ঃ

প্রস্তাবনার বিভিন্ন ধারণা ও শব্দের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সুন্দর সুন্দর শব্দগুলি আমাদের সংবিধানের মৌলিক উপাদান এবং তা সংবিধানের দর্শন, আদর্শ ও আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে। সংবিধানের অন্য অংশসমূহ প্রস্তাবনার কথাগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এটা আদৌ আশ্চর্যের নয় যে সুপ্রিম কোর্ট মনে করেন, সংবিধানের বেশ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রস্তাবনায় আছে, যা 368 অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান সংশোধন করেও পরিবর্তন কবা যায় না।

অবশ্য এটা বেশ বোঝা যায় যে প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত 'সমাজতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইত্যাদি শব্দগুলি যথেষ্ট অস্পষ্ট আর এসব শব্দগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা সংবিধানে না থাকার জন্য আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেজন্য সংবিধান সংশোধন করে এই শব্দগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার সুপারিশ করা যেতে পারে।

ছয়

ইউনিয়ন ও তার এলাকা

অংশ 1, অনুচ্ছেদ 1-4

সংবিধানের 1 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন হবে। ভারতের এলাকা বলতে বোঝায় (i) অঙ্গরাজ্যগুলির এলাকা। (ii) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এবং (iii) যে সমস্ত অঞ্চল অধিগ্রহণ করা যাবে সেগুলির এলাকা। এই ভাবে ফরাসি শাসিত পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে এবং ইনাম এবং পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নাগর হাভেলী সংবিধানের 10,12,14 সংশোধনীর সাহায্যে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় 1962 সালে ঐ অঞ্চলগুলি কার্যত হস্তান্তরের ফলে। (*অমর সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য* AIR 1955 SC 504, *মাস্তান সাহেব বনাম চিফ কমিশনার* AIR 1962 SC 797 এবং *হরবন্‌স বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য* (1971, 2 SCC 54)।

অঙ্গরাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম এবং তাদের নির্দিষ্ট এলাকার উল্লেখ আছে সংবিধানের প্রথম তফসিলে। সংবিধানের 1 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রথম তালিকায় উল্লিখিত এলাকাই কোনও একটি বিশেষ সময়ে, ভারতের এলাকা বলে সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করেছে। (*অমর সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য* AIR 1955 SC 504, *মাস্তান সাহেব বনাম চিফ কমিশনার* AIR 1962 SC 797)

গণপরিষদে যে ভাবে গৃহীত হয়েছে এবং সংবিধানে যে ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মতো প্রথম তফসিলে চার ধরনের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। ক, খ ও গ বিভাগে রাজ্যগুলি এবং ঘ বিভাগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উল্লেখ আছে। ক বিভাগে পূর্বতন ইংরেজ রাজত্বের নয়টি প্রদেশের কথা বলা হয়েছে। পাঁচটি রাজন্যশাসিত অঞ্চল, যেখানে আইনসভা ছিল তাদের খ বিভাগে এবং পাঁচটি কেন্দ্র-

শাসিত প্রদেশকে গ বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করা হয়েছে ঘ বিভাগে। সংবিধান চালু হওয়ার পরবর্তী সময়ে মানচিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। 1953 সালের অন্ধ্র আইন অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়েছে। 1956 সালের সপ্তম সংশোধন অনুযায়ী রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্গঠিত হয় এবং ক ও খ বিভাগের মধ্যে ব্যবধান লোপ পায়। পরবর্তী কালে বেশ কয়েকটি নতুন রাজ্য গঠিত হয় যেমন হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়া। বর্তমানে নিম্নলিখিত 25টি রাজ্য ও 7টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই তফসিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজ্যসমূহ ঃ অসম, অন্ধ্র, অরুণাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, গুজরাট, গোয়া, জম্মু ও কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, মেঘালয়, রাজস্থান, সিকিম, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঃ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডিগড়, দাদরা ও নাগর হাভেলি, দমন ও দিউ, দিল্লি (বর্তমানে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল নামে পরিচিত), পণ্ডিচেরি ও লাক্ষাদ্বীপ।

দেশের নামকরণের প্রশ্নে গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রাচীনকালে দেশটির নাম ছিল ভারত। 'ভারত' এই শব্দে দেশের ঐক্য ও অভিন্নতার প্রকাশ পায়। 'ইণ্ডিয়া' এই নামে আধুনিক দুনিয়ায় দেশটি পরিচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ইণ্ডিয়ার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ দুটি নামের পক্ষেই গণপরিষদে যথেষ্ট সমর্থক ছিল। তাই সকলের সন্তুষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত "ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত" এই কথা সংবিধানে গৃহীত হয়।

গুরুত্ব দিয়ে ভারতকে ইউনিয়ন বলে ঘোষণা করে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কোনও চুক্তি করে নয়, ভারতের জনগণের আস্থায় বলীয়ান হয়ে গণপরিষদ এই সিদ্ধান্ত করেছে। সে জন্য কোনও অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। গণপরিষদে ডঃ অম্বেদকর বলেন ঃ

> "আমেরিকায় রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করা যাবে না, এই নীতি কার্যকর করার জন্য সেদেশে গৃহযুদ্ধও হয়েছে। খসড়া কমিটি মনে করে কোনও রকম বিতর্কে না গিয়ে প্রথমেই এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা ভাল"।

আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কি না—এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে (অনুগ্রহ করে 4 পরিচ্ছেদে সংবিধানের বৈশিষ্ট দেখুন)।

সংবিধানের 2 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ আইন করে ভারত ইউনিয়নে নিজের ইচ্ছামতো শর্তে নতুন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি অথবা নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে। সর্বশেষ

1974 ও 1975 সালে সংবিধানের 35 ও 36 নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে সিকিম রাজ্যকে ভারত ইউনিয়নে নেওয়া হয়। সিকিম বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাবে এবং সিকিমের গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কাজ করা হয়।

সংবিধানের 3 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ নতুন রাজ্য গঠন করতে সক্ষম। কোনও রাজ্যের এলাকা সঙ্কুচিত করে সেই অঞ্চল নিয়ে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য মিলে বা তাদের অংশ বিশেষ নিয়ে কিংবা একটি রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের কোনও অংশ যুক্ত করে সংসদ নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে। যে কোনও রাজ্যের এলাকার রদবদল করে সেই রাজ্যের আকারের হ্রাস-বৃদ্ধি, এমন কি রাজ্যের নামেরও পরিবর্তন করতে পারে সংসদ। অবশ্য এই ক্ষমতাবলে সংসদ ভারতীয় কোনও অঞ্চলকে বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করতে পারে না। (*বেরুবাড়ি হস্তান্তর মামলা,* AIR 1950 SC 845, 857)। এজন্য ভারতকে সঠিক ভাবে ভঙ্গুর রাজ্যসমূহের চিরস্থায়ী ইউনিয়ন বলা হয়।

3 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করা হয়, সেই রাজ্য নিজস্ব বক্তব্য রাখতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত এই বিষয়ে কোনও বিল সংসদের কোনও কক্ষেই পেশ করা যায় না, দ্বিতীয়ত, যে বিল কোনও রাজ্যের সীমানা, আয়তন বা নাম পরিবর্তনের কথা বলে সেই বিল রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে আলোচনার জন্য পাঠাতে হয়। রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর মতামত জানিয়ে দেন। অবশ্য রাজ্যের অভিমত রাষ্ট্রপতি বা সংসদেব পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। (*বাবুলাল বনাম বোম্বে রাজ্য* AIR 1960 SC 51)

সংবিধানের 4 অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে,বলা হয়েছে 2 ও 3 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের এলাকা বা নাম পরিবর্তন 368 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের পর্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ, কোনও বিশেষ গরিষ্ঠতা নয় সাধারণ আইন করাব মতো সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতাই এই পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট।

সংবিধানে নতুন এলাকা দখল, গ্রহণ বা নতুন রাজ্য গঠনের সুযোগ থাকলেও ভারতের কোনও অঞ্চলকে বিদেশিদের হাতে হস্তান্তর বা সমর্পণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে সংবিধান সংশোধন ব্যতিরেকে কোনও এলাকা সমর্পণ বা হস্তান্তর করা অসম্ভব। পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তিকে মর্যাদা দিতে সংবিধানের নবম সংশোধন আইন গৃহীত হয়।

গত চার দশকে যে সাবলীল গতিতে ভারতের মানচিত্রের পরিবর্তন এবং পরিমার্জন ঘটেছে তা আমাদের সংবিধানের স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা প্রমাণ করে এবং 2, 3, 4 অনুচ্ছেদের যৌক্তিকতা স্বীকার করে। অন্যদিকে ভাষার প্রশ্নে নতুন রাজ্য গঠনের সমর্থনে জোরালো অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যগুলির সীমানা-বিন্যাসের নতুন নতুন দাবি উঠেছে। শুধু তাই নয়. অধিক সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্যের দাবিও ক্রমশ বেশ জোরদার হচ্ছে।

সাত

নাগরিকত্ব

অংশ II, অনুচ্ছেদ 5 - 11

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্তম্ভ হল নাগরিকত্ব। নাগরিক একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। সে রাষ্ট্রের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রও সরকারিভাবে এই আনুগত্য স্বীকার করে। নাগরিকদের কিছু অধিকার, দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধা থাকে যা বিদেশিরা পায় না। সমস্ত সরকারি দপ্তর একজন নাগরিকের কাছে উন্মুক্ত, যে কোনও সরকারি কাজে নিয়োগের জন্য সে উপযুক্ত। ভোট দেওয়ার অধিকার সহ বেশ কিছু মৌলিক অধিকার একমাত্র নাগবিকেরই আছে। অপরদিকে কর দেওয়া, বাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসা প্রভৃতি দায়িত্বও নাগরিকদের আছে। অন্যভাবে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির আইনী সম্পর্ককেও নাগরিকত্ব বলা যায়। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তিকে রক্ষা করতে অঙ্গীকার করে। জাতীয় আইন দ্বারা এই সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়।

1949 সালের 26 নভেম্বর গণ পরিষদ সংবিধান গ্রহণ করেই নাগরিকত্ব সম্পর্কিত 5 থেকে 9 অনুচ্ছেদ বলবৎ করেন। এর আগে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সে সময় ইংরেজ শাসিত ভারতে যারা বাস করতেন তাদের ব্রিটিশ প্রজা মনে করা হত এবং ব্রিটিশ আইন মোতাবেক তাদের শাসন করা হত। রাজন্যশাসিত করদ রাজ্যগুলির অধিবাসীদের ব্রিটিশ-আশ্রিত ব্যক্তির মর্যাদা দেওয়া হত।

দেশভাগ ও শরণার্থী আগমন নাগরিকত্ব-নির্ধারণে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে।

সংবিধানের নাগরিকত্ব বিষয়ক অংশ অর্থাৎ 5 থেকে 11 অনুচ্ছেদ নিয়ে খসড়া কমিটি সর্বাপেক্ষা বিব্রত বোধ করেছিলেন। তাদের অনেকগুলি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে মত বিনিময় করতে হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রায় দু বছর সময় লাগে। তা-ও সংবিধান চালু করার সময় কারা নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন, সেই সম্পর্কিত আইনটিই শুধুমাত্র সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। নাগরিকত্ব কেমন ভাবে পাওয়া যাবে বা কী কারণে বাতিল হবে তার কোনও উল্লেখ সংবিধানে নেই। 11 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ আইন করে নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, 1955 সালে গৃহীত 'ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন'' নাগরিকত্ব পাওয়ার পদ্ধতি ও বাতিলের কারণ লিপিবদ্ধ করেছে।

সংবিধান চালু হওয়ার সময় কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত শর্তগুলির কোনও একটি পূরণ করলেই সংবিধানের 5 থেকে 8 নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

1. ভারতে বসবাসকারী এবং ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন — ভারতের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ এঁরাই;
2. ভারতে বসবাসকারী কিন্তু ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি অথচ বাবা-মায়ের একজন ভারতে জন্মেছেন;
3. বসবাসকারী কিন্তু ভারতে জন্মাননি অথচ গত পাঁচ বছর ধরে ভারতেই বাস করছেন;
4. ভারতে বসবাসকারী কিন্তু 1947 সালের 1 মার্চের পর পাকিস্তানে চলে যান এবং পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের অনুমতি নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন;
5. পাকিস্তানে বাস করতেন কিন্তু 1948 সালের 19 জুলাইয়ের পূর্বে ভারতে চলে আসেন অথবা ঐ তারিখের পর ভারতে এসেছেন কিন্তু ছয় মাসের বেশি ভারতে বাস করেছেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নথিভুক্ত হয়েছেন;
6. ভারতের বাইরে বাস করেন কিন্তু বাবা-মা বা পিতামহ-পিতামহীর কেউ একজন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অর্থাৎ, সংবিধান চালু করার সময় নাগরিকত্ব প্রদানের শর্ত ছিল (i) স্থায়ী বাসিন্দা (ii) পাকিস্তান থেকে আগত বা পাকিস্তানে আশ্রিত শরণার্থী এবং (iii) বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়।

স্থায়ী বাসিন্দা ঃ কোনও দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে সেদেশে বসবাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সংবিধানে যদিও এই শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়নি, সাধারণ ভাবে বাসস্থান অর্থে একজন মানুষ স্থায়ীভাবে কোথায় থাকতে চায় তা বোঝায়। অর্থাৎ একটি স্থায়ী বাসা এবং সেখানে পাকাপাকিভাবে বাস করার ইচ্ছা বাসস্থান বা 'ডমিসাইল'-এর দুটি প্রধান শর্ত। (*মহম্মদ রাজা বনাম বোম্বে রাজ্য AIR 1966 SC 1436*)। সংবিধানের 5 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবেন যদি তিনি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হন, তিনি অথবা

তাঁর পিতা-মাতার কেউ ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন অথবা সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে অন্তত পাঁচ বছর তিনি ভারতে বসবাস করে থাকেন। জন্মসূত্র ও বাস করার সূত্রে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত যে কেউ পরিবর্তন করতে পারেন। একটি অনির্দিষ্ট সময় ধরে অন্য কোনও রাষ্ট্রে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেই এ কাজ করা যায়। কার্যত নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় স্থায়ী বাসিন্দা সূত্রে, বিপরীতক্রমে নয়। স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কীভাবে রাষ্ট্রের এলাকার সঙ্গে যুক্ত তা-ই বোঝায়, কোনও ভাবেই কোনও সম্প্রদায়ের সদস্য বোঝায় না। দুটি ব্যাপারকে সহজেই আলাদা করা যায় এবং এটিই নাগরিক-চেতনার মূল কথা (*এ রহমান বনাম রাজ্য* AIR 1964 Pat 384)। সংবিধান দ্বি-নাগরিকত্ব বর্জন করেছে। কোনও অংশ বিশেষের জন্য নয় সমগ্র ভারতের জন্য এক নাগরিকত্ব চালু আছে। আমেরিকার মতো রাজ্যগুলির জন্য আলাদা নাগরিকত্ব নেই। সেজন্য কোনও ভারতীয় নাগরিককে বিশেষ কোনও রাজ্যের বাসিন্দা বলা ভুল, তাকে ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দা বলা উচিত। (*প্রদীপ জৈন বনাম ভারত ইউনিয়ন,* AIR 1984 SC 1420, 1984 ও SCC 654)

পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তি ঃ সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে যাঁরা পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে আসেন 6 অনুচ্ছেদে তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। এই সময় ছিন্নমূল ব্যক্তিদের দুভাগে ভাগ করা হয় (i) পারমিট প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ 1948 সালের 19 জুলাইয়ের পূর্বে যাঁরা ভাবতে এসেছেন এবং (ii) পরবর্তী কালে যাঁরা এসেছেন। প্রথমোক্তরা সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পরিচিত হবেন যদি তিনি বা তাঁর বাবা-মা/পিতামহ-পিতামহী কেউ ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁদের মৃত্যুর তারিখ থেকে তিনি ভারতেই বাস করতে থাকেন। 1948-এর 19 জুলাইয়ের পর যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁদের নাগরিক বলে এই কাজের জন্য নিবন্ধভুক্ত (রেজিস্টার্ড) হতে হবে, ভারত সরকাব কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ অফিসারের নিকট। তবে এভাবে নিবন্ধভুক্ত হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস তাঁকে ভাবতে বসবাস করার প্রমাণ দিতে হবে।

ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যাওয়া ব্যক্তি ঃ 1947 সালের 1 মার্চ যাঁরা ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যান কিন্তু পরবর্তীকালে আবার ফিরে আসেন, তাঁদের নাগরিকত্ব অধিকার সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে সংবিধানের 7 অনুচ্ছেদে। 1947 সালের 1 মার্চের পর যাঁরা পাকিস্তানে যাবেন তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না এ কথা পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তথাপি ঐ সময়ের পর পাকিস্তানে গিয়েও যাঁরা পরবর্তীকালে ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য পুনর্বাসনের অনুমতি নিয়ে ফিরে আসেন তাঁদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সংবিধানের 6 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে আগতদের জন্য যে

সব শর্ত ছিল তা পূরণ করতে পারলে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। (*রাজ্য বনাম অমর সিং* AIR 1955 SC 282, *আতাউর রহমান বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার* AIR 1951, Nag 44)। মনে রাখা দরকার এই অনুচ্ছেদে 'মাইগ্রেশন' শব্দের দ্বারা সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে যাঁরা বিদেশে চলে গেছেন তাঁদের বোঝায়। পরবর্তীকালে অভিবাসনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটে সেগুলি নাগরিকত্ব আইন 1955 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া 'মাইগ্রেটেড' শব্দের দ্বারা স্বেচ্ছায় ভারত থেকে পাকিস্তানে পাকাপাকিভাবে বা অস্থায়ীভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায় (*কুলতাহিল বনাম কেরালা রাজ্য* AIR 1966 SC 1974)।

বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তি ঃ বেশ কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তি বিদেশে বাস করেন অথবা চাকরিসূত্রে সেখানকার অভিবাসী। দূরদর্শী সংবিধান প্রণেতারা, এঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদ বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নাগরিকত্ব বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়। ঐ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ কোনও ব্যক্তি বা তাঁর বাবা-মা অথবা পিতামহ-পিতামহীর যদি কেউ 1935 সালের ভারত আইনে উল্লিখিত অঞ্চলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং সাধারণভাবে বিদেশে বসবাস করেন এবং তিনি যদি সেই দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে নির্ধারিত দরখাস্তে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন তাহলে তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব অর্জন ঃ 7 অনুচ্ছেদে আছে, স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারতের নাগরিকত্ব খারিজ হবে। সংবিধান চালু হওয়ার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হলেও, পরবর্তী সময়ের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আইন 1955 অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, কোনও ব্যক্তির অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার জন্য ভারতেব নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হবে কি না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ভারত সরকার। একমাত্র এই সিদ্ধান্তের পরেই কোনও রাজ্য সরকার তাঁকে বিদেশী হিসাবে গণ্য করতে পারে। বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের পাসপোর্ট পেলেই কারও বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না বা তাকে নির্বাসন দেওয়া যায় না (*কুলাথী মাম্মু বনাম কেরালা রাজ্য* AIR 1966 SC 1614, 1617; *উঃ প্রঃ সরকার বনাম রহমুতুল্লা* (1971) 2 SCC 113, 118 AIR 1971 SC 1382; *অন্ধ্র প্রদেশ সরকার বনাম সৈয়দ মহম্মদ* AIR 1962 SC 1778; *উঃ প্রঃ সরকার বনাম রোশান* (1969) 2 SCEWR 232; *গুজরাট সরকার বনাম ইব্রাহিম* AIR 1974 SC 645, *আয়ুব খান বনাম কমিশনার অব পুলিশ* (1965) 2 SCR 884); *মৈনুদ্দিন বনাম ভারত সরকার* (1967) 2 SCR 401; *আকবর বনাম ভারত সরকার* AIR 1962 SC 70, *মধ্যপ্রদেশ সরকার বনাম পীর মহম্মদ* AIR 1963 SC 645, *ইজাহার আহমেদ বনাম*

ভারত সরকার AIR 1962 SC 1052, *আনওয়ার বনাম জম্মু কাশ্মীর সরকার* (1972) 3 SCC 104।

নাগরিকত্ব অধিকারের স্থায়িত্ব ঃ 10 অনুচ্ছেদে বলা আছে, কোনও ব্যক্তি সংবিধানের 5 থেকে 10 অনুচ্ছেদ মতে ভারতের নাগরিকত্ব পেতে আগ্রহী হলে, তিনি সংসদে গৃহীত আইন সাপেক্ষে নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন। অন্যভাবে বলা যায়, সংসদে গৃহীত আইন ছাড়া কারও নাগরিকত্ব বিলোপ করা যায় না। (*ইব্রাহিম উজীর বনাম বোম্বে সরকার* AIR 1954 SC 229)

5 ও 10 অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে, বিচারাধীন বা শাস্তি ভোগ করছে এমন ব্যক্তিদেরও বোঝাচ্ছে (*মহারাষ্ট্র সরকার বনাম প্রভাকর* AIR 1966 SC 424, *সুনীল বাট্রা বনাম দিল্লী প্রশাসন* AIR 1978 SC 1675)। 33 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের সম্মতি সাপেক্ষে সৈন্যবাহিনীর সদস্যদেরও বোঝায় (*পৃথি বনাম ভারত সরকার,* AIR 1982 SC 1413)। কোনও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনের ভাষায় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হবে কি না সে বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। নাগবিকত্ব আইন অবশ্য পরিষ্কাব ভাবে উল্লেখ করেছে প্রতিষ্ঠানকে নাগরিক বলা যায় না। সুপ্রিম কোর্টও রায় দিয়েছেন কোনও সংস্থা সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিক অধিকার দাবি করতে পাবে না (*বাণিজ্য কর অধিকর্তা বনাম স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন* (1964) 4 SCR 99; *টাটা ইনজিনিয়ারিং ও লোকোমোটিভ কোং বনাম বিহার সরকার* (1964) 6 SCR 885)।

আইন করে নাগরিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার সংসদীয় ক্ষমতা এবং 1955 সালের নাগরিকত্ব আইন ঃ সংবিধানের 11 নং অনুচ্ছেদ অনুসারে নাগরিকত্ব অর্জন, বাতিল বা এই সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আইন করার বল্গাহীন ক্ষমতা আছে সংসদের। সেজন্য নাগরিকত্ব অর্জন বা বিলুপ্ত কবার নাগরিকত্ব আইন 1955 সংসদে গৃহীত হয়। সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার কোনও কোনও দেশ থেকে ব্যাপক বেআইনি অনুপ্রবেশ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য 1986 সালে এই আইনটির সংশোধন করা হয়। এজন্য ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মূল আইনের সংশোধিত 3 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তিই অর্জন করতে পারেন, যাঁর পিতা-মাতা সন্তান জন্মানোর সময় ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। এছাড়াও এই আইনে জন্মসূত্রে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, নিবন্ধভুক্তির মাধ্যমে, দেশীয়করণ পদ্ধতি বা ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তির ফলে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ আছে। একই ভাবে এই আইনে নাগরিকত্ব বিলুপ্তির পদ্ধতি হিসাবে অন্য দেশের নাগরিকত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ, দাবি

ত্যাগ করা, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকত্ব খারিজ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এই আইনে কমনওয়েল্থ-নাগরিকত্ব সম্পর্কেও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সংক্ষেপে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন 1955 টি নিম্নরূপ ঃ

(ক) 1950 সালের 26 জানুয়ারির পর ভারতে জন্মগ্রহণকারী যে কোনও ব্যক্তি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করবেন—শুধুমাত্র কূটনীতিবিদ্‌দের সন্তান ব্যতিক্রম।

(খ) 1950 সালের 26 জানুয়ারির পর ভারতের বাইরে জন্মগ্রহণকারী যে কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবেন যদি জন্মগ্রহণের সময় তাঁর বাবা ভারতীয় নাগরিক হন।

(গ) কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবদ্ধভুক্তির মাধ্যমে।

(ঘ) বিদেশীরা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেশীয়করণ পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন।

(ঙ) যদি কোনও ভূখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় তাহলে ঐ অঞ্চলের কারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন ভারত সরকার তা ঠিক করেন।

(চ) নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে — অবসান, ত্যাগ এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বঞ্চনার মাধ্যমে।

(ছ) কমনওয়েল্থ ভুক্ত কোন দেশের নাগরিক ভারতে কমনওয়েল্থের নাগরিকের সম্মান পায়। পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

এ প্রসঙ্গে যে কথাটা গুরুত্ব সহকারে মনে রাখা দরকার, তা হল, নাগরিকত্ব বিষয়ে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা গৃহীত আইনের মূল উদ্দেশ্য একটি অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গড়ে তোলা। ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এক-নাগরিকত্বের রীতি গ্রহণ করেন। যে অঙ্গরাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই জন্ম হোক না কেন, সকল ভারতীয় নাগরিক একই অধিকার এবং দায়িত্ব ভোগ করেন। জম্মু ও কাশ্মীর এবং কিছু কিছু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অবশ্য বিশেষ কয়েকটি সুবিধা দেওয়া হয়। এছাড়া সংবিধানের 16 অনুচ্ছেদ অনুসারে কয়েকটি বিশেষ নিয়োগের ক্ষেত্রে, যে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিয়োগ করা হচ্ছে, সেখানকার বাসিন্দা হওয়া আবশ্যিক ঘোষণা করতে পারে সংসদ।

আট

মৌলিক অধিকার

অংশ III, অনুচ্ছেদ 12–35

আমাদের মহান মুল্যবোধ, আমাদের ধ্যান ধারণা, স্বাধীনতার জন্য প্রেরণাময় জাতীয় আন্দোলনেব মধ্য থেকে গড়ে ওঠা সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নাগরিক অধিকারের জন্য একটি বিল প্রণয়নকে গণপরিষদের প্রাথমিক কাজ হিসাবে মনে করে। গণ-পরিষদ ও তার বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে শীঘ্রই একটি সুসংহত অধিকারের তালিকা তৈরি করা হয়। সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডঃ অম্বেদকর এই অংশটিকেই "সবচেয়ে সমালোচিত অংশ" বলেছেন। সর্বমোট 38 দিন মৌলিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে উপ-সমিতিতে 11 দিন, পরামর্শদাতা কমিটিতে 2 দিন এবং গণপরিষদে 25 দিন আলোচনা চলে। মানবাধিকাবের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রকাশের পরেই আমাদের সংবিধানে অধিকার সংক্রান্ত বিলটির অন্তর্ভুক্তি সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও মানবিক ধ্যান-ধারণা সঞ্জাত। তাছাড়া, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক রীতিনীতিব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বজনীন ঘোষণার মূলনীতিগুলিকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার জন্য সংবিধান প্রণেতাদের অসীম আগ্রহই প্রমাণ করে এই ঘটনা। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের বিশেষ সমস্যার এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়ার প্রয়োজনই সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সনদটির অন্তর্ভুক্তি জরুরি করে তুলেছিল।

তৃতীয় অংশে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকার, চতুর্থ অংশে উল্লিখিত নির্দেশাত্মক

নীতিসমূহ এবং পরবর্তীকালে IVA অংশে সংযুক্ত কর্তব্যসমূহকে মিলিয়ে যে আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে তা সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। একসঙ্গে এরা মৌলিক মূল্যবোধের ধারক এবং সংবিধান তৈরি করার মূলনীতি বলে বিবেচিত হয়। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ব্যক্তির মর্যাদা মানব-অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মূলমন্ত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে তাকেই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারে মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল্যবোধ আরও সমৃদ্ধ হয়। সংবিধানের মুখবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে আর মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি অধ্যায়ে তাকে আরও বিকশিত করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় অংশে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে। অন্য যে কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনায় আমাদের সংবিধানে মানবাধিকারের বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ঐক্য এবং নাগরিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকরের ভাষায় "আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির যে কথা সংবিধানে বলা হয়েছে তার মূলভিত্তিই হল মৌলিক অধিকার।" (*সন্দুন সিং বনাম রাজস্থান সরকার* AIR 1965 SC 845)। সর্বজনীন ঘোষণার 2-21 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সমস্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথাই মৌলিক অধিকারে বলা হয়েছে। বিচারপতি ভগবতীর ভাষায় ঃ

> বৈদিক যুগ থেকে এদেশের মানুষ যে মূল্যবোধ লালন করেছে মৌলিক অধিকার তাকেই প্রকাশ করেছে। ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই মৌলিক অধিকার। মানবাধিকারের মূল কাঠামোর রক্ষাকর্তা হল মৌলিক অধিকার। তাছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রোধ করার মৌলিক অধিকার। (*মেনকা গান্ধী বনাম কেন্দ্র* AIR 1978 SC 597)।

মৌলিক অধিকারকে ছয়টি বিশেষ শ্রেণীতে রাখা যায়, যথা ঃ

I 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' এবং 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' হওয়ার অধিকার সহ সাম্যের অধিকার (14 অনুচ্ছেদ), জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বা জন্মস্থানের নিরিখে ভেদাভেদ রোধ করা (15 অনুচ্ছেদ), সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ (16 অনুচ্ছেদ) অস্পৃশ্যতা ও উপাধি প্রদান প্রথার অবলুপ্তি (17 ও 18 অনুচ্ছেদ)।

II জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (21 অনুচ্ছেদ) রক্ষা সহ স্বাধীনতার অধিকার। বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ, সমবেত হওয়া, সমিতি গঠন, ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা, ভারতে যে কোনও স্থানে বসবাস করা, যে কোনও বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার (19 নং অনুচ্ছেদ)।

III শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার — সমস্ত ধরনের বলপূর্বক বাধ্যতামূলক শ্রমদান, শিশুশ্রমিক ও দাস প্রথা রদ করা (23 ও 24 অনুচ্ছেদ)।

IV প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম স্বীকার, ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে (25-28 অনুচ্ছেদ)।

V সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি সংক্রান্ত অধিকার। নিজ পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অধিকার (29-30 অনুচ্ছেদ)।

VI এই সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা (32 অনুচ্ছেদ)।

'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' বা 'সমস্ত আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' (14 অনুচ্ছেদ), অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ থেকে রক্ষা (20 অনুচ্ছেদ), জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা (21 অনুচ্ছেদ), কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও আটক করা থেকে রক্ষা। (22 অনুচ্ছেদ), ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (25-28 অনুচ্ছেদ) প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ সব ব্যক্তি ভোগ করেন। আবার কিছু অধিকার আছে যেগুলি কেবলমাত্র নাগরিকরা দাবি করতে পারেন। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে বৈষম্য করা যাবে না (15 অনুচ্ছেদ), সরকারি কাজের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ (16 অনুচ্ছেদ) এবং বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সমাবেশ ও সংঘ গঠনের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেবা, ভারতের যে কোনও স্থানে বসবাস কবা, এবং যে কোনও পেশা গ্রহণের অধিকার (19 অনুচ্ছেদ)।

মূল সংবিধানে 191- (f) ও 31 অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছিল — অর্থাৎ সম্পত্তি অর্জন, ধরে রাখা বা বিক্রি করা মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত হত। অবশ্য নাগবিক স্বার্থে সরকার যে কোনও সম্পত্তি আইনানুগ পন্থায় অধিগ্রহণ করতে পারেন। যাই হোক 1978 সালে সংবিধানের 44তম সংশোধনীর মাধ্যমে 19(1) অনুচ্ছেদেব 1 ধারার (f) উপধাবা এবং 31 নং অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয। সেজন্য সম্পত্তিব অধিকাব এখন আর মৌলিক অধিকার নয়।

সংবিধানেব প্রথম সংশোধনীতে 31A ও 31B অনুচ্ছেদ এবং 25তম সংশোধনেব মাধ্যমে 31C অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জমিদারি অধিগ্রহণের জন্য গৃহীত আইনসমূহ, নবম তফসিলে উল্লিখিত আইনগুলি এবং নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করার জন্য গৃহীত আইনসমূহ রক্ষা করার জন্য ঐ ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত অধিকারগুলি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য সংসদের হাতে ক্ষমতা দেওযা হয়েছে 33-35 অনুচ্ছেদে।

এ কথা সত্য সংবিধানে প্রদত্ত মানবাধিকারের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। অনেকে মনে করেন বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ মৌলিক অধিকার মূল্যহীন। তাছাড়া অনেকে যুক্তরাষ্ট্রেব মতো সংবিধানের হয়ে ওকালতি করে বলেন, কোনও অধিকারই 'মৌলিক' নয় যেহেতু সেই অধিকার 'পরিপূর্ণ নয়। এ জাতীয় সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ অম্বেদকর 4 নভেম্বর গণ পরিষদে বলেন ঃ

> মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত সমালোচনাই একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয়েছে। প্রথমত মৌলিক অধিকার থেকে অ-মৌলিক অধিকারকে আলাদা কবে যে সমালোচনা করা হয়

তা ঠিক নয়। মৌলিক অধিকার অবাধ ও শর্তহীন কিন্তু অন্য অধিকার তা নয় এমন মনে করা ঠিক নয়। দুয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হল অমৌলিক অধিকারসমূহ আলাপ-আলোচনার ফসল আর মৌলিক অধিকার আইনের অবদান। যেহেতু মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের দান সেজন্য রাষ্ট্র তাদের ব্যাখ্যা করতে পারবে না এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় মৌলিক অধিকার অবাধ, এই ধারণা ভুল। সুপ্রিম কোর্ট পুলিশী শক্তির কথা স্বীকার করেছে এবং অবাধ মৌলিক অধিকারের প্রবক্তাদের মুখ বন্ধ করেছে এই যুক্তিতে যে প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে সহজাত পুলিশী শক্তির ব্যবস্থা থাকে। সংবিধানে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কার্যত, দুয়ের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। একটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং অন্য ক্ষেত্রে তা পরোক্ষ। অর্থাৎ, কোনও ক্ষেত্রেই এই মৌলিক অধিকার অবাধ, অসীম নয়।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী বলেন ঃ

সংবিধানের তৃতীয় অংশের মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী আক্রমণের হাত থেকে সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতা ও অধিকারকে রক্ষা করা। (*পঃ বঙ্গ রাজ্য বনাম সুবোধ গোপাল বসু* AIR 1954 SC 92)।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বলেন "জনগণের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আর পৃথিবীর সভ্য সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া"। শাসনতন্ত্র এবং আইনসভা উভয়ের ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার বাধ্যতামূলক।

13 অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে সংবিধান চালু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে চালু যে সমস্ত আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশ মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে সেগুলি অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বা সংকুচিত করে কোনও আইন রাষ্ট্র তৈরি করবে না। এই অনুচ্ছেদের বিরোধী কোনও আইন তৈরি হলে সেটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

অর্থাৎ, এই অনুচ্ছেদের বলে ভারতে তৈরি অতীত ও বর্তমান সমস্ত আইনই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীন। যদিও সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে গৃহীত আইন বর্তমানের কোনও আইনের কোনও ধারার বিরোধী হয় তাহলে তৃতীয় অংশের জন্য পরিপন্থী আইনটি বাতিল গণ্য হবে। তবে তা অতীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না (*হাবিব মহম্মদ বনাম হায়দরাবাদ রাজ্য* AIR 1953 SC 287)। (*আর সি কুপার বনাম ভারত সরকার* AIR 1973 SC 106) সুপ্রিম কোর্ট এই মত ব্যক্ত করেন, যে ব্যক্তি অথবা সমষ্টির অধিকারকে রাষ্ট্র কী চোখে দেখে তার নিরিখে রাষ্ট্রের কাজের মূল্যায়ন হবে।

সংবিধানের 12 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বলতে বোঝানো হয়েছে (i) ভারত সরকার ও ভারতের সংসদ, (ii) প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সরকার এবং সেই রাজ্যের আইনসভা (iii) পৌরসভা, পঞ্চায়েত, জেলা বোর্ড, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি স্বশাসিত সংস্থা

(iv) ভারতের অন্তর্গত ও ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য সংস্থা। শেষোক্ত অন্যান্য সংস্থা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যাই হোক, বলা হয়েছে সংস্থাটি সংবিধান-সৃষ্ট হলে বা যার উপর আইন মোতাবেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই সংবিধি-সৃষ্ট হলে তা 'অন্যান্য সংস্থা'য় অন্তর্ভুক্ত করা হয় — যেমন রাজস্থান বিদ্যুৎ নিগম, কোচিন দেবাসম বোর্ড, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন, সমবায় সংস্থাসমূহ, জীবন বীমা নিগম, অর্থ কমিশন ইত্যাদি। (*রাজস্থান বিদ্যুৎ নিগম বনাম মোহনলাল* AIR 1967 SC 1857; *পি রি এম নাম্বুদ্রিপাদ বনাম কোচিন দেবাসন বোর্ড* AIR 1956 SC 19; *দুঃখরাম বনাম কোঃ অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল এসোসিয়েশন* AIR 1961 MP 219; *সুখদেব বনাম ভগতরাম* AIR 1975 SC 1331)

অন্যদিকে *সভজিৎ তিওয়ারি বনাম ভারত* (AIR 1975 SC 1329) মামলায় সমিতি নিবন্ধ আইন অনুসারে নিবন্ধভুক্ত কিন্তু সংবিধিবদ্ধ নয় এমন একটি সংস্থা কাউনসিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-কে সুপ্রিম কোর্ট "রাষ্ট্র নয়" বলে মত দেন। অপর একটি মামলায় একটি নিবন্ধভুক্ত সমিতিকে "কর্তৃত্ব" বলে রায় দেওয়া হয় 12 অনুচ্ছেদ অনুসারে (*অজয় হাসিয়া বনাম খালিদ মুজিদ* AIR1981 SC 487)।

রমন ডি শেঠি বনাম ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট অথরিটি মামলায় (AIR 1979 SC 1628) সুপ্রিম কোর্ট মত দেন যে সরকারের তরফে কাজ করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে যে সমস্ত সংস্থা তাদের 12 অনুচ্ছেদে কথিত 'কর্তৃত্ব' বা 'রাষ্ট্র' বলে ধরা হবে। তাছাড়া এই প্রশ্ন বিচার করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিছু শর্তের উল্লেখ করেন যেমন আলোচ্য সংস্থাটি পরিপূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত কি না, সমস্ত মূলধনের মালিক সরকার কি না, সংস্থার প্রশাসন সরকার নিযুক্ত পরিচালক দ্বারা চালিত না কি সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত, সংস্থার উপর সরকারের গভীর এবং ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আছে না কি সরকারি আনুকূল্যে সংস্থাটির একচেটিয়া আধিপত্য আছে। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আদালতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিচার করতে হয় সংস্থাটি 12 অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে কি না। বিচার বিভাগ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, যদি কোনও আদালতকে 'রাষ্ট্র' হিসাবে গণ্য করা হয় তাহলে 12 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও রিট হাইকোর্টের প্রতি জারি করা যাবে না তার বিরুদ্ধে। কারণ এই ধরনের রায়ে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলা যায় না। (*নরেশ বনাম মহারাষ্ট্র সরকার* AIR 1967 SC 1; এইচ. এম. সিরাভা-র কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইণ্ডিয়া, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা 155 দেখুন)।

সাম্যের অধিকার

আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত'

সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদে বলা আছে, ভারতের এলাকার মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে আইনেব দৃষ্টিতে সমতা বা আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। শুধুমাত্র নাগরিকদের জন্যই নয়, এই অধিকার সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। "আইনের চোখে সকলেই সমান এবং কোনও রকম ভেদাভেদ না করে আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে"— রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এতে। আমাদের সংবিধানে ব্যবহৃত 'আইনের চোখে সমতা' এবং 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' এই দুটি অভিব্যক্তি কার্যত আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচারের ধারণাকেই দৃঢ় করে। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' বলতে ডাইসির আইনের অনুশাসনকে বোঝানো হয়েছে। অপর দিকে 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' এই অভিব্যক্তিতে বহুবচনের 'আইন' বলতে বিধিবদ্ধ আইন-এর কথা বলা হয়েছে এবং কোনও রকম ভেদাভেদ না করে সমানভাবে তা প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখন অবধি সুপ্রিম কোর্ট এমন কোনও পার্থক্যের কথা বলেননি। বাস্তবে প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রীর অভিমত, দ্বিতীয় অভিব্যক্তিটি প্রথমটির পরিপূরক। এমন অবস্থার কথা ভাবা যায় না, যেখানে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অথচ আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটি ক্ষুণ্ণ হয়নি। (*আনওয়ার আলি সরকার বনাম পঃ বঙ্গ সরকার* AIR 1952 SC 75)।

14 অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য সকল ব্যক্তি বা বস্তু কি রকম পরিস্থিতিতে অভিন্ন ব্যবহার পাবে। সুযোগ সুবিধা বা দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনও রকম পার্থক্য থাকবে না — প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই ভাবে চলবে (AIR 1952 SC 75; *বি. সি. কোং বনাম ভারত সরকার* AIR 1973 SC 106)। সুপ্রিম কোর্ট অভিমত দেন যে প্রায়ই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি, বিবিধ প্রয়োজনে, ভিন্ন ধরনের আচরণ প্রয়োজন হয়। (*চিরঞ্জীলাল বনাম কেন্দ্র* AIR 1951 SC 41) তাই 'আইনের চোখে সমতা'র তত্ত্বটি স্বাভাবিক ভাবেই অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়। কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমপর্যায়ভুক্তদের সঙ্গে ভিন্ন রকম ব্যবহার করলে 14 অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সম ও অসম ক্ষেত্রে ব্যবহার ভিন্নতর হলে 14 অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করা যায় না। অর্থাৎ, শ্রেণী স্বার্থে আইন তৈরি নিষিদ্ধ হলেও যুক্তিসঙ্গত শ্রেণী বিভাজন অস্বীকার করা যায় না। দেখা দরকার এই শ্রেণী বিভাজন কোনও ভাবেই "স্বেচ্ছাচারী, কৃত্রিম বা কৌশলে" এড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া না হয়। সঠিক এবং যুক্তিপূর্ণ পার্থক্যের উপর নির্ভর করেই আইনের মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকর

করার মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয় শ্রেণী বিভাজন। (*আর. কে. গর্গ বনাম ভারত সরকার,* AIR 1981 SC 2138; *প্রভাকর রাও বনাম অন্ধ্র প্রদেশ সরকার,* AIR 1986 SC 210)। এই পার্থক্য ভৌগোলিক অবস্থান, অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা পেশাকে কেন্দ্র করে হতে পারে (*কাশীমোহন বনাম পঃ বঙ্গ* AIR 1958 SC 194)। মেনে নেওয়া যায় এমন শ্রেণীবিভাজনকে বৈধ হতে গেলে অবশ্যই দুটি শর্ত পূরণ করতে হয় (i) বিভাজন এমন সুচতুর হবে যে উভয় তরফের পার্থক্য বোঝা যায়; (ii) আইনে যে উদ্দেশ্যে বিভাজনের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে (*পঃ বঙ্গ সরকার বনাম আনওয়ার আলি সরকার,* AIR 1952 SC 75; *চিরঞ্জিতলাল বনাম ভারত সরকার* AIR 1951 SC 41; *বুধন চৌধুরী বনাম কেন্দ্র* AIR 1951 SC 191; *রামকৃষ্ণ দালমিয়া বনাম বিচারপতি তেণ্ডুলকর* AIR 1958, SC 538; *প্রবোধ ভার্মা বনাম উঃ প্র* (1984) 4 SCC 251; *রাজপাল শর্মা বনাম হরিয়ানা সরকার* (1985) Supp. SCC 72, 75)।

ই. পি. রোয়াপ্পা বনাম তামিলনাড়ু (AIR 1974 SC 555) মামলায় পুরানো ধারনার পরিবর্তে 'সাম্যের অধিকার'-এর নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারের রায়ে ঃ

> সাম্য নানা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্রার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ধারণা। ঐতিহ্য ও তত্ত্বের কথা বলে একে আটকে রাখা যায় না। আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে বলা যায় সাম্য স্বেচ্ছাচারের বিরোধী। সাম্য ও স্বেচ্ছাচার বাস্তবিকই চিরস্থায়ী শত্রু। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের অনুশাসনের মধ্যে সাম্যের অবস্থান আর বংশানুক্রমিক শাসকের ইচ্ছা, খেয়াল-খুশির আরেক নাম স্বেচ্ছাচার। যখন কোনও আইন স্বেচ্ছাচারমূলক হয় তখন তা অবশ্যই রাজনৈতিক বিচার এবং সাংবিধানিক আইনের চোখে অসম রূপেই প্রতিভাত হয় এবং সেজন্য 14 অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়।

বিচারপতি পি. এন. ভগবতী ওই মতের সঙ্গে একমত। তিনি তাঁর ও বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারের তরফে মন্তব্য করেন ঃ

> সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে একটা নীতির কথা বলেছে। সেই নীতি আমাদের প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার মূল কথা এবং শ্রেণীহীন সমতাবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আলোকবর্তিকা। সংবিধান গ্রহণের বিশেষ দিনে নিয়তির সঙ্গে এমন একটা বোঝাপড়া আমরা করেছিলাম। সাম্যের মহান নীতির প্রতি গোঁড়া অনুরাগ বা তার প্রতি নিস্তেজ আনুগত্যের মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার কথা হলে আমরা বিনা দ্বিধায় প্রথমটিকে গ্রহণ করব।

তিনি আরও বলেন ঃ

> 'সাম্যের অধিকার'-এর ধারাটি ব্যাপক অসমতা, প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চায়। প্রতিকূল ধারণার তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে আইনগত অসমতা ও প্রশাসনিক পার্থক্য রূপে দেখা এই ধারার ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শের পরিপন্থী (*এম ছগনলাল বনাম বৃহত্তর বোম্বাই পৌরসভা* AIR 1974 SC 2009, 2029, 2039)।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন রায়ে (*মানেকা গান্ধী বনাম কেন্দ্র* AIR 1978 SC 597; *আর. ডি. শেঠী বনাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংস্থা* AIR 1979 SC 1628; *অজয় হামিয়া বনাম খালিদ মুজিব* AIR 1981 SC 487) বিচারপতি ভগবতী আরও স্পষ্টভাবে 14 অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করেন এবং বিচারালয়ের সংবিধান বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

> এখন ধরে নেওয়া যায় যে সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারণ স্বেচ্ছাচারের অর্থ সাম্যকে অস্বীকার করা। আদালতগুলি শ্রেণীবিভাজনের যে তত্ত্ব হাজির করেছে তা 14 অনুচ্ছেদের শব্দান্তর নয় বা ঐ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যও নয়। বিধানিক বা প্রশাসনিক কোনও কাজ স্বেচ্ছাচারী কি না এবং সে কারণে সাম্যকে খর্ব করছে কি না তা নির্ণয় করার জন্য বিচার বিভাগের স্বীকৃত পদ্ধতি হল শ্রেণীবিভাজন। এই শ্রেণীবিন্যাস যদি যুক্তিসঙ্গত না হয় এবং পূর্বে উল্লিখিত দুটি শর্ত পূরণ না করে তাহলে আলোচ্য আইন বা প্রশাসনিক তৎপরতা স্বেচ্ছাচারের নামান্তর হয় এবং 14 অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়। প্রশাসনিক, বিধানিক বা 14 অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্তৃত্বপূর্ণ কোনও কাজের জন্য, রাষ্ট্র বা সরকার স্বেচ্ছাচারী হলে, একমাত্র 14 অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের কাজকে খর্ব করা যায়। (AIR 1981 SC 487)।

সুপ্রিম কোর্টের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এইভাবে 14 অনুচ্ছেদ প্রয়োগের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এখন কাউকে অন্যের সঙ্গে পার্থক্যের অভিযোগ আনতে হয় না (*এ. এল. কালরা বনাম প্রজেক্ট এ্যাণ্ড ইকুইপমেন্ট করপোরেশন* (1984) 3 SCC 316, 328)। এ কথা পরিষ্কার যে স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক কাজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিভেদমূলক এবং 14 অনুচ্ছেদ ভঙ্গকারী।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-জন্মস্থান-নির্বিশেষে বৈষম্যহীন আচরণ ঃ

14 অনুচ্ছেদে আইনের চোখে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার মূল নীতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, আর 15-18 অনুচ্ছেদে মূলত ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট পরিসরের কথা বলা হয়েছে।

15 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে "শুধুমাত্র" শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। এদের মধ্যে এক বা একাধিক কারণ সহ অন্য কোনও হেতুর জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলে তা এই ধারায় প্রযোজ্য হবে না (*দত্তাত্রয় বনাম বোম্বাই রাজ্য* AIR 1953 BOM 311) আবার বাসস্থানের ভিত্তিতে আনা বৈষম্য অবৈধ হবে না (*ডি. পি. যোশী বনাম মধ্যভারত* AIR 1955 SC 334)।

ওই অনুচ্ছেদের 2 ধারায় বলা হয়েছে, উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদস্থানে প্রবেশ এবং সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের জন্য

উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনও নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না। নিষেধাজ্ঞাটি রাষ্ট্র ও সাধারণ নাগরিক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

15 অনুচ্ছেদের 3 ও 4 ধারায় সাম্যনীতির ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হয়েছে 3 ধারা বলে। আর 4 ধারায় বলা হয়েছে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী এবং তফসিলী জাতি-উপজাতির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সমাজের এই অংশের মানুষের স্বার্থে বেশ কিছু সংরক্ষণের যৌক্তিকতা সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ব্যতিক্রম যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। (*আব্দুল আজিজ বনাম বোম্বে* AIR 1954 SC 321; *মাদ্রাজ বনাম চম্পাকম দোরারিবাজন,* AIR 1951 SC 226)। বিশেষ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত ক্ষেত্রে 14 অনুচ্ছেদও প্রযোজ্য। রায় যদি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা অবশ্যই অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী হবে না (*এন. বসুন্ধরা বনাম মহীশূর রাজ্য* AIR 1971 SC 1439)।

15(4) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণী" নির্ধারণ করা সব থেকে বড় সমস্যা। সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন প্রকার উপাদান বিচার্য হয়ে ওঠে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন, শুধুমাত্র বর্ণের ভিত্তিতে কাউকে অনুন্নত শ্রেণীর বলা যায় না। *চিত্রলেখা বনাম মহীশূর* মামলায় (AIR 1964 SC 1823) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, অনগ্রসরতা বিচার করার ক্ষেত্রে বর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও, বর্ণের উল্লেখ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যদি নাগরিকদের কোনও গোষ্ঠীর বিশেষ অনগ্রসরতা বিচার করতে পারে, তাতে কোনও অসুবিধা নেই। অন্য এক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন 'অনগ্রসরতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বর্ণ এবং দারিদ্র্য দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধুমাত্র বর্ণ বা একমাত্র দারিদ্র্য বিচার্য হতে পারে না। (*কে. এস. জয়শ্রী বনাম কেরালা* AIR 1976 SC 2381; *ছোটালাল বনাম উত্তরপ্রদেশ* AIR 1979 All 135)।

অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ

সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য সংরক্ষণ সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে। তফসিলী জাতি উপজাতির বাইরে অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে কোনও ধরনের সংরক্ষণ সব পরিস্থিতিতেই বৈষম্যমূলক। এর কারণ তা সাম্য-নীতির পরিপন্থী। এই ধরনের ক্ষেত্রে মেধার প্রশ্নে নিম্নমানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার ফলে অনেক যোগ্য প্রার্থীর মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। সংরক্ষণের বৈধতা নির্ভর করে তা যুক্তিগ্রাহ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতার উপর।

বিভিন্ন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট বৈষম্যমূলক শ্রেণী-বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার গ্রামাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা ও উত্তরাখন্ড অঞ্চলের জন্য আসন সংরক্ষণ করে এক নির্দেশ জারি করেন। *উঃ প্রঃ সরকার বনাম প্রদীপ ট্যাণ্ডন* (AIR 1975 Sc 563) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, গ্রামীন এলাকা থেকে আসা পরিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ অসাংবিধানিক, কিন্তু পাহাড়ী এলাকা ও উত্তরাখন্ডের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বৈধ। সুপ্রিম কোর্টের অভিমত — ঐ অঞ্চলগুলি সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসর। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেন রাজ্যের জনসংখ্যার ৪0%, যাঁরা গ্রামাঞ্চলে থাকেন, তাঁদের জন্য সংরক্ষণ সমশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। একই ভাবে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে জেলার জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলাগুলির জন্য আসন সংরক্ষণ সুপ্রিম কোর্ট বৈষম্যমূলক বলে উল্লেখ করেছেন (*পি. রাজেন্দ্রন বনাম মাদ্রাজ* AIR 1971 SC 2303)। যাই হোক, চান্ধালা মামলায়, কেরালার মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির জন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে আসন বণ্টনকে বৈধ ঘোষণা করা হয় (*মহীশূর বনাম ডি. এন. চান্ধালা* AIR 1971 SC 1762)।

সরকারি চাকরিতে সমান অধিকার

16 অনুচ্ছেদের 132 ধারা অনুসারে সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে কোনও একটি কারণের জন্য কোনও নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের অযোগ্য বিবেচিত হবেন না বা তাঁর প্রতি কোনও বিভেদমূলক আচরণ করা হবে না। অবশ্য 3, 4 ও 5 ধারায় তিনটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেখানে সমান অদিকারের বিচ্যুতি হতে পারে। যথা 132 নং ধারার সাধারণ নীতি থেকে একটি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কতটা বিচ্যুতি ঘোষণা করতে পারে তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে 3নং ধারায়। এই ক্ষমতা বলে সংসদ 'সরকারি নিয়োগ (বাসস্থান সম্পর্কিত) আইন 1957' গ্রহণ করে। এর ফলে সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার প্রচলিত আইনসমূহ বাতিল হয়ে যায়। নির্দিষ্ট রাজ্যের বাসিন্দা না হওয়ার জন্য কাউকে আর সরকারি চাকরিতে অযোগ্য বলা যায় না। অবশ্য হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা ও অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে এই আইনের প্রয়োগ 5 বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয় এলাকাগুলির অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে। *নরসিমা রাও বনাম অন্ধ্র প্রদেশ* (AIR 1970 SC 422) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আইনটিকে অংশত অবৈধ বলেন। তাঁদের মতে, বাসস্থানগত যোগ্যতা সংসদ যে কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে জারি করতে পারে তবে অবশ্যই রাজ্যের কোনও

অংশের জন্য নয়। 16 অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হিসাবে 4 ধারায় বলা হয়েছে, অনুন্নত শ্রেণীর কোনও বিশেষ অংশ রাজ্যের সরকারি চাকরিতে যথোপযুক্ত ভাবে প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে না বলে রাষ্ট্রের মনে হলে, তাদের স্বার্থে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করতে পারে. এই সঙ্গে কোনও অধিকার বা দাবি সম্পৃক্ত নয়। (*রাজস্থান বনাম কেন্দ্র* AIR 1968 SC 507) *এন. এস. টমাস* মামলায় (AIR 1976 SC 490) বলা হয়েছে যে এটা 1 ধারায় সাম্যের অধিকারের যে কথা বলা হয়েছে, জোরালোভাবে তারই সমার্থক কেননা এখানে সাম্য মানে একই শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে সাম্য। কখনই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সাম্য নয়। সেজন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর তফসিলী জাতি, উপজাতিদের সরকারি চাকরিতে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নেই এই কারণে আলাদাভাবে বিচার করা খুবই যুক্তিযুক্ত। (*এ. বি. এম. কে সংঘ (রেলওয়ে) বনাম কেন্দ্র* AIR 1981 SC 298)।

16(4) অনুচ্ছেদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত একটাই। রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকরা উপযুক্তভাবে প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে কি না। তাছাড়া এই শর্ত শুধুমাত্র সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়, গুণমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সংরক্ষণ শুধুমাত্র সরকারি নিয়োগেব ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন পদে মনোনয়ন বা পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। (*দক্ষিণ রেলওয়ে বনাম রঙ্গাচারী,* AIR 1962 SC 36; *সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক বনাম কে. এম. জগন্নাথ,* (1986) 2 Scc 679)। যাই হোক, অতিরিক্ত সংরক্ষণ ভাল নয় এবং সংরক্ষণকে কোনও অবস্থাতেই 16(1) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার খর্ব করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। *দেরাদাশম বনাম কেন্দ্র* (AIR 1964 SC 179) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অধিকাংশের রায়ে (4-1) "জের টানা নিয়ম"-কে অবৈধ ঘোষণা করে বলেন, সংবিধানেব 16(4) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, যার ফলে পিছিয়ে পড়া অংশ ব্যতীত অন্যরা সরকারি চাকরির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট আরও ঘোষণা করেন, কোনও একটি বছরে শতকরা 50 ভাগের বেশি পদ সংরক্ষণ অসাংবিধানিক, কারণ তা নিজেই 16(1) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডল কমিশন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য শতকরা 27 ভাগ সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে। মণ্ডল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 16 নভেম্বর 1992 অধিকাংশের মতে (6-3) স্থির করেন যে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য শতকরা 27 ভাগ সংরক্ষণ সঠিক। কিন্তু এদের মধ্যে অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ "নবনীর উপরিভাগ" বা 'ক্রিমি লেয়ার' কে সুবিধা প্রার্থীদের তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সংরক্ষণ শুধুমাত্র প্রাথমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে কেননা 16(4) অনুচ্ছেদ পদোন্নতিতে সংরক্ষণ

অনুমোদন করে না। এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সংরক্ষণ কোনও অবস্থাতেই শতকরা 50 ভাগের বেশি হবে না। "নাগরিকদের পিছিয়ে পড়া অংশ" এই শব্দের কোনও ব্যাখ্যা সংবিধানে দেওয়া হয়নি। কিন্তু 16(4) অনুচ্ছেদে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেহেতু সামাজিক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিচারে অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারণ করা যায় না। সংরক্ষণের প্রচলিত কোনও ছকেই পড়ছে না। অথচ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের জন্য শতকরা 10 ভাগ সংরক্ষণ করার সুপারিশ সেজন্য আদালত বাতিল ঘোষণা করেন। অপর দিকে আদালত মনে করেন বর্ণ সামাজিকভাবে শ্রেণী হিসাবে গণ্য হতে পারে। "যদি তা সামাজিকভাবে অনগ্রসর হয় তবে সংবিধানের 16(4) অনুচ্ছেদের বিচারে সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীরূপে বিবেচিত হবে।" তাছাড়া বেশ কিছু অহিন্দু সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া দল, উপদল, গোষ্ঠী 16(4) অনুচ্ছেদের আওতায় পড়বে। সেজন্য এ কথা ভুল হবে যে 16(4) অনুচ্ছেদ অনুসারে অনগ্রসর শ্রেণী এবং 15(4) অনুচ্ছেদের সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী একই। যদিও 15(2) ও 16(2) অনুচ্ছেদে অনগ্রসরতা বিচার করার ক্ষেত্রে বর্ণকে গুরুত্ব দিতে বারণ করা হয়েছে এবং 15(4) ও 16(4) অনুচ্ছেদে "শ্রেণী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে বলা হয়েছে "অনগ্রসর শ্রেণী শনাক্তকরণের সময় বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার পাশাপাশি বর্ণও অবশ্য বিচার্য"। রায়ে বলা হয়েছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষণ যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন কারিগরী পদ, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভৌতবিজ্ঞান এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগ। আবার বিভিন্ন উচ্চপদেও সংরক্ষণ রাখা উচিত নয়। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যাপক, বিমানবহরে বৈমানিক, পরমাণু দপ্তরের বৈজ্ঞানিক সহ গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ।

সরকারি চাকরিতে সমান অধিকারের সাধারণ নিয়মের তৃতীয় ব্যতিক্রম 16 অনুচ্ছেদের 5 ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

অস্পৃশ্যতার বিলোপ

সংবিধানের 17 অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে কোনও ভাবে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অস্পৃশ্য আচরণ করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশেষ কয়েকটি বর্ণের মানুষকে 'অস্পৃশ্য' করে রাখার যে অমানবিক প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে তা বন্ধ করাই এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য। সুপ্রিম কোর্টের মতে 17 অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে মৌলিক অধিকার

ঘোষণা করা হয়েছে তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হল এই অধিকার যাতে খর্ব না হয় তা লক্ষ্য রাখা। (*পিপলস্ ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট্স্ বনাম কেন্দ্র* AIR 1982 SC 1473)। অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন 1955 পরবর্তীকালে সংশোধিত হয় নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন 1955 নামে। এই আইনে অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা আছে।

উপাধির বিলোপ

সংবিধানের 18 অনুচ্ছেদ ভারতীয় নাগরিক বা বিদেশী কাউকেই উপাধি প্রদান করতে নিষেধ করেছে। সামরিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতিতে উপাধি দেওয়া অবশ্য এর আওতায় পড়ে না। এই অনুচ্ছেদের 2 ধারায় কোনও ভারতীয় নাগরিকের বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে উপাধি গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 3 ধারায় বলা হয়েছে, কোনও বিদেশি ভারত সরকারের কাজে কর্মরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনও রাষ্ট্রের কাছ থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারে না। 4 ধারানুযায়ী ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া কোনও পুরস্কার, দক্ষিণা বা পদ কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না।

বেশ কিছু কাল যাবৎ প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী নামক অসামরিক পুরস্কার প্রদান করছেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে এই পুরস্কার প্রদান সংবিধানের 18 ধারা বিরোধী কি না। বিষয়টি বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের কারণে কোনও উপাধি গত কয়েক বছর প্রদান করা হয়নি। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহৃত হলেও 1994, 1995 এবং 1996-এও কোনও উপাধি দেওয়া হয়নি।

স্বাধীনতার অধিকার

সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে ভারতীয় নাগরিকদের ছয়টি মূল স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, যথা :- বক্তব্য ও মতামত প্রকাশ; শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে মিলিত হওয়া; সংঘ ও সমিতি গঠন; ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা; ভারতের যে-কোনও অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করা; যে কোনও বৃত্তি, পেশা গ্রহণ বা ব্যবসা বাণিজ্য করা। এই অধিকারগুলিকে একত্রে "নাগরিকের সহজাত অধিকার" বলা হয় (*পঃ বঙ্গ সরকার বনাম সুবোধ গোপাল বসু* AIR 1954 SC 92, 95)। একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি যথেষ্ট নয় বলে আদালত মনে করেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসাবে আদালত তার রায়ে আরও কিছু স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন —19 অনুচ্ছেদে,

যদিও তাদের নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। (*মানেকা গান্ধী বনাম কেন্দ্র* AIR 1978 SC 597) যেমন বাঁচার অধিকার (*জগমোহন সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার* AIR 1973 SC 947) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ও ভোট দেওয়া (*এন. পি. পুন্নুস্বামী বনাম রিটার্নিং অফিসার* AIR 1952 SC 64, 71) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (*ব্রিজভূষণ বনাম রাষ্ট্র,* AIR 1950 SC 129) সরকারি চাকুরের চাকরিতে বহাল থাকার অধিকার (*পি. বালখোটিয়া বনাম কেন্দ্র* AIR 1958 SC 232, 238), ধর্মঘট করার অধিকার (*আর. এস. শর্মা বনাম পি. এম. জি. নাগপুর* AIR 1965 SC 311, 313) জানার অধিকার (*এল. কে. কুলওয়াল বনাম রাজস্থান সরকার* AIR 1988 Raj 2)।

রাষ্ট্রের আক্রমণের হাত থেকে ছ'টি স্বাধীনতা রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। যদিও এই অধিকার চূড়ান্ত ও সীমাহীন নয় — বিচারপতি দাসের মতে, "ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজের স্বার্থ আরও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কাছে অবদমিত হতেই পারে।" (*এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ* AIR 1950 SC 27) এজন্য 19 অনুচ্ছেদের 2-6 ধারায় আইন প্রণয়ন করে "যুক্তিসঙ্গত" বাধা-নিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। যেমন, "ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে; রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা; বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক; শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা; শ্লীলতা ও সদাচার; আদালত অবমাননা ও মানহানি প্রতিরোধ করা এবং অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করা।" আইন করে এই বিধি-নিষেধ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। যেন কখনই স্বেচ্ছাচার ও বাড়াবাড়ি না হয়। আদালতের সন্তোষ বিধানের জন্য সব কিছু প্রমাণের দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্ট্রের (*খায়েরবাড়ি চা কোম্পানি বনাম আসাম* AIR 1964 SC 925) বিধিনিষেধ যত কঠিন হবে যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রমাণের দায়িত্ব ঠিক ততটা কঠোর হবে (সাগির আহমেদ বনাম উঃ প্র, AIR 1954 SC 728, 738)।

যেহেতু সংবিধানে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধের ব্যাখ্যা দেওয়া নেই সেজন্য প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব মেধায় বিচার করতে হবে। বিধি-নিষেধ জারির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, তার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তা, কাঙ্খিত ফল এবং বিধি-নিষেধ জারি করার সময় পরিস্থিতি ও তার মেয়াদ অবশ্যই বিচার্য বিষয় (*মাদ্রাজ বনাম ডি. জি. রাও* AIR 1952 SC 196) এই মানদণ্ড যথেষ্টই স্থিতিস্থাপক এবং সময়, গতি ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (*গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1967 SC 1643, 1655)।

বিধি-নিষেধের যৌক্তিকতা বিমূর্ত ভাবনা থেকে নয়, বাস্তব বিশ্লেষণ করেই যাদের ওপর আরোপ করা হচ্ছে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। (*হানিফ কুরেশী বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1958 SC 751) একটা আইনের প্রভাব থেকেই তার যৌক্তিকতার পরীক্ষা হয়, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে নয়। এবং

শুধুমাত্র মূল বিষয় নয়, "তার প্রথাগত পদ্ধতিও যৌক্তিকতার বিচার্য বিষয়" (*এন. বি. খারে বনাম দিল্লী রাজ্য* AIR 1950 SC 11; *কৃষাণ চন্দ্র অরোরা বনাম পুলিশ কমিশনার* AIR 1961 SC 705); বিধি-নিষেধ জারির ক্ষেত্রে অবশ্যই 19(1) প্রদেয় স্বাধীনতা এবং 19(2)-(6) প্রদত্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যথোপযুক্ত ভারসাম্য রাখতে হবে (*ডি. পি. লক্ষ্মীনারায়ণ বনাম উঃ প্র* AIR 1954 SC 224, 227), রাজ্য পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা তাদের যৌক্তিকতাই স্বীকার করে (*এফ. এন. বালসারা বনাম বোম্বে রাজ্য* AIR 1951 SC 318, 328)।

বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত। গণতন্ত্র মানে যুক্তি পরামর্শের সরকার এবং যে ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সহ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অবাধ আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে না, তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রীর নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে এর গুরুত্ব বোঝা যাবে;

> "বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে কোনও গণতান্ত্রিক সংগঠনের মূল স্তম্ভ। অবাধ রাজনৈতিক আলোচনা ব্যতিরেকে গণচেতনা বিকশিত হয় না। আর লোকপ্রিয় সরকারের কাজকর্ম সঠিকভাবে করতে গেলে গণচেতনা, গণশিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতার এত ব্যাপকতা অপপ্রয়োগের আশঙ্কা জাগায়। সংবিধান প্রণেতারা মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর জনক ম্যাডিসনের দ্বারা প্রভাবিত, যিনি মনে করতেন সঠিক ফলদায়ক ডালকে আঘাত করে যদি ক্ষতিকারক ডাল ছাঁটতে হয় তাহলে তাদের বাড়তে দেওয়াই ভাল। (*রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1950 SC 124, 128)।

19(1)(9) অনুচ্ছেদ প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। যদিও এটি নির্দিষ্টভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে না তবু এই অধিকার বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। "সামাজিক ও রাজনৈতিক মত বিনিময়ের প্রধান শর্তই হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। আদালতের প্রাথমিক দায়িত্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তুলে ধরা এবং সংবিধানের ঘোষণাকে অস্বীকার করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপন্থী যে সমস্ত আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশ থাকবে তাদের বাতিল করা।" (*এক্সপ্রেস নিউজ পেপার্স প্রাঃ লি বনাম কেন্দ্র* AIR 1958 SC 578) অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক তাঁর মত, বিশ্বাস, ধারণা কোনও রকম বাধা ব্যতিরেকে ভাষায়, লেখায়, তুলিতে, মুদ্রণে বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে পারবেন। ফলে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালু করা অথবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবাদ ও মতামত প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বাক্ ও মত

প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। (*বীরেন্দ্র বনাম পাঞ্জাব* AIR 1957 SC 896) ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়েও নাগরিকরা এই অধিকার ভোগ করেন (ভগবতী জে-*মানেকা গান্ধী বনাম কেন্দ্র মামলায়,* AIR 1978 SC 597)। 19(2) অনুচ্ছেদ অনুসারে এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় নিম্নলিখিত কারণে (1) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা (2) বিদেশি রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক (3) জনশৃঙ্খলা (4) শ্লীলতা ও সদাচার (5) আদালত অবমাননা (6) মানহানি (7) অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা (8) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ঃ শুধুমাত্র ব্যাপক এবং মারাত্মক গণ-বিক্ষোভের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠতে পারে। অন্যভাবে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে। অর্থাৎ যদি এমন কোনও মত প্রকাশ বা ভাষণ দেওয়া হয় যার ফলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে মারমুখী হয়ে ওঠে অথবা খুন করে তবে তা 19(2) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ আরোপ করার পক্ষে যথেষ্ট। (*শৈলবালা দেবী বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1952 SC 329) এমন ভাষণ যা সরকারকে উৎখাত করতে পারে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য (*সন্তোষ সিং বনাম দিল্লী প্রশাসন* AIR 1973 SC 1901)। 1951 সালে সংবিধান সংশোধন করে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নটি বিধি-নিষেধের আওতায় আনা হলেও মারামারি, বে-আইনী সমাবেশ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো সাধারণ অপবাধ 19(2) অনুচ্ছেদের এক্তিয়ারে পড়ে না।

বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঃ সংবিধানের প্রথম সংশোধনটি হয় 1951 সালে। এর ফলে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় — মূলত ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসূত ধারাবাহিক মিথ্যা প্রচার বন্ধ করার জন্য। অনেকেই অবশ্য এই পদক্ষেপটিকে, সরকারের বিদেশ নীতির সমালোচনা বন্ধ করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেন।

জনশৃঙ্খলা ঃ রমেশ থাপার মামলায় (AIR 1950 SC 124) সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে 1951 সালের সংবিধান সংশোধনের সময় এই বিষয়টি গৃহীত হয়। ঐ মামলায় বলা হয় আইন-শৃঙ্খলার সাধারণ এবং আঞ্চলিক অবনতির জন্য বাক্ ও মত প্রকাশের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় না। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন বৃহত্তর পটভূমিকায় বিচার করা উচিত কারণ "সরকারের জারি করা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ফলে রাজনৈতিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে তা-ই হল জনশৃঙ্খলা।"

শ্লীলতা ও সদাচার ঃ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে কোনও পরিষ্কার অর্থ ছাড়াই, বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য এই শব্দগুলি অন্তর্ভুক্তির অর্থ দূষিত ও কলুষিত কাজ থেকে সমাজকে রক্ষা করা। ভারতীয় দণ্ডবিধির 292-294 ধারায় অশোভন অশ্লীল আচরণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে কারণ "অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে আইনটি বলবৎ আছে তা নাগরিকদের শ্লীলতা ও সদাচারকে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া বেশি কিছু করে না।" (*রণজিৎ উদেসী বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1965 SC 881) ইংলন্ডে আর ভি হিকলিন (LR3 QB 360) মামলায় 'লেডি চ্যাটার্লিস লাভার' বইটিকে পাঠক মন দূষিত করার জন্য "অশ্লীল বই" রায় দেওয়ার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিল আলোচ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সেই পথ গ্রহণ করেন।

আদালত অবমাননা ঃ আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার যে ক্ষমতা আদালতের আছে, তা বজায় রাখার জন্যই মৌলিক অধিকারের উপর এই বিধি-নিষেধ। সংবিধানের 129 ও 215 অনুচ্ছেদ যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টকে তাদের অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 129 অনুচ্ছেদে যে অবমাননা আইন আছে তা 19(2) অনুচ্ছেদ অনুসারে যুক্তিসঙ্গত (*সি কে দফতরি বনাম ও পি. গুপ্তা* AIR 1971 SC 1132)। *ই. এম. এস. নামবুদিরিপাদ বনাম টি. এম. নাম্বিয়ার* মামলায় (AIR 1970 SC 2015), সুপ্রিম কোর্ট অভিমত দেন যে আদালত অবমাননার স্পষ্ট, দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে বাক্ স্বাধীনতা সব সময় প্রাধান্য পাবে। যাই হোক, সাম্প্রতিক কালে অবমাননার প্রশ্নে আদালত উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে (AIR 1978 SC 727; AIR 1978 SC 489 দেখুন)। *ফারুক আবদুল্লা বনাম এম আর চারার* (AIR 1984 SC 615) মামলায় আদালত বলেন ঃ

> যে কোনও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা, সেই প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ দেয়। আদালত এমন ধারণা তৈরি করতে চায় না যে তারা সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং তাদের কাজের আর কোনও উন্নতির প্রয়োজন নেই।

মানহানি ঃ বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ অপরের মানহানি করা নয়। ভারতের দণ্ডবিধিব 499 ধারা মানহানির আইনের ব্যাখ্যা করে বলেছে, কোনও মানুষকে ঘৃণা, বিদ্রূপ এবং অপমান করা এই আইনের আওতায় পড়ে। আদালত এই অভিমত গ্রহণ করেছে।

অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা ঃ বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংযত করতে 1951 সালে এই কারণটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের মতে, হত্যার

প্ররোচনা বা ঐ জাতীয় উগ্র অপরাধ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। তাই এই কারণে আরোপিত বিধি-নিষেধ 19(2) অনুচ্ছেদের পরিপূরক (*শৈলবালা দেবী বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1952 SC 329)।

ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি ঃ 1963 সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। কেউ যাতে ভারতের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলতে না পারে বা ভারতের কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রচার চালাতে না পারে সেজন্যই এই প্রচেষ্টা।

সমাবেশের স্বাধীনতা

সভা, মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। এগুলি জনগণকে অবগত করা, শিক্ষিত করা এবং স্বমতে আনার মাধ্যম। 19(1)(b) অনুচ্ছেদ প্রত্যেক "নাগরিকের শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র সমাবেশ" নিশ্চিত করে। এই স্বাধীনতাই কার্যত, জনসভা, বিক্ষোভ সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ডাকার অধিকার প্রদান করে। (*বাবুলাল বনাম মহারাষ্ট্র,* AIR 1961 SC 884) যে কোনও সমাবেশের ক্ষেত্রে দুটি সহজাত নিষেধাজ্ঞা হল — প্রথমত, সমাবেশ শান্তিপূর্ণ হবে ও দ্বিতীয়ত, তা নিরস্ত্র হবে। এছাড়াও উপধারা বলে প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় "ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির স্বার্থে অথবা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।" সেজন্য কোনও সমাবেশকে বে-আইনি ঘোষণা করা হলে, তা বৈধভাবেই বাতিল হয়ে যায় এবং সমবেত জনগণকে স্থানত্যাগ করতে বলা হয়।

সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা

19(1)(c) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব নাগরিকেরই সমিতি গঠনের অধিকার আছে। (4) উপধারায় "রাষ্ট্রের সংহতি ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে অথবা শান্তি-শৃঙ্খলা ও সদাচারের স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে যে সমিতি গঠন করা হয় তা রাজনৈতিক দল, সোসাইটি, সংঘ, কোম্পানি, বিভিন্ন সংস্থা, অংশীদারি সংস্থা, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি সব কিছুই হতে পারে। যুক্তিপূর্ণ বিধি-নিষেধের আওতায় আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সবার আছে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন 19(1)(c) অনুচ্ছেদটির উদার ব্যাখ্যা করা হলেও শ্রমিকদের ধর্মঘট করার যথেচ্ছ অধিকার বোঝায় না। শিল্পভিত্তিক আইনের দ্বারা শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। (*সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি বনাম জাতীয় শিল্প ট্রাইবুনাল* AIR 1962 SC 171) একইভাবে কাউকে সরকার নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের সদস্য হতে বাধ্য করা যায় না (*রঘুবীর দয়াল বনাম কেন্দ্র* AIR 1962 SC 263)। 9

ধারায় 'সদাচার' শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে "জনগণের সৎ আচরণ" পরিবর্তে "সৎ আচরণ বলতে জনগণ যা বোঝেন" অন্তর্ভুক্ত করা যায় (*মনোহর বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1984 Bom 47)।

স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার

"ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার" এবং "যে কোনও অঞ্চলে বসবাস করার" অধিকার, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে 19(1) অনুচ্ছেদের d ও e ধারায় স্বীকৃত। এই দুটি ধারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। দুটি ধারাই অখণ্ডতার উপর গুরুত্ব দেয়। যে কোনও নাগরিক ভারতের যে কোনও স্থানে যেতে অথবা বাস করতে পারে। 19 অনুচ্ছেদের 5 ধারা বলে "জনস্বার্থে অথবা তফসিলভুক্ত উপজাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে" যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করা যায়। চলাফেরা ও বাস করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে দুটি অধিকারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণভাবে এই দুটি অধিকার প্রদত্ত সুরক্ষা বিতাড়ন বা নির্বাসন নির্দেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আবাহন করা হয়। *এন. বি. খারে বনাম দিল্লী প্রশাসন* মামলায় (AIR 1950 SC 211) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, নির্বাসন আদেশ জারি করা হয় প্রশাসনের ইচ্ছানুসারে এবং এই আইনের বিচার বিভাগীয় কোনও পর্যালোচনার সুযোগ নেই, শুধুমাত্র যুক্তিতে আইনটিকে বাতিল করা যায় না। অপর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেন, 'ছাড়পত্র বিধি' (পাকিস্তান আগত শরণার্থী নিয়ন্ত্রণ, আইন 1949) ভঙ্গ হয়েছে, শুধুমাত্র এই ধারণা থেকে বা এমন কাজ করা হয়েছে এ রকম যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বশে যে আইন একজন নাগরিককে তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার মত চরম শাস্তি দিতে পারে — তাকে আর যাই হোক জনস্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ বলা যায় না। (*ইব্রাহিম ওয়াজের মভৎ বনাম বোম্বে রাজ্য* AIR 1954 SC 229) মূলত আসামের উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা এবং রীতিকে রক্ষা করার জন্য তফসিলী উপজাতিদের স্বার্থে বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে। বহিরাগতরা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অবাধে প্রবেশ করলে উপজাতি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। (*ধন বাহাদুর ঘোরতি বনাম রাজ্য,* AIR 1959 Art 1961 দেখুন)

পতিতাবৃত্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পতিতাদের বাস করা ও ব্যবসা করতে বাধ্য করে জারি করা নিষেধাজ্ঞাকে বৈধ বলে আদালত রায় দেন (*ইউ. পি. রাজ্য বনাম কৌশল্যা* AIR 1964 SC 416)। অনুরূপভাবে স্বভাব অপরাধীদের ক্ষেত্রে যে কোনও স্থানে বাস করার অধিকারের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা যুক্তিপূর্ণ বলে ঘোষিত হয় (*মাদ্রাজ বনাম অরুময়নুগম* AIR 1953 SC 664)।

বৃত্তি বা পেশাগ্রহণের স্বাধীনতা

সংবিধানের 19(1)(g) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক যে কোনও বৃত্তি, পেশা গ্রহণ করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকারী। নিজের ইচ্ছামতো ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার ব্যবসা করার অধিকারের আইনেরই অন্তর্গত। (*হাথিসিং ম্যানুঃ কোঃ বনাম কেন্দ্র* AIR 1960 SC 923) অর্থাৎ কোন নাগরিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবসা করতে বাধ্য করা যায় না। *এক্সেল ওয়্যার বনাম কেন্দ্র* (AIR 1979 SC 25) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেন, মালিক যখন তাঁর কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন দিতে পারেন না, তখন কোনও ব্যবসা বন্ধের স্বীকৃতি দেওয়া বা না-দেওয়া অবান্তর। কিন্তু অন্যান্য অধিকারের মতো এই অধিকারটি সম্পূর্ণ বিধি-নিষেধ মুক্ত নয় এবং রাষ্ট্র "জনস্বার্থে" যে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তেজক ওষুধপত্র, উগ্র পানীয়, ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের মতো ক্ষতিকর বিপজ্জনক দ্রব্যাদি বা মহিলা ও শিশুদের লেনদেন নিয়ে কোনও ব্যবসা করার মৌলিক অধিকার থাকতে পারে না।

19 অনুচ্ছেদের 6 ধারায় রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত বা প্রযুক্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে বা কয়েকজনকে অংশত বা পূর্ণত সরিয়ে দিয়ে কোনও ব্যবসা চালাতে পারে। কার্যত রাষ্ট্র যে কোনও ব্যবসার জাতীয়করণ করতে পারে। এক্সেল ওয়্যার মামলায় আদালত বলেন, জাতীয়করণ ও সরকারি অধিগ্রহণে শিল্পের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা যায়, কিন্তু শিল্পে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত এবং বাস্তবে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৃহত্তম অংশই ব্যক্তি মালিকানাধীন। সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলির অংশীদাররা ব্যাপক সংখ্যক শিল্পের মালিক হন। দাতা ও গ্রহীতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মানুষ এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত থাকেন। সমাজতন্ত্র এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ অস্বীকার করতে পারে না (AIR 1979 SC 36; *নিউ বিহার বিড়ি লিভ্স কোঃ বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1981 SC 679) তাছাড়া ব্যবসায় একচেটিয়া ক্ষমতার সমর্থনে রাষ্ট্রকে "যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ বা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয়" বলে যুক্তি দেখাতে হয় না (*সাগীর আমেদ বনাম ইউ. পি.* AIR 1954 SC 728; *P.T. Society বনাম RTA* AIR 1960 SC 801) কার্যত 19(1)(g) অনুচ্ছেদের বৈধতা নিয়ে কোনও আপত্তি তোলা যায় না। যদি রাষ্ট্র কিছু নাগরিক বা সব নাগরিককে বাইরে রেখে অংশত বা পূর্ণত একচেটিয়া ব্যবসা করে।

অপরাধীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা

যে সমস্ত ব্যক্তি কোনও অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছে, সংবিধানের 20 অনুচ্ছেদে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে 44 তম সংবিধান-সংশোধনীতে বলা হয়েছে, এমন কি জরুরি অবস্থার সময়েও 359 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দেশ জারি করে এই অধিকার সঙ্কুচিত করা যাবে না।

এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো আইন ঃ 20(1) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। এবং সেই শাস্তিও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় দেশের আইন অনুযায়ী যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, কোনও অবস্থাতেই তার বেশি হবে না।" এজন্যই আইনসভা অতীত হতে কার্যকরী এমন কোনও ফৌজদারি আইন প্রণয়ন করতে পারে না। অতীত থেকে কার্যকরী আইনের বিরুদ্ধে এই রক্ষাকবচ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও দয়া প্রদর্শন করে (*কে. কে. সুব্রামানিয়ন রামস্বামী বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1977 SC 2091) কিন্তু নিবর্তনমূলক আটক (প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন) আইনের ক্ষেত্রে অনুকম্পা প্রার্থনা করা যায় না (*প্রহ্লাদ বনাম বোম্বে* AIR 1952 Bom) অথবা কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাপত্তা চাইবার সময়েও নয় (*বিহার রাজ্য বনাম শৈলবালা* AIR 1952 SC 329)। এ কথা মনে রাখা দরকার যে 20(1) অনুচ্ছেদে যে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, তা শুধুমাত্র ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিচারাধীন ব্যক্তিদের জন্য নয়। এমন কি দেওয়ানি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রেও নয়। (*শিব বাহাদুর সিং বনাম বিন্ধ্যপ্রদেশ* AIR 1963 SC 394; *সুকুমার পাইরে বনাম কেন্দ্র* AIR 1966 SC 1206; *জি পি নায়ার বনাম রাষ্ট্র* AIR 1919 SC 602 *এবং জে রাম বনাম পেপসু রাজ্য* AIR 1962 SC 1246; *এস. কে. ঘোষ বনাম পঃ বঙ্গ* AIR 1963 SC 255)। 1 ধাবায় 'খেসারত' শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে 'অর্থদণ্ড দিতে হবে অথবা স্বাধীনতা হানির জন্য ফল ভোগ করতে হবে'। (*শিব দত্ত রায় ফতে চাঁদ বনাম ভারত* AIR 1984 SC 1194; *আর. এস. যোশী বনাম অজিত মিল্‌স লি* (1977) 4 SCC 98)।

দ্বৈত বিবাদ ঃ 20 অনুচ্ছেদের 2 ধারায় দ্বৈত-বিপদের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে "একই অপরাধে কোনও ব্যক্তিকে একবারের বেশি আটক করা যাবে না বা শাস্তি দেওয়া যাবে না।" নিরাপত্তার প্রশ্নে 'আটক' ও 'শাস্তি' দুটি শব্দকে একই সঙ্গে ধরতে হবে। ফৌজদারী কার্যবিধি 300 ধারায় মেনে নেওয়া হয়েছে এবং জেনারেল ক্লজে আইনের 26 ধারাতেও। 1 ধারায় যে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা আদালত বা বিচার বিভাগীয় সালিশীতে প্রদত্ত শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতঃপর একজন সরকারি কর্মচারী কোনও অপরাধের জন্য আদালতে শাস্তি পেলে সেই অপরাধের জন্য তাকে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া যায়। (*এম. সি. বোঘেলা বনাম এস. ডি. মেহতা* AIR 1966 Guj 233) একইভাবে একজন ব্যক্তিকে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়ার পরও আদালতে অভিযুক্ত করা যায়। (*ভেঙ্কটরমন বনাম ভারত,* 1954 SC 375)। 20(2) অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র ফৌজদারি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেজন্য দেওয়ানি আদালতে কোন নিষেধাজ্ঞা অমান্য সহ অপরাধমূলক কাজের জন্য বিচার করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা আরোপ করতে পারে না, কারণ প্রথমোক্ত অপরাধ ফৌজদারি মামলা বহির্ভূত। (*বাচ্চা লাল বনাম লালজী* AIR 1976 All 393)।

আত্ম-অভিযোগ বিরোধী নিরাপত্তা ঃ ফৌজদারি আইন বিভাগের সাধারণ আইনের অনুশাসন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তিকে নির্দোষ ধরে নেওয়া হয়। অভিযোগকারীকে তার অপরাধের প্রমাণ দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, একজন অভিযুক্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিবৃতি নেওয়া যায় না। 20 (3) অনুচ্ছেদে এই নীতির কথা উল্লেখ আছে : "কোনও অভিযুক্তকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যায় না" একজন অভিযুক্ত এই যে সুবিধা পায় তার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা "সাক্ষী হওয়ার বাধ্যকতা থেকে সে মুক্ত" এবং তার ফলে "নিজের বিরুদ্ধে" তথ্য প্রমাণ দিতে হয় না। অর্থাৎ, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার বিড়ম্বনা থেকে সে মুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে 'বাধ্যকতা'র অর্থ 'চাপ' (*বোম্বে রাজ্য বনাম কাথি কলু ওগধ* AIR 1961 SC 1808, 1816)। নন্দিনী শতপথী মামলায় (AIR 1978 SC 1025) কোর্ট বলেন "প্রদত্ত জবাব ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে সাযুজ্য বহন করে এবং অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্তর যোগাসাজশ পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে। এই স্বেচ্ছাভিযোগ চাপেব মুখে দেওয়া হলে তা 20 (3) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।" বাধ্য বাধকতার সংজ্ঞা আরও ব্যাপক করে আদালত বলেন "বলপূর্বক বিবৃতি" শুধুমাত্র শারীরিক অত্যাচার করে আদায় করা হয় তা নয়, মানসিক অত্যাচার, পারিপার্শ্বিক চাপ, পরিবেশগত দমন, পীড়ন, ক্লান্তিকর জিজ্ঞাসাবাদ, উদ্ধত স্বেচ্ছাচার ও ভীতি প্রদর্শন কিছুই বাদ যায় না। আদালত পুলিশকে পালনীয় কিছু নির্দেশ দেন। যেমন অভিযুক্তকে অবশ্যই জানাতে হবে যে, পুলিশের কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে একজন আইনজীবী নিযুক্ত করার অধিকার তার আছে। (*নন্দিনী শতপথী বনাম পি. এল. দানি* AIR 1978 SC 1025)।

20 (3) অনুচ্ছেদ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু সুযোগ দেয়। কিন্তু ইচ্ছা করলে সে তা না-ও নিতে পারে। সে যখন স্বেচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তখন এই ধারা ভঙ্গ করা হয় না (*লক্ষ্মীপদ চৌরাসিয়া বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1968 SC 938)।

অভিযুক্তকে যে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বা দ্রব্যাদির প্রদর্শন দাবি করা যায় না বা স্বাক্ষরের নমুনা, হস্তাক্ষরের নমুনা, আঙুলের ছাপ, রক্তের নমুনা প্রভৃতি দেওয়ার দাবি করা যায় না (*দেস্তগির বনাম মাদ্রাজ* AIR 1960 SC 756)। অবশ্য কোনও নথিপত্রে অভিযুক্ত সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনও তথ্য থাকলে তা ভিন্ন কথা (*বোম্বে বনাম কাবি কলু* AIR 1961 SC 1808, 1816)।

তল্লাশি পরোয়ানা বলে যদি কোনও পুলিশ অফিসার কোনও অভিযুক্তর বাড়ি তল্লাশি করেন তাহলে সেই তল্লাশি ও নথিপত্র আটকে 20 (3) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয় না। (*এম. পি. শর্মা বনাম সতীশ,* AIR 1954 SC 300 306)। এই তল্লাশির ফলে যদি কোনও নথি বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে আদালতে তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেশ করা যায়, কেননা এক্ষেত্রে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অভিযুক্তকে বাধ্য করা হয়নি। (*ভি. এস. কুট্টন পিল্লাই বনাম রাম কৃষাণ* AIR 1980 SC 185)।

জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিরাপত্তা

সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি" ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এই অধিকার নাগরিক ছাড়াও অ-নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিখ্যাত গোপালন মামলায় "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা"কে শুধুমাত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এই অধিকাব প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা করে। (*এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ* AIR 1950 SC 27)। পরবর্তীকালে কিছুটা ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয় এবং আইন বিভাগের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়। 19(1) অনুচ্ছেদে স্বীকৃত অধিকার ছাড়াও একজন ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাধীন... জন্য যে সমস্ত অধিকার প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে এর আওতায় আনা হয়। *মানেকা গান্ধী বনাম কেন্দ্র মামলায়* সুপ্রিম কোর্ট কার্যত গোপালন মামলার রায় বাতিল কবে ঘোষণা করেন "বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে মৌলিক অধিকারকে সঙ্কুচিত না করে আদালতের উচিত তার প্রসারণের জন্য চেষ্টা কবা।" 'বাঁচার অধিকার' শুধুমাত্র শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচাও এর পরিধির মধ্যে নিহিত (AIR 1978 SC 597)। ফ্রানসিস কোরালি বনাম দিল্লী মামলায় এই অভিমতকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে আদালত বলেন, বাঁচাব অধিকার বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় (AIR 1981 SC 746)। কোর্ট আরও বলেন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি না দেওয়ার অর্থ মানুষের মর্যাদা নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকাবকে অস্বীকার করা এবং 21 অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করা (*পিপ্‌লস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট্‌স বনাম কেন্দ্র* AIR 1982 SC 1473)। 'ফুটপাথ-বাসীদের মামলা' নামে পরিচিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেন, 21 অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'জীবন' শব্দের অর্থ 'জীবনধারার অধিকার'। যদি জীবনধারার অধিকাব জীবনের সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত না হয়, তাহলে একজনের জীবনের অধিকার অস্বীকার করার সহজ পথ হল, তাকে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা (*ওলগা টেলিস বনাম বোম্বে করপোরেশন* AIR 1986 SC 180)।

সুপ্রিম কোর্টের কাছে আসা বিভিন্ন মামলায এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য রায় দেওয়া হয়েছে যে ঃ

- ধার শোধ করতে না পারার জন্য একজন গরিব মানুষকে বন্দী করার অর্থ তার ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্বীকৃতি (*জলি জর্জ ভার্গিস বনাম ব্যাঙ্ক অফ কোচিন* AIR 1980 SC 470);
- দাস শ্রমিক ব্যবস্থা (অবলুপ্তি) আইন 1976 অনুসারে দাস শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের মুক্তি দেওয়াই যথেষ্ট নয় তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 21 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যূনতম জীবন-ধারণের জন্য তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন (*নীরজা চৌধুরী বনাম এম. পি. রাজ্য* AIR 1984 SC 1099);

- 'ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা'-র অর্থ শারীরিক প্রতিরোধ বা দৈহিক বন্দীত্ব নয় এবং 'জীবন' শব্দের অর্থ জান্তব অস্তিত্বের কিছু বেশি (*কে. সিং বনাম ইউপি রাজ্য* AIR 1963 SC 1295);
- 'গোপনীয়তার অধিকার'কে মামলা পরম্পরা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে যেতে হবে (*গোবিন্দ বনাম এম. পি. রাজ্য* AIR 1975 SC 1379) এই অধিকার মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং কেউ মহিলার গোপনীয়তা নষ্ট করতে পারে না (*মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মধুলকর নারায়ণ* AIR 1991 SC 207);
- পুলিশ অফিসারের নজরদারি যদি অপরাধ দমনের জন্য হয় এবং আইনের পরিধির মধ্যে থাকে, তাহলে কোনও ব্যক্তি তার নামটি নজরদারির খাতায় রাখার জন্য অভিযোগ করতে পারে না; কিন্তু ব্যাপারটা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে যায় তাহলে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় — 21 অনুচ্ছেদ অনুসারে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত গোপনীয়তার অধিকার এবং 19(1)(d) অনুচ্ছেদ অনুসারে স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরার শর্ত লঙ্ঘন করার জন্য (*এম সিং বনাম পাঞ্জাব* AIR 1981 SC 760);
- হত্যা-মামলায় যথেষ্ট যুক্তি ব্যতীত অভিযুক্তকে জামিন না দেওয়ার অর্থ 21 অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাধীনতার বঞ্চনা (*বাবু সিং বনাম ইউ পি রাজ্য* AIR 1978 SC 527);
- জেলে-আটক বন্দীদের ক্ষেত্রেও 21 অনুচ্ছেদ অনুসারে নিরাপত্তা প্রযোজ্য (*ডি. বি. এম পট্টনায়ক বনাম অন্ধ্র প্রদেশ* AIR 1974 SC 2092);
- 'একাকী বন্দীত্ব' জারি করার অর্থ যদি সহ-বন্দীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও মেলামেশার সুযোগ না থাকে তাহলে 21 অনুচ্ছেদ ক্ষুণ্ন করা হয় (AIR 1978 SC 1575);
- একজন বন্দীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর ততটা বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় যতটা নিবর্তনমূলক আটক আইনে বলা আছে; তার অতিরিক্ত 21 অনুচ্ছেদ অনুসারে হানিকর (*প্রভাকর পাণ্ডুরং বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1986 SC 424);
- বিদেশ ভ্রমণের অধিকার, একজনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অঙ্গ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটি সুসংহত শব্দ (*সতবন্ত সিং বনাম সহকারী পাসপোর্ট অফিসার* AIR 1967 SC 1836);
- ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী পুলিশের আইনসিদ্ধ পদক্ষেপের অপেক্ষা না করে দ্রুত আহতকে চিকিৎসা করা, তার জীবন রক্ষা করা সরকারি বা বেসরকারি যে কোনও চিকিৎসকের পেশাগত দায়িত্ব (*পরমানন্দ কাটারা বনাম কেন্দ্র* AIR 1989 SC 2039);
- যখন কেউ 21 অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের জন্য অব্যাহতি চায়, তাকে কোনও প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় — যা তার

গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধানে স্বাক্ষর দিচ্ছেন

সংবিধানে স্বাক্ষর দিচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তাকিয়ে আছেন শ্রী কে. এম. মুনশি

গণপরিষদের বৈঠকে মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

সুপ্রিম কোর্ট আরও পরিষ্কার করে বলেন, আদালতের আদেশে কাউকে গ্রেপ্তার, কোনও বিদেশীকে বহিস্কারের আদেশ জারি অথবা নাগরিক স্বার্থে গ্রেপ্তার 22 অনুচ্ছেদের 1 এবং 2 ধারার এক্তিয়ারে পড়ে না (*ইউ. পি. রাজ্য বনাম আব্দুল সামাদ* AIR 1962 SC 1506, *মধুলিমায়ে* AIR 1969 SC 1014, *পাঞ্জাব বনাম এ. সিং* (1953) SCR 254)। তাছাড়া 1 এবং 2 ধারা বিদেশী ও নিবর্তনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

22 অনুচ্ছেদের 3 থেকে 7 ধারাগুলিতে নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যতিক্রমী অনুবিধিগুলি লেখা হয়েছে। নিবর্তনমূলক আটক নাম থেকেই বোঝা যায়, বে-আইনি কাজে বাধা দেওয়ার জন্য এই আইন, বেআইনি কাজে শাস্তি দেওয়াব জন্য নয়। গ্রেপ্তারের পরিস্থিতি, মামলার শ্রেণী, আটক রাখার সর্বাধিক সময়, উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন ও তার কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি উল্লেখ করে 22 অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আটকের জন্য একটি আইন করার ক্ষমতা সংসদকে দেওযা হযেছে। এই আইনে ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহাব রোধকল্পে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসেব বেশি আটক বাখা যায় না। এর বেশি আটক রাখতে উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমতি প্রয়োজন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আটক রাখার সর্বাধিক মেয়াদ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। নিবর্তনমূলক আটকের প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্দীকে আটকের কারণ জানাতে হবে এবং তাকে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে।

প্রকৃত ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে আটক রাখার বিরুদ্ধে আদালত খুব কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে। আইন যদি অযৌক্তিক ও অন্যায্য হয় তা বাতিল করা যায়। এমন কি গ্রেপ্তারের আদেশ এবং আটক যদি আইন মোতাবেক না হয় তাহলে বন্দীকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে পারে। (*গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* (1950) SCR 88; *এ. ডি. এম বনাম শুক্লা* AIR 1967 SC 1207)।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

সংবিধানের 23 ও 24 অনুচ্ছেদে মানুষ কেনা-বেচা, বেগার, জোর করে শ্রমদানে বাধ্য করা, শিশুদের কারখানায় নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধে মানবিক মর্যাদাকে মৌলিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ বলে স্বীকার করা হয়েছে। নাবী শিশু নিয়ে কেনা-বেচা, বলপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য কবা ইত্যাদি সেই মর্যাদাবোধকে ছিন্নভিন্ন করে। পুরনো জমিদারি ব্যবস্থায় প্রজাদেব মাঝে-মধ্যে বিনা মজুরিতে শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। এই প্রথাকে বেগার বলে। আদালত রায় দেন সামান্য কিছু মজুরি দেওয়া হলেও তাদের শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। (*পিপল্‌স ইউনিয়ন বনাম কেন্দ্র* AIR 1982 SC 1473)।

কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করে তার মানবিক ব্যক্তিত্বের অপব্যবহার যাতে রাষ্ট্র বা অন্য কেউ করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। সামরিক পরিষেবা, জনসেবা জাতীয় জনস্বার্থে বাধ্যতামূলক সেবা, এই ধারার ব্যতিক্রম যা জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের উপর রাষ্ট্র চাপিয়ে দিতে পারে।

14 বছরের কম বয়েসী শিশুদের কারখানা, খনি বা ঐ জাতীয় কষ্টকর কোনও কাজে নিয়োগ 24 অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মানবাধিকারের ধারণা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণার কথা মাথায় রেখে একাজ করা হয়েছে। 22 ও 23 অনুচ্ছেদের কিছু নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আইন তৈরি হয়েছে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা

সংবিধানের প্রস্তাবনায় আমাদের প্রজাতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা কবা হয়েছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ অ-ধার্মিক বা ধর্ম বিবোধিতা নয়। এব একমাত্র অর্থ বাষ্ট্রের নিজস্ব কোনও ধর্ম নেই, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা. কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেকেই ধর্মাচরণের পূর্ণ এবং সমান অধিকার পাবে। (মুখবন্ধ পরিচ্ছেদ দেখুন)। 25 থেকে 28 অনুচ্ছেদে প্রত্যেককে ধর্মাচরণেব স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা

25 অনুচ্ছেদে শুধু নাগরিক নয়, দেশের সকল মানুষকে সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মপ্রচাব ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য-র প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। রাষ্ট্র আইন করে ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার, এমন কি আইন করে হিন্দু মন্দিরগুলি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব মানুষের জন্য খুলে দিতে পারে রাষ্ট্র। শিখ ধর্মাবলম্বীদেব কৃপাণ বহন ধর্মীয় আচরণ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য সংবিধানে হিন্দু শব্দের অর্থ শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুপ্রিম কোর্ট মনে করেন, জোর করে ধর্মান্তকরণ কখনও ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে পড়ে না — কারণ এর ফলে জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে পারে। (*স্টেইনস্লস বনাম মধ্যপ্রদেশ* AIR 1977 SC 908) আনন্দমার্গ মামলায় প্রকাশ্য স্থানে শোভাযাত্রা করে মারাত্মক অস্ত্র এবং নরমুণ্ড নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচরণ বলে স্বীকৃতি পায়নি এবং ওই শোভাযাত্রার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার প্রশ্নে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ বলে বিবেচিত হয়েছে (*জগদীশ্বরানন্দ বনাম পুলিশ কমিশনার* AIR 1984 SC 51)। একইভাবে বকরিদের সময় গো-হত্যা ইসলাম

ধর্মের প্রয়োজনীয় আচরণ নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। সেজন্য জনশৃঙ্খলার স্বার্থে আইন করে গো-হত্যা বন্ধ করা উচিত (*মহম্মদ হানিফ কুরেশী বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1958 SC 731)। ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে ধর্মাচরণের অপ্রয়োজনীয় অংশ বলা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ধর্মীয় সম্পত্তির ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন আইন অনুযায়ী যার দেখভাল করা হবে। (*রতিলাল বনাম বোম্বে রাজ্য* (1954) SCR 1055; *রামানুজা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য* AIR 1972 SC 1586; *দিগ্‌দর্শন বনাম অন্ধ্র রাজ্য* AIR 1970 SC 181)।

ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনের স্বাধীনতা

25 অনুচ্ছেদ থেকেই যার উদ্ভব, সেই 26 অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন, নিজ নিজ ধর্মবিষয়ক কাজকর্ম নিজেরাই পরিচালনা করার এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও দেখাশোনা করার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। 25 অনুচ্ছেদের মতো 26 অনুচ্ছেদের এই অধিকারও জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্নে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সম্পত্তির বন্দোবস্ত আইন অনুযায়ী করতে হবে। তবে অন্য কোনও মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। 25 অনুচ্ছেদের মতো আদালত ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ এবং অপ্রয়োজনীয় অংশের মধ্যে একটা ব্যবধান করেছে। এ কথা বলা যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির দেখাশোনার ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারে, কিন্তু বন্দোবস্তের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। (*রতিলাল বনাম বোম্বে রাজ্য* 1954 SCR 1055; *রামানুজ বনাম তামিলনাড়ু* AIR 1961 SC 1402; *সরূপ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1959 SC 850; *নরেন্দ্র বনাম গুজরাত রাজ্য* AIR 1974 SC 2092; *রাম বনাম পাঞ্জাব* AIR 1981 SC 1576)।

25 ও 26 অনুচ্ছেদ একত্রে দেখলে রাষ্ট্র ও ধর্মের ভূমিকা বোঝা যায়। এরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও একে অন্যের হস্তক্ষেপ মুক্ত।

ধর্মের উন্নতিকল্পে কর না দেওয়ার স্বাধীনতা

27 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনও বিশেষ ধর্মের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যায় না। এর অর্থ, যদি সব ধর্মের প্রসারের জন্য কর আদায় করা হয় তাহলে কোনও আপত্তি থাকবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত।

ধর্মীয় সভায় যোগ না দেওয়ার স্বাধীনতা

28 অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত শিক্ষালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ

করা হয়েছে। আর সরকার স্বীকৃত বা সরকারী অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত শিক্ষালয়ে ধর্মশিক্ষায় অংশ না নেওয়ার স্বাধীনতা, শিক্ষার্থীদের আছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা

29 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ভারতের যে কোনও স্থানে বসবাসকারী "সব শ্রেণীর নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকারী।" রাষ্ট্রের সাহায্য-প্রাপ্ত কোনও শিক্ষালয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে কোনও নাগরিককে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

যদিও অনুচ্ছেদটির প্রান্তিক শিরোনামে "সংখ্যালঘু" শব্দটির উল্লেখ আছে, মূল অনুচ্ছেদেব কোথাও সে কথা বলা হয়নি। সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে, সব শ্রেণীর নাগরিকের এই অধিকার আছে (*আমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি বনাম গুজরাট রাজ্য* AIR 1974 SC, 1389)।

সংখ্যালঘুদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার

30 (1) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুরা নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পবিচালনা কবতে পারবে। 44 তম সংবিধান সংশোধনীতে 1(A) ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ এমনভাবে করা উচিত যাতে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অর্থবহ হয়। 2 নং ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার বিষয়ে রাষ্ট্র কোনও রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করাই 30 অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই অনুচ্ছেদটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। 29 অনুচ্ছেদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংবক্ষণের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। (*রেভারেন্ড ফাদার প্রস্ট বনাম বিহার রাজ্য* AIR 1969 SC 365; *আমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বনাম গুজরাট রাজ্য* AIR 1974 SC 1389)। তাছাড়া এই অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনার অর্থ শিক্ষার মাধ্যম, পাঠক্রম এবং যে সমস্ত বিষয শিক্ষা দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করার অধিকারও তাদের (*ডি. ভি. কলেজ ভাতিণ্ডা বনাম পাঞ্জাব* AIR 1971 SC 1731)।

পরিচালনা করার অর্থ অবশ্য অপশাসন নয়। এই অধিকার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। সমাজ সেবা, শিল্প সম্পর্ক, শিক্ষাগত মান, শৃঙ্খলা, যোগ্যতা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়ে আইন করা 30 অনুচ্ছেদের

পরিপন্থী নয় — যদি সেই আইন সংখ্যালঘুদের নিজেদের সংগঠন পরিচালনার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে। শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তার জন্য ছাঁটাই, অপসারণ, কর্মসংকোচন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে গৃহীত আইন 30 অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করে না। (*কেরালা শিক্ষা বিল* AIR 1958 SC 956; *আমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বনাম গুজরাট রাজ্য* AIR 1974 SC 1389; *ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুল কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* (1986) 4 SC 707)।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দমতে শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনা করার যে অধিকার 30 অনুচ্ছেদ দিয়েছে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা হয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়। তাছাড়া সংবিধানের কোথাও সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি এবং সংখ্যালঘুরা কিছু সুবিধা পায় সেজন্য সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু গোষ্ঠী নিজেদের সংখ্যালঘু বলে দাবি করতে শুরু করেছে, যেমন পাঞ্জাবের আর্যসমাজ। বাংলার রামকৃষ্ণ মিশনকে ঘোষণা করতে হয়েছে যে তাবা আদৌ হিন্দু নয়, এক স্বাধীন সংখ্যালঘু ধর্মকে তারা প্রতিনিধিত্ব করে। ডি. এ. ভি. এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানের জন্য 30 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা দাবি করার জন্য এসব কিছু করা হয়েছে। (*কলকাতা হাইকোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন পেশ করা এফিডেবিট অনুসারে* Co. No. 12831 *ভাষা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখুন*) তবে 1995-এর মে মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের মামলটিতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু, স্বাধীন সংখ্যালঘু নয়।

সম্পত্তির অধিকার এবং কয়েকটি আইনের রক্ষা

সম্পত্তির অধিকার সব থেকে জটিল এবং বিতর্কমূলক। আমাদের সংবিধানে এই অধিকারের বেশ বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আছে। গণপরিষদে সংবিধান তৈরি করার বিভিন্ন স্তরে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারাই সব থেকে বিতর্কমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সংবিধান প্রণেতাদের দূরদৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, মুসাবিদা করার ক্ষমতা, যতদূর সম্ভব অন্যেব মতকে সম্মান করে সমঝোতা করার দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যপকভাবে কাজে লাগাতে হয়েছে। পরিশেষে ঐক্য হয়েছে, যার ব্যাখ্যা প্রত্যেকে নিজের মতো করে করেছেন।

এই ঐকমত্য মূর্ত হয়েছে সংবিধানের 31 ও 19 (f) অনুচ্ছেদে। সংবিধান চালু হওয়ার পরেও দেখা গিয়েছে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারাগুলি সব থেকে বাদানুবাদপূর্ণ। আইন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের তীব্র মতবিরোধ হয়েছে। ফলে সংবিধান বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত 1978 সালে গৃহীত 44তম সংবিধান সংশোধন আইনে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে 19 (f) ও 31 অনুচ্ছেদকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় 20 জুন 1979 সালে। পরিবর্তে সংবিধানের দ্বাদশ অংশে

একটি নতুন অধ্যায় IV এবং একটি নতুন অনুচ্ছেদ 300A সংযোজন করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে আইনের অনুশাসন ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ, বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, একটি আইনসিদ্ধ অধিকার মাত্র। 300A অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিন্তু আইনসভার সিদ্ধান্ত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। 31 অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা হয়েছে কিন্তু 31A অনুচ্ছেদ (1951 সালে প্রথম সংশোধনীর সময় গৃহীত এবং 4, 17, 44তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধিত)31B অনুচ্ছেদ (1951 সালের প্রথম সংশোধনীতে গৃহীত) 31C (1971 সালে 25তম সংশোধনীতে গৃহীত এবং 42 ও 44তম সংশোধনীতে সংশোধিত) মৌলিক অধিকারের অঙ্গ বলেই বিবেচিত। সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কিছু আইনকে সন্দেহ করা এবং সেজন্য 14 ও 19 অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলে তাদের বাতিল করার প্রচেষ্টা রুখতে, যে কোনও মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতির প্রশ্নকে মোকাবিলা কবার জন্য, নবম তফসিলে গৃহীত আইনগুলিকে রক্ষা করা এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কার্যকর করাব সময় সেই 14 ও 19 অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলে তা বাতিল করা রোধ করবার জন্যই এই অনুচ্ছেদগুলি থেকেই গিয়েছে।

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় (AIR 1973 SC 146) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করলে একটি আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, এবং কোনও আইন নির্দেশাত্মক নীতির সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা স্থির করার বিচাব বিভাগীয় ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায় না। *মিনার্ভা মিল্‌স বনাম কেন্দ্র* মামলায় আদালত বলেন, 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 31C অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এক্তিয়ারের বাইরে আইনকে নিয়ে যাওয়ার সস্তা সিদ্ধান্ত সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী (এছাড়াও দেখুন *শ্রীনিবাস বনাম কর্নাটক রাজ্য* AIR 1986 SC 2030; *সঞ্জীব কোক বনাম ভারত কোকিং* AIR 1983 SC 239; *বসন্তবাই বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য* (1986) 2 SCC 516; *ওয়ামন রাও বনাম কেন্দ্র* AIR 1980 SC 273)।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

অধিকারগুলি অর্থবহ কবে তোলার জন্য সেগুলিকে প্রয়োগ করা দরকার এবং অধিকাব ভঙ্গ করা হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের সংবিধান শুধুমাত্র মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি উপরন্তু 32 অনুচ্ছেদ বলে মৌলিক অধিকার কার্যকব করার জন্য যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে সরাসরি উচ্চতম আদালতে আবেদন করার অধিকারও দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই অধিকারগুলিকে

বলবৎ করার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকার পৃচ্ছা (Quo warranto) ও উৎপ্রেষণ (Certiorari) এই কয়েক প্রকার লেখ (Writ) নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারেন। সংসদ অন্য আদালতকে এই ক্ষমতা দিতে পারে। সংবিধান নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে 32 অনুচ্ছেদ প্রদত্ত অধিকার প্রত্যাহার করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জরুরি অবস্থার সময় (ক) 20 ও 21 অনুচ্ছেদ ব্যতিরেকে অন্য মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার 359 অনুচ্ছেদে বাতিল করা হয় (খ) 19 অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি 358 অনুচ্ছেদে বাতিল করে আইনসভা যে কোনও আইন তৈরি করতে পারে শাসন বিভাগ যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেখানে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নিয়ে মৌলিক অধিকার প্রত্যাহার করা হয় সেখানে 32 অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয় (*সোমবন্তি বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1964 SC 131) সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, সংবিধান সংশোধন করেও এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না কারণ তা সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য (*ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বনাম কেন্দ্র* AIR 1981 SC 344)। এমন কি সংবিধান তৈরি করার সময় ডঃ অম্বেদকর অনুচ্ছেদটিকে এই সংবিধানের প্রাণকেন্দ্র ও তার হৃৎপিণ্ড বলেছিলেন। সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত তাদের ক্ষেত্রে 32 অনুচ্ছেদটি প্রযোজ্য। কোনও ভুল নির্দেশ বা অসাংবিধানিক আইন যতক্ষণ না প্রত্যক্ষভাবে কোনও মৌলিক অধিকারকে আক্রমণ করছে ততক্ষণ 32 অনুচ্ছেদ প্রয়োগের কথা নয় (*কেন্দ্র বনাম চিরঞ্জিলাল* AIR 1950 SC 109; *সাধু সিং বনাম দিল্লী প্রশাসন* AIR 1965 SC 9; *গোপাল দাস বনাম কেন্দ্র* AIR 1955 SC 1; *হাজি ইসমাইল বনাম আধিকারিক* AIR 1967 SC 1244; *কুরিয়াকোস বনাম কেরালা রাজ্য* AIR 1977 SC 1509)। যেহেতু সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (32 অনুচ্ছেদ) নিজেই একটি মৌলিক অধিকার সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট অন্য কোনও মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করার প্রতিবিধান অস্বীকার করতে পারে না। 226 অনুচ্ছেদে হাইকোর্টসমূহকে বিভিন্ন ধরনের 'লেখ' জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার অপরাধ সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট দুজনেই বিচার করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোনও এক জায়গায় আবেদন করতে পারেন (*কোচুনি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1959 SC 725, এম. কে. গোপালন বনাম মধ্যপ্রদেশ (1955) ISCR 168, *বাসাপ্পা বনাম নাগাপ্পা* (1955) ISCR 250)। যাই হোক, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, যেখানে 226 অনুচ্ছেদে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে হাইকোর্টে প্রথমে আবেদন করতে হবে (*পি. এন. কুমার বনাম দিল্লী প্রশাসন* (1987) 4 SC 609)।

জনস্বার্থে মামলার যে নতুন ধারণা সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতিদের বদলি মামলায়

উপস্থাপন করেছেন তার ফলে মৌলিক অধিকার খর্ব করার জন্য যে কোনও ব্যক্তিই আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের তরফে যে কোনও ব্যক্তি আদালতে আবেদন করতে পারেন একটি চিঠির মাধ্যমে। (*এস. পি. গুপ্তা বনাম ভারতের রাষ্ট্রপতি* AIR 1982 SC 149) (রিট শব্দের অর্থের জন্য 'বিচার বিভাগ' অধ্যায় দেখুন)।

সশস্ত্র বাহিনী বা জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনীর যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন সুনিশ্চিত করার জন্য এই সব বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কতখানি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবেন, তা স্থির করার দায়িত্ব সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে 33 অনুচ্ছেদে। ভারতের কোনও অঞ্চলে সামরিক শাসন চলার সময় কোনও সরকারি কর্মচারি বা অন্য কেউ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বা শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনও কাজ করলে — 34 অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ সেই কাজকে বৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংসদে গৃহীত এমন আইনকে দণ্ড নিষ্কৃতি আইন বা ইন্ডেম্‌নিটি অ্যাক্ট বলা হয়।

নয়

নির্দেশাত্মক নীতি

অংশ IV, অনুচ্ছেদ 36-51

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আইরিশ সংবিধানে এই নজির থাকলেও রাষ্ট্রকল্যাণের ভাবনাই 'নির্দেশাত্মক নীতি' অধ্যায়ের মূল প্রেরণা (*কেরালা রাজ্য বনাম কেশবানন্দ ভারতী* AIR 1973 SC 146)। শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রধান অধিকারগুলিকে রক্ষা করা নয়, সমাজ পরিবর্তনের কার্যকর মাধ্যম হিসাবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি গড়ে উঠুক, এটাই সংবিধান প্রণেতারা চাইছিলেন। ব্যক্তির অধিকারের সঙ্গে সমষ্টির প্রয়োজনের সম্ভাব্য সংঘর্ষের প্রতিবিধান কল্পে দু'ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে — জনস্বার্থে মৌলিক অধিকারের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি নামে আরও কার্যকর একটি অধ্যায় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। 37 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নির্দেশাত্মক নীতি ''রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য'' এবং ''আইন তৈরি করার সময় এই নীতি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।'' অর্থাৎ এ কথা পরিষ্কার যে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ শুধুমাত্র হুকুম নয়, কর্তৃপক্ষের আইনগত আদেশ এবং সংবিধানের মানবাধিকারের ধারাগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নির্দেশাত্মক নীতি এমন কোনও আইনগত অধিকার দেয় না, যা খর্ব হওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন। তাছাড়া এটা আইনসভাকে কোনও বিশেষ ক্ষমতা দেয় না। আবার এই নীতির সঙ্গে অসঙ্গতির অজুহাতে কোনও আইন অবৈধ বলা যায় না (*মাদ্রাজ রাজ্য*

বনাম সি ডোরাইরাজন (1951) SCBR 525; *কেরালা শিক্ষা বিল প্রসঙ্গে* AIR 1958 SC 956; *দীপচাঁদ বনাম উঃ প্রঃ সরকার* AIR 1959 SC 648; *ইউ পি এস ই বোর্ড বনাম হরি* AIR 1979 SC 65)।

এই নির্দেশগুলি আদালতের বিবেচ্য নয় এবং ইচ্ছা করেই এমনভাবে মুসাবিদা করা হয়েছে যাতে কখন, কীভাবে কোন অবস্থায় এই নীতিগুলি পূরণ করা যাবে সে বিষয়ে আইনসভাকে কিছুটা অবসর দেওয়া যায় কারণ এই নীতিগুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান বা কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন মানিয়ে নেওয়া প্রভৃতি কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

গণপরিষদে ডঃ অম্বেদকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ শুধুমাত্র শুভ ইচ্ছা সঞ্জাত নয় বরং এগুলি নির্দেশদানের হাতিয়ার এবং ক্ষমতায় যে দলই আসুক তাকে এগুলি মান্য করতে হবে। তিনি বলেন ঃ

> গণপরিষদ আশা করে আইনসভা বা শাসনবিভাগ কেউ এই নির্দেশগুলির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে ক্ষান্ত হবে না, দেশ শাসন করার যে সমস্ত প্রশাসনিক ও আইনগত সিদ্ধান্ত তারা নেবে তার পিছনে এই নির্দেশগুলির ভূমিকা অবশ্যই থাকবে।

37 অনুচ্ছেদের 'আদালতে বিচারযোগ্য নয়' ধারাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে 'নির্দেশাত্মক নীতি'র প্রতি 'দায়িত্ব' পালনে বিচার বিভাগ রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারে না। এ জন্য ডঃ অম্বেদকর বলেনঃ "সদ্য স্বাধীন একটি দেশে হাজারো সমস্যা থাকে। সেই সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে তাদের মোকাবিলার সময়, স্থান ও পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকা দরকার"।

আমাদের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতির একটি সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংবিধানের মুখবন্ধে গণতান্ত্রিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের যে স্বপ্ন সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতারা দেখেছিলেন, এই নীতিগুলির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। বিচারপতি কে এস হেগড়ের ভাষায় ঃ

> রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতা আনা, সমাজের বিভিন্ন চাপ ও বাঁধন থেকে সাধারণ নাগরিককে মুক্ত করা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা — মৌলিক অধিকারগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। আর নির্দেশাত্মক নীতির উদ্দেশ্য — অহিংস সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করা। ভারতের জনগণের সত্যকারের মুক্তির জন্য এমন একটা সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করে সংবিধান সমাজ কাঠামো বদলাতে চায়।

1970 সালের পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তসমূহ নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের ইতিবাচক দিকের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের

লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এই নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের সম্পূরক হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এই নির্দেশগুলি কার্যকর করার জন্য সংসদ মৌলিক অধিকারকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ না করলে এমন আইন বৈধ (*টমাস বনাম কেরালা রাজ্য* AIR 1976 SC 496; *দিক্ষিতুলু বনাম প্রধান বিচারপতি* (1979) 2 SCC 34, *মুকেশ বনাম মধ্যপ্রদেশ* AIR 1985 SC 537; *কেন্দ্র বনাম লক্ষীকান্ত* AIR 1987 SC 232)।

একটি সত্যকারের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও অসাম্য দূর করে ন্যায়সঙ্গত সামাজিক পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যেই নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের সৃষ্টি। নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের প্রাণকেন্দ্র 38 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের জন্য ও তার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র সংগ্রাম করবে।" 39 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র তার নীতিগুলি এমনভাবে পরিচালনা করবে যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক তার জীবিকার সংস্থান করতে পারবে; সকলের কল্যাণের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বন্টন করা হবে; সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবে, ("মৌলিক অধিকার হিসাবে নয় সাংবিধানিক লক্ষ্য হিসাবে" — *রণধীর বনাম কেন্দ্র,* AIR 1982 SC 879; *রামচন্দ্র বনাম কেন্দ্র,* AIR 1984 SC 541); স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়। মৌলিক অধিকার ব্যাখা করার সময় এই অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা যেতে পারে (*কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য* AIR 1973 SC 146; *শ্রীনিবাস বনাম কর্ণাটক রাজ্য* AIR 1987 SC 1518)। 4 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নতির চৌহদ্দির মধ্যে সকল নাগরিকের কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার জন্য নাগরিকদের সরকারি সাহায্য করতে হবে। 42 এবং 43 অনুচ্ছেদে বেঁচে থাকার মতো মজুরি, কাজ করার মতো সুস্থ পরিবেশ, সন্তানসম্ভবা নারীদের জন্য ছুটি, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিশ্রামভোগ, সামাজিক ও কৃষ্টিগত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 14 বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষা (45 অনুচ্ছেদ); তফসিলভুক্ত জাতি উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি (46 অনুচ্ছেদ); জনসাধারণের খাদ্যের পুষ্টির পরিমাণ এবং জীবন ধারণের মানোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে রাষ্ট্রের কর্তব্য (47 অনুচ্ছেদ); কৃষিকাজ ও পশুপালন বিষয়ক

সংগঠন তৈরি করা ও গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা (48 অনুচ্ছেদ); গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন তৈরি করা (40 অনুচ্ছেদ); প্রশাসন থেকে আইন বিভাগকে পৃথক করা (50 অনুচ্ছেদ); সমগ্র দেশের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা (44 অনুচ্ছেদ), জাতীয় স্মৃতি-সৌধ রক্ষণাবেক্ষণ (49 অনুচ্ছেদ); আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির প্রতি প্রীতি সম্মান প্রদর্শন, সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মত পার্থক্যের অবসান করা (51 অনুচ্ছেদ)। এ কথা মনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশীয় আইনে পরিণত হয় না। এই চুক্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত বা গ্রহণ করার জন্য আইন তৈরি করার দরকার হয়। 253 অনুচ্ছেদ অনুসারে বিষয়টি কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত। দেশের আইনের ব্যাখ্যা করবার সময় আদালত আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিরোধের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় (*বেরুবাড়ি ইউনিয়ন প্রসঙ্গে* AIR 1960 SC 845; *গ্রামাফোন কোঃ বনাম বীরেন্দ্র* AIR 1984 SC 667)।

আদালতে বিচারযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংসদ ও বিধানসভায় সামাজিক সংস্কারমূলক আইন তৈরি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। সাংবিধানিক বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করার সময় আদালত এই নীতির উল্লেখ করেন, জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করতে যোজনা কমিশন এই নির্দেশাত্মক নীতিকে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। 42তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বেশ কিছু নতুন নির্দেশ সংযোজিত হয়। যথা ঃ

i) শিশুদেব একটি স্বাস্থ্যকর, মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া (39 (f) অনুচ্ছেদ)।
ii) ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন পরিচালিত হবে। বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সাহায্য করবে রাষ্ট্র (39A অনুচ্ছেদ)। এই অধিকার 21 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে (*হরিয়ানা বনাম দর্শনা* AIR 1979 SC 855; *ক্ষেত্রী বনাম বিহার* AIR 1981 SC 928; *সুখদাস বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল* AIR 1986 SC 91)।
iii) শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (43A অনুচ্ছেদ) এবং
iv) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে।

সংবিধানের 44তম সংশোধনীতে 38 অনুচ্ছেদে একটি ধারা সংযোজিত করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা দুর করা রাষ্ট্রের কর্তব্য (মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে 'সম্পত্তির অধিকার ও কয়েকটি আইনের রক্ষা' অংশ দেখুন (31C অনুচ্ছেদ)।

তাছাড়া 31C অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে (i) নির্দেশাত্মক নীতিকে কার্যকর করার জন্য গৃহীত কোনও আইন মৌলিক অধিকারের 14, 19, 31 অনুচ্ছেদ খর্ব করার জন্য বাতিল করা যাবে না। (ii) 31D অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয়েছে, দেশ-বিরোধী কোনও কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য গৃহীত আইন মৌলিক অধিকারের 14, 19, 31 ধারার সঙ্গে অসঙ্গতির অজুহাতে বাতিল করা যাবে না।

সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির সম্পর্ক ঃ
মনে রাখা, দরকার প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি একই সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অঙ্গ। প্রতিটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একসঙ্গে সব কটি পড়া উচিত। প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশাত্মক নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার সাংবিধানিক উদ্দেশ্য আর্থ-সামাজিক ন্যায় তথা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা। নির্দেশাত্মক নীতিসমূহকে মৌলিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও তা আদালতে বিচারযোগ্য নয়। সংবিধান প্রণেতারা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁরা নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তবে সেই মুহূর্তে যা করা সম্ভব, তার একটা সূক্ষ্ম সমঝোতা করেছিলেন। মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি একত্রে সংবিধানের প্রাণভোমরা।

এ কথা সহজেই বোঝা যায় অধিকার ও কর্তব্য বা মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে মূলত কোনও পার্থক্য নেই। তারা পরস্পরের পরিপূরক। (*কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা* 1973 SC 146)। মৌলিক অধিকার যদি সরকার ও আইনসভার কী করা অনুচিত তাব উল্লেখ করে, নির্দেশাত্মক নীতি কী করা উচিত সে কথা বলে। এখানে কোনও সংঘাত নেই। বাছাই কমিটিতে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল 1951 পেশ করার সময় জওহরলাল নেহরু মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির সম্ভাব্য সংঘর্ষের কথা বলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

> আমরা প্রকৃত যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তা হল ঃ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির কথা বলা হয়েছে। সুদীর্ঘ আলোচনার পর আমরা তা গ্রহণ করেছি। কোন পথে যেতে হবে সে কথা বলা আছে নির্দেশাত্মক নীতিতে। সংবিধানে কিছু মৌলিক অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। মৌলিক অধিকার স্থিতিশীল এবং তা বেশ কিছু অধিকারকে রক্ষা করে। দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কখনও কখনও কোনও না কোনও ভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন নির্দেশাত্মক নীতির গতিময়তা এবং মৌলিক অধিকারের স্থিতিশীলতা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।
>
> কোনও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রগতিশীল আন্দোলনের অর্থ কিছু পরিবর্তন সাধন করা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সত্য সেখানেই। এ ধরণের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি কিছু সম্পর্ক পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বর্জন করা হতে পারে। আসলে এই পরিবর্তন আনার জন্যই

নির্দেশাত্মক নীতি। আবার মৌলিক অধিকারগুলি প্রত্যক্ষভাবে আগে থেকে ঠিক করা সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট। দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু সংঘাত আছে; তবে তা সহজাত নয়, কেননা আমি নিশ্চিত জানি তেমন ভাবে ভাবনা চিন্তা করা হয়নি। কিন্তু সামান্য হলেও অসুবিধা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে দেশের আদালতগুলিতে যখন বিষয়টি আসে তখন নির্দেশাত্মক নীতির চাইতে মৌলিক অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। এর ফলে কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে সংবিধানকে প্রগতিশীল করে তোলার কাজ ব্যাহত হচ্ছে, মূলত স্থিতিশীলতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ব্যক্তি বা সমষ্টির বৈষম্যকে সমর্থন করতে হয় তাহলে নির্দেশাত্মক নীতির সঙ্গে সংঘাত হবেই। এর কারণ আমাদের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতির উদ্দেশ্য ক্রমবিকাশ বা অন্যভাবে বলতে গেলে দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে বৈষম্যহীন একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

পুনরায় লোকসভার চতুর্থ সংবিধান সংশোধনীর পক্ষে বলার সময় জওহরলাল নেহরু বলেন, দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব সংসদের, আদালতের নয়। আদালত যে সব ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতির সঙ্গে সহজাত সংঘাতের কথা বলেছে, সংসদের দায়িত্ব সেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে "মৌলিক অধিকার যাতে নির্দেশাত্মক নীতির সহযোগী হতে পারে," সেই প্রচেষ্টা করা।

পরবর্তী কালে 1971 সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেন ঃ

ব্যবসা-বণিজ্যের স্বাধীনতা মানে শোষণের স্বাধীনতা নয়। উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলি তৈরি হয়নি। সামাজিক উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছে, তার প্রতি পরিকল্পিত পদক্ষেপ এই অনুচ্ছেদগুলি, এই অনুচ্ছেদগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনও ধরনের দাসত্বই সমর্থন করে না। আমাদের সংবিধানে শুধু অধিকারের কথা বলা হয়, দায়িত্বের কথা নেই, এমন মনে করা ভুল। সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব দেখি না। এরা একে অপরের পরিপূরক। চতুর্থ অংশের বিভিন্ন ধারায় নাগরিকদের কর্তব্য নির্ধারণ করার ভার সরকার ও আইনসভার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতি কতটা কার্যকর হয়েছে তার উপর নির্ভর করছে নাগরিকদের কর্তব্য। সেইজন্য অনুচ্ছেদগুলি যথেষ্ট নমনীয় করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সংবিধানের মূল লক্ষ্য। সমাজের সবচেয়ে নিচু তলার নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে না পারলে, সংবিধানকে ঘিরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে তা অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে (*চন্দ্রভবন বোর্ডিং ও লজ বনাম মহীশূর রাজ্য এবং অন্যরা,* 1970, 2 SCR 600)।

পুনরায় কেশবানন্দ ভারতী মামলায় বিচারপতি ম্যাথু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেনঃ

মৌলিক অধিকারের নিজস্ব সারবস্তু বিশেষ নেই। প্রত্যেক প্রজন্মের অভিজ্ঞতার আলোকে

এগুলি সমৃদ্ধ হয়। সংবিধান প্রণেতারা ভাবতেও পারতেন না এমন পরিস্থিতি সৃষ্ট হতে পারে, যেখানে এ জাতীয় অধিকার নিষিদ্ধ করা, হ্রাস করা, এমন কি বাতিল করার প্রয়োজনও হবে। মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য ও পূর্ববর্তিতার দাবি, জাতির ইতিহাসের বিশেষ সময়ে সংবিধানের চতুর্থ অংশে যে নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা পরাভূত হতে বাধ্য। জাতির জীবনের বিশেষ কোনও মুহূর্তে কোনও মৌলিক অধিকার, চতুর্থ অংশে যে নৈতিকতার দাবি করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে কি-না তা স্থির হবে সেই প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের দ্বারা। চতুর্থ অংশের নৈতিকতার দাবিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যদি সংবিধান সংশোধন করে সংসদ কোনও মৌলিক অধিকার বাতিল বা সংক্ষিপ্ত করেন তাহলে সংবিধান প্রণেতারা যাকে সহায়ক হিসাবে ভেবেছিলেন তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অজুহাতে সেই সংশোধনীকে আদালত বাতিল করতে পারেন না। আবার চতুর্থ অংশের নৈতিকতার দাবিকে মৌলিক অধিকারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সংশোধনীর আইনি পর্যালোচনার অনুমতি দেওয়া যায় না। (1973 (4) SCC 225)।

মাঝে মাঝে 'ইতিবাচক অধিকার' ও 'নেতিবাচক অধিকারের' মধ্যে একটা পার্থক্য করার চেষ্টা করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র কত দূর তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অংশে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা চতুর্থ অংশে বলা হয়েছে। এমন কি বেশ কিছু মৌলিক অধিকার সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে এবং গরিব মানুষের অধিকার যাতে সুরক্ষিত অংশের চাপে নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করে। এইভাবেই সংবিধানের 17 অনুচ্ছেদ অস্পৃশ্যতা দূর করে এবং এর যে কোনও ধরনের প্রয়োগ আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 15 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তির প্রতি দোকান, কূপ, রাস্তা, খাওয়ার-দোকান প্রভৃতি স্থান ব্যবহার করার ব্যাপারে বৈষম্য করা যাবে না। আর একটি সামাজিক অপরাধ বাধ্যতামূলক শ্রমদানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 23 অনুচ্ছেদে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যাতে অধিকাংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়র স্বাধীনতা না হয়ে দাঁড়ায় সামগ্রিকভাবে সেটাই দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

দশ

মৌলিক কর্তব্য

অংশ IVA, অনুচ্ছেদ 51A

জরুরী অবস্থার সময় 42তম সংবিধান সংশোধনী আইন 1976 গৃহীত হয়। এর ফলে চতুর্থ অধ্যায়ের IVA অংশে জনগণের মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি অবশ্য যথেষ্ট অবহেলিত।

মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহ ব্যক্তির অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতিসমূহে রাষ্ট্রের কর্তব্য সুনিশ্চিত করে। 1976 সাল অবধি আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে কোনও কথা বলা হয়নি। ভারতীয় ঐতিহ্য ও মানসিকতা যুগ যুগ ধরে কর্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ প্রতিটি অধিকারের পিছনে আছে পরিপূরক কর্তব্য। কর্তব্য অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একই মুদ্রার দুই দিক অধিকার ও কর্তব্য। অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ কর্তব্য। একজনের যা কর্তব্য অন্যের তা অধিকার। প্রত্যেক মানুষের বাঁচার অধিকার আছে। তাই অন্যকে আঘাত না করা বা মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তার কর্তব্য। বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণা সম্পর্কে কিছু বলার অনুরোধ করা হলে গান্ধীজী বলেন ঃ

> আমার নিরক্ষর কিন্তু বুদ্ধিমতী মায়ের কাছে শুনেছি, যে সমস্ত অধিকার আমরা সযতনে রক্ষা করি, সঠিকভাবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে তা পাওয়া যায়। তাই বিশ্বনাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করলেই সঠিকভাবে বাঁচার অধিকার অর্জন করা যায়। এই মৌলিক মন্তব্য থেকে নারী-পুরুষের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রথমে প্রথমে অনুরূপ কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যভাবে অধিকার মানে বল প্রদর্শন যা আদৌ কাম্য নয়।

গান্ধীজী প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য, সংবিধানের 42তম সংশোধনী আইন 1976 গৃহীত হয়। মূল সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়, যেখানে যথাক্রমে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির কথা বলা হয়েছে, তার পরে সংবিধানে একটি নতুন অংশ IVA যুক্ত হয়েছে। এই নতুন অংশ 51ক হিসাবে পরিচিত। সেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য ঃ

1 সংবিধান মেনে চলা, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো;
2 স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ ঐতিহ্যগুলি সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা;
3 ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও সংহতিকে সমর্থন করা ও রক্ষা করা;
4 দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা;
5 ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে ভারতের জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানো এবং নারীর মর্যাদা-হানিকর প্রথার বিলোপ করা;
6 ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া ও রক্ষা করা;
7 বনাঞ্চল, হ্রদ, নদী-নালা এবং বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও জীবন্ত প্রাণীর প্রতি মমতা দেখানো;
8 বিজ্ঞান-মনস্কতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটানো;
9 সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা বর্জন করা;
10 জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজে উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করা।

নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্গত রাষ্ট্রের কর্তব্যের মতো নাগরিকদের কর্তব্যও কোর্টের মাধ্যমে কার্যকরী করা যায় না। এগুলি কার্যকরী করা অথবা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা সংবিধানে নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও আইন ব্যাখ্যা করার সময় কোর্ট অবশ্যই এই বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারেন। 51A(g) অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে কোর্টে আলোচিত হয়। উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধ করার মৌখিক নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়া কিছু বিতর্কিত অঞ্চলকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয় (*মুম্বাই কামগড় সভা বনাম আব্দুলভাই* AIR 1976 SC 1455; *গ্রামীন মোকদ্দমা কেন্দ্র বনাম ইউ. পি. রাজ্য* AIR 1987 SC 2426; সচ্চিদানন্দ বনাম পঃ বঙ্গ রাজ্য AIR 1987 SC 1109; বানভাষী সেবাশ্রম বনাম ইউ. পি. রাজ্য AIR 1987 SC 374)।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে আনুগত্য আনার জন্য জনমত তৈরি করতে হবে। নাগরিক কর্তব্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে; এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিক গর্ব বোধ করতে পারে এবং জাতির প্রতি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, নিজের সামাজিক ঋণশোধ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

এগারো

শাসন বিভাগ

অংশ V, প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ 52 - 78

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সাংসদদের কাছে দায়বদ্ধ মন্ত্রিসভা সহ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিকভাবে রাজা ও রানি রাষ্ট্রপ্রধান হন। নানা ওঠাপড়ার মাধ্যমে রাজা ও সংসদেব পারস্পরিক সম্পর্কটি বিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে মূল রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে থাকে। নিয়মতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে অবশ্য রাজা বা রানি থাকেন। ভারতে রাজতন্ত্র নেই। আমরা এমন কি যুক্তরাজ্যের মতো ছোট্ট এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রও নই। বিশাল এই দেশ প্রজাতন্ত্রী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন, যার সর্ব্বোচ্চ পদে আছেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তাই একদিকে সংসদীয় ব্যবস্থ, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছে আমাদের শাসনতন্ত্র।

যে সমস্ত বিষয়ে সংসদ আইন তৈরি করতে পারে অথবা কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যে সমস্ত বিষয়ে ভারত সরকারের উপর বর্তায়, সেই সমস্ত বিষয়ই সংবিধানের 73 অনুচ্ছেদ কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতার অধীন।

রাষ্ট্রপতি

পদমর্যাদা ও ক্ষমতা

সংবিধানের 52 অনুচ্ছেদে একজন রাষ্ট্রপতির কথা বলা হয়েছে। আমাদের

সংবিধানের সর্বোচ্চ সম্মাননীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করা হয়। তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক নাম-সর্বস্ব শাসক ভাবা ভুল। গণপরিষদে নেহরু বলেন, রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মনে করা উচিত হবে না। সমস্ত শাসন ক্ষমতা তাঁর ওপর ন্যস্ত। প্রত্যক্ষ অথবা অধস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে সেই কাজ করতে তিনি সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। অধস্তন কর্মচারী বলতে মন্ত্রিসভাকেও বোঝায়। (*সম্রাট বনাম শ্রীনাথ,* AIR 1945 PC 163)। ভারত সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাই তার নামে গ্রহণ করা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁর ওপর ন্যস্ত এবং আইনানুযায়ী তা প্রয়োগ করা হয় (53 থেকে 77 অনুচ্ছেদ)।

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের বহাল করেন। সমস্ত মন্ত্রীই রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে কাজ করেন (75 অনুচ্ছেদ)।

দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রাষ্ট্রপতি। তিনি উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করেন, মুলতুবি ঘোষণা করেন এবং প্রায়োজনে লোকসভা বাতিল করতে পারেন (85 অনুচ্ছেদ)। প্রতি অধিবেশনের শুরুতে এবং প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের উভয় সভার যৌথ অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা দেন। প্রয়োজনে তিনি সংসদের যে কোনও সভায় যে কোনও নির্দেশ পাঠাতে পারেন বা নিজে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত সমস্ত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। অর্থ-বিল জাতীয় কয়েকটি বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত আলোচিত হতে পারে না (79, 85–87, 111 ও 117 অনুচ্ছেদ)। নবম লোকসভায় রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়াই সাংসদদের মাত্র এক বছর হয়ে গেলেই পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব করে একটি সংশোধনী আনা হয়। রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরামন সেই বিলে সম্মতি দেননি।

সংসদের উভয় সভার অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন যা সংসদীয় আইনের মতোই কার্যকর হয় (123 অনুচ্ছেদ)। এই ব্যবস্থা একেবারেই অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন, কারণ সংসদের অনুমোদনের পর এই সমস্ত অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত বিষয়ে সংসদ আইন করতে পারে রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়েই অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছেন (*এ. কে. রায় বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* AIR 1982 SC 710; *আর কে গর্গ বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* AIR 1981 SC 2139)।

সংসদ সংক্রান্ত আরও কিছু সাংবিধানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে পালন করতে হয়। প্রয়োজন হলেই তিনি লোকসভার জন্য একজন সাময়িক অধ্যক্ষ বা স্পিকার এবং

রাজ্যসভার জন্য অস্থায়ী সভাপতি নিয়োগ করেন। কোনও বিলকে কেন্দ্র করে দুই সভার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রতি বছর সংসদের সামনে সরকারের 'আয়-ব্যয়ের হিসাব' সহ অতিরিক্ত বাজেট, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) প্রতিবেদন, অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ, তফসিলী জাতি-উপজাতিদের জন্য নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীর প্রতিবেদন, অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থা বিষয়ক অনুসন্ধান কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব নেই মনে করলে রাষ্ট্রপতি ঐ সম্প্রদায়ের দুজনকে লোকসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে এমন 12 জনকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের অভিমত শুনে তিনি যদি মনে করেন নির্বাচিত কোনও সাংসদ সংবিধানের 108 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অযোগ্য তাহলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের, যেমন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারক, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক, নির্বাচন কমিশন, অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন (76, 124, 148, 155, 217 অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানের 72 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোনও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে, তার দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করতে, দণ্ডাদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে, আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত দণ্ড কমিয়ে দিতে পারেন। সামরিক আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, যাকে কেন্দ্রীয় এক্তিয়ারভুক্ত কোনও আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। 72 অনুচ্ছেদের অন্তর্গত এই ক্ষমতা বিচার বিভাগের এক্তিয়ার বহির্ভূত। বিচার বিভাগ কোনও ভুল করলে তা সংশোধনের ধারণা থেকেই এই ক্ষমতার সৃষ্টি। কোনও আবেদনকারীর আবেদন শুনতে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করা যায় না। বিচারালয় রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের গুণাগুণ বিচার করতে পারেন না। তারা সমস্ত, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রাষ্ট্রপতি বিচার করেছেন কি-না তা দেখতে পারেন। (*হুকম সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1975 P H'902; *হরবন্স বনাম উঃ প্রঃ* AIR 1982 SC 849; *কুলজিৎ বনাম লেফটানেন্ট গভর্নর* AIR 1982 SC 774; *মারু বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1980 SC 2147; *গডসে বনাম মহারাষ্ট্র* AIR 1961 SC 600; *নানাবতী বনাম বোম্বাই রাজ্য* AIR 1961 SC 122)।

সংবিধানের 352 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সমগ্র দেশ জুড়ে বা দেশের

কোনও অংশে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন যদি তিনি মনে করেন এমন একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে যুদ্ধ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য ভারত বা তার কোনও অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মুখে। 354 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজস্ব বন্টন সীমিত বা নিষিদ্ধ করতে পারেন। যখন জরুরি অবস্থা জারি হয়, রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ স্থগিত করে দিতে পারেন (359 অনুচ্ছেদ)। 356 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে পারেন। 360 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। অতএব, রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা বেশ কড়া ও সুদূরপ্রসারী।

সংক্ষেপে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী : (1) তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন; (2)সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন; (3) সামরিক ক্ষমতা — প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসাবে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা আছে; (4) কোনও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন ও দণ্ডাদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারেন; (5) কূটনৈতিক ক্ষমতা বলে বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়-পত্র গ্রহণ করেন; (6)আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাবলে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন, সংসদে গৃহীত বিল-এ সম্মতি দিতে এবং অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন; (7) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

ক্ষমতার এত বিন্যাস সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। মনে রাখা দরকার যে সংবিধানের 53 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা "সংবিধান নির্দেশিত" পথেই প্রয়োগ করা হবে। তাছাড়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা সংসদ প্রণীত আইন অনুসারেই করতে হয়। (*ইউ. এন. রাও বনাম ইন্দিরা গান্ধী* AIR 1971 SC 1002; *সঞ্জীব বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1970 SC 1102) 60 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে দেশের সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করা ও সমর্থন করার শপথ নিতে হয়। সংবিধানের 74(1) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে সংবিধান প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মনে রাখা দরকার আমরা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যেখানে রাষ্ট্রপতির নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না। সত্যিকারের ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতেই থাকে। (*সামশের সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1974 SC 2192; *ইউ এন রাও বনাম ইন্দিরা গান্ধী* AIR 1971 SC 1002; *মেসার্স বিশ্বম্ভর দয়াল চন্দ্র মোহন বনাম উঃ প্রঃ* AIR 1982 SC 33; *রাম জাওয়া বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1955 SC 544)। তাছাড়া সংবিধানে

জরুরি অবস্থা ও সাধারণ সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কোনও তারতম্য করা হয়নি। জরুরী অবস্থার সময়েও রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করতে পারেন না। 74 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত, ফলে রাষ্ট্রপতি সব সময়েই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। 44তম সংশোধনী সমস্ত সন্দেহ দূর করেছে। সংবিধানের 44তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পরিষদের লিখিত অনুরোধ পাওয়ার পরই রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ রায়েছে। যেমন ঃ

(1) লোকসভায় কোনও দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকলে 75(1) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময়, তিনি অবশ্যই নির্বাচনে পরাজিত অথবা অধিকাংশের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন না।

(2) কর্মরত প্রধানমন্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হলে সংসদের গরিষ্ঠ দল তৎক্ষণাৎ নেতা নির্বাচনে ব্যর্থ হলে বা মন্ত্রিসভার সদস্যদের ক্রমপর্যায় নির্ধারিত না থাকলে অথবা মন্ত্রিসভার বাইরের কোনও নাম প্রস্তাব করা হলে,

(3) লোকসভার অধিকাংশের সমর্থন হারিয়েছেন বা লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এমন মন্ত্রিসভার পরামর্শ মতো সংবিধানের 85(2)(b) অনুচ্ছেদ অনুসারে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার প্রশ্নে এবং

(4) মন্ত্রিসভা সংসদেব আস্থা হারানো সত্ত্বেও পদত্যাগ করতে অসম্মত হলে তাদের বরখাস্ত করার প্রশ্নে।

এই রকম কোনও কোনও পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখ করা যায় চরণ সিং, রাজীব গান্ধী এবং চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সময় এমনই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে ওয়াকিবহাল রাখা এবং রাষ্ট্রপতির জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (78a অনুচ্ছেদ)। ব্যক্তিগতভাবে কোনও মন্ত্রী কোনও সিদ্ধান্ত নিলে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার যৌথ বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। আবার সংবিধানের 44তম সংশোধনীর ফলে সংবিধানের 74 অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রিসভার কোনও সুপারিশকে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভার কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারেন। অবশ্য মন্ত্রিসভা যদি দ্বিতীয়বার একই সুপারিশ করেন তবে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় এবং কোনও বিচারালয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। 74(2)

অনুচ্ছেদ; *এস পি গুপ্ত বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1982 SC 149; *রাজস্থান রাজ্য বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1977 SC 1361।

111 অনুচ্ছেদ অনুসারে যখন কোনও বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় তখন তিনি সম্মতি না-ও দিতে পারেন। তাঁর সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য কোনও সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রপতি অর্থবিল ব্যতীত যে কোন বিলকে সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠান। পুনর্বিবেচানার পর সংসদ যদি সংশোধনী সহ অথবা সংশোধনী ব্যতীত হুবহু একই বিল দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান তবে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকেন।

মন্ত্রিসভার সুপারিশ মতো বিল অনুমোদন করা রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে রাষ্ট্রপতি 78(b) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারেন অথবা 74(1) অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকারের কাছে পুনরায় বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। বিতর্কিত ডাক বিল নিয়ে রাষ্ট্রপতি জৈল সিং এবং এক বছরের জন্য সংসদের সদস্য হলেই পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বিলে সেই বিল নিয়ে রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরামনও ঠিক এই কাজই করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

গণপরিষদে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনার সময় একটি অভিমত ছিল প্রাপ্তবয়স্কের অবাধ ভোটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। অপর দিকে অভিমত ছিল সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারেন। গণপরিষদ মধ্যপন্থার সুপারিশ করেন।

যেহেতু সংসদের উভয় সভার শাসকদলের গরিষ্ঠতা থাকবে, সেজন্য শুধুমাত্র সাংসদদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতো দলীয় প্রার্থীই হবেন এবং এমন একজন রাষ্ট্রপতি রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। অন্য দিকে রাষ্ট্রপতি যদি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন তাহলে তিনি মন্ত্রিসভার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবেন যা সংসদীয় প্রথা বিরোধী। গণপরিষদে যেমন নেহরু বলেছিলেন, আমরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি চাই না আবার তাঁর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করতে চাই না।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মতো আমাদের রাষ্ট্রপতিও একটি নির্বাচক সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত (54 অনুচ্ছেদ)। গণপরিষদ মনে করেছিল এমন একটি নির্বাচক সংস্থা রাষ্ট্রপতিকে সমগ্র জাতির তথা রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বকারী বলে দেখাতে পারবে।

সংবিধানের 58 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি পদ-প্রার্থী হতে হলে

একজনকে (1) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে (2) অন্তত 35 বছর বয়স্ক হতে হবে (3) লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন কোনও লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে লাভজনক পদ বলে ধরা হবে না। ডঃ এস রাধাকৃষ্ণান এবং ডঃ জাকির হোসেন উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ না করেই রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন, যথাক্রমে 1962 ও 1967 সালে। যাই হোক, সাংবিধানিক পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে শ্রী ভি. ভি. গিরি যিনি উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং তদানীন্তন লোকসভার স্পিকার ডঃ এন সঞ্জীব রেড্ডি নিজ নিজ পদ ত্যাগ করে 1969 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উপ-রাষ্ট্রপতি আর বেঙ্কটরামন এবং শঙ্কর দয়াল শর্মা যথাক্রমে 1987 ও 1992 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে পদত্যাগ করেন।

নির্বাচন বিধি ঃ রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী আইন 1952 দ্বারা রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে এই আইনে 1974 সালের সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঃ

I মনোনয়ন পত্রে অন্তত দশজন নির্বাচক রাষ্ট্রপতি হিসাবে একজনের নাম প্রস্তাব করবেন এবং আরও দশজন নির্বাচক সেই প্রস্তাব সমর্থন করবেন, প্রার্থী এই প্রস্তাবে লিখিত সম্মতি জানাবেন। 58 অনুচ্ছেদে প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। (*করণ লাল সাহ বনাম নিলম সঞ্জীব রেড্ডী* AIR 1978 SC 499)।

II প্রতিটি মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে প্রার্থী যে নির্বাচনী কেন্দ্রের নির্বাচক, তার উল্লেখ করে প্রত্যয়িত শংসাপত্র দিতে হবে।

সংবিধানের 55 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের ভোটের মূল্যের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমতা বজায় রাখা উচিত। একক-হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে। এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য একজন সাংসদ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধায়কদের ভোটের মূল্য, নিম্ন-লিখিত পদ্ধতিতে ঠিক করা হবে ঃ

(ক) প্রথমে রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

(খ) প্রাপ্য ভাগফলকে 1000 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই ভাগফলই হবে রাজ্যের বিধায়কদের

ভোটের মূল্য। মনে রাখতে হবে দ্বিতীয়বার ভাগ করার সময় 500-র বেশি ভাগশেষ থাকলে ভাগফলের সঙ্গে 1 যোগ করে ভোটমূল্য নির্ধারিত হবে। যেমন ঃ

রাজ্যের মোট জনসংখ্যা	:	43,502,708
বিধানসভার মোট সদস্য	:	294
প্রতিটি ভোটের মূল্য	:	$\frac{43,502,708}{294 \times 1000}$ = 147.96 অর্থাৎ 148

(গ) সংসদের দুই সভার সদস্যদের ভোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় রাজ্য বিধানসভা সমূহের সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। ভগ্নাংশ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হয়, তাহলে ভাগফলের সঙ্গে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সাংসদদের ভোটমূল্য তাই হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 1987 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় নির্বাচক সংস্থার মোট সদস্য ছিলেন 4695।

রাজ্যসভা	-	233
লোকসভা	-	543
বিধানসভা সমূহ	-	3,919
	মোট	4,695

লোকসভা ও রাজ্যসভা সদস্যদের ভোটমূল্য ছিল 702। বিভিন্ন রাজ্যের বিধায়কদের ভোটমূল্যের তারতম্য হয় সেই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সর্বনিম্ন ভোট ছিল সিকিম (7) এবং সর্বোচ্চ উত্তরপ্রদেশ (208)।

অঙ্গরাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রের মধ্যে সামঞ্জস্যর অর্থ বাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সমগ্র পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করা। রাজ্যগুলি দুইভাবে প্রতিনিধিত্ব করে — প্রথমত, তারা রাজ্য হিসাবে। দ্বিতীয়ত, বিধানসভা হিসাবে। সমগ্র দেশের সমস্ত রাজ্যের তরফ থেকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সমর্থন আনার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়েছে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সমতা রাখার জন্য মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ঠিক করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একক-হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কারণ সম্ভবত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব। এ বিষয়ে গণপরিষদে কোনও আলোচনা হয়নি। প্রস্তাবটি এমনিই গৃহীত হয়েছিল। এই ব্যবস্থার বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। যদি একই নির্বাচক সংস্থাকে একাধিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হয় তখন এই ব্যবস্থার গুরুত্ব থাকে। বর্তমান ব্যবস্থাকে একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলাটা ভুল কারণ বাস্তবে তা হয় না বরং এই ব্যবস্থাকে বিকল্প ভোট ব্যবস্থা বলাই ভাল।

আজ অবধি 10 বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছে। একমাত্র 1977 সালে ডঃ সঞ্জীব

রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সবচেয়ে উত্তপ্ত লড়াই হয় ভি. ভি. গিরি'র সময়, যখন দ্বিতীয়-পছন্দের ভোটগুলিকেও গুণতে হয়। একমাত্র ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দুবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1987 সালের নির্বাচন রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছিল এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যথেষ্ট উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল যখন আর বেঙ্কটরামন এবং বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার ছাড়াও, একজন তৃতীয় প্রার্থীও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বহু প্রার্থীই মনোনয়ন পত্র জমা দেন। যদিও এঁদের অধিকাংশই গুরুত্বহীন এবং পরীক্ষান্তে তাঁদের মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে যায়। এ কথা সোচ্চারে বলা যায় যে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোনও সাধারণ মানুষও রাষ্ট্রপতির মতো উচ্চপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

নির্বাচনী বিরোধ ঃ সংবিধানেব 71 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনও মত পার্থক্য হলে বা বিতর্ক দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচক সংস্থায় কোনও পদ শূন্য আছে এই অজুহাতে রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত বাখা যায় না।

একজন ব্যক্তি যিনি নির্বাচনে প্রার্থী নন বা নির্বাচক নন তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না (*এন বি খারে বনাম নির্বাচন কমিশনার* AIR 1958 SC 139)।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী মামলায় (AIR 1974 SC 1682) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে কয়েকটি বিধানসভা অবলুপ্ত থাকার জন্য নির্বাচক-সংস্থা অসম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয়, এই অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত রাখা যায় না। বর্তমান রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন অবশ্যই করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল

62(1) অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 56(1) অনুচ্ছেদে অনুসারে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে 5 বছর রাষ্ট্রপতি ঐ পদে আসীন থাকতে পারেন। তবে কার্যকাল শেষ হওয়ার পুর্বেই তিনি উপ-রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। সংবিধানে বলা আছে কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নতুন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করবেন।

পদচ্যুতির পদ্ধতি

61 অনুচ্ছেদে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে

পদচ্যুত করা যায়। এজন্য সংসদের যে কোনও কক্ষে 14 দিনের নোটিশ দিয়ে প্রস্তাব পেশ করতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট কক্ষের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশকে ঐ প্রস্তাবে সই করতে হবে। যে কক্ষে ঐ প্রস্তাব পেশ করা হয় সেই কক্ষের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে প্রস্তাবটি অপর কক্ষে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়। দ্বিতীয় কক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলে সেই মুহূর্ত থেকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত বা অপসারিত হন।

উপ-রাষ্ট্রপতি

সরকারের শাসনবিভাগের স্তর বিন্যাসে রাষ্ট্রপতির পরেই উপ-রাষ্ট্রপতির স্থান। সেজন্য উপ-রাষ্ট্রপতির পদ অত্যন্ত সম্মানীয়। 63 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ভারতের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবে। পদাধিকার বলে তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান (64 অনুচ্ছেদ)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে এই পদ্ধতি। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি সভার কার্যবিধি পরিচালনা করেন লোকসভার অধ্যক্ষের মতো। তবে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিশেষ কোনও কাজ তাঁকে করতে হয় না। তবে রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত এবং বিদেশী গণ্যমান্য অতিথিদের গ্রহণ করার মতো কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ তাঁকে করতে হয়। মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি-পদ শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন (65 অনুচ্ছেদ)। তাছাড়া অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা অন্য কারণে নিজের কার্য পরিচালনা করতে রাষ্ট্রপতি অপারগ হলে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বা রাষ্ট্রপতির তরফে কাজ করার সময় তিনি অবশ্যই রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করেন না (64 অনুচ্ছেদ)। বিভিন্ন ঘটনায় এ কথা প্রমাণিত যে উপ-রাষ্ট্রপতির আনুষঙ্গিক ক্ষমতা জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি ক্ষেত্রে কর্মরত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ও ফকিরউদ্দীন আহমেদ-এর মৃত্যু হলে তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং বি ডি জাতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্য সম্পাদন করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচক সংস্থা কর্তৃক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন (66 অনুচ্ছেদ)। সংসদের উভয় কক্ষের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যকাল 5 বছরের। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই পদে নির্বাচন করতে হয়। উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও বিরোধের নিষ্পত্তি

হয় সুপ্রিম কোর্টে। উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পদত্যাগ-পত্র পাঠাতে পারেন। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি জানালে উপ-রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। (67, 68, এবং 71 অনুচ্ছেদ)। উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের কোনও কক্ষ বা রাজ্য বিধানসভার সদস্য হতে পারেন না (66 অনুচ্ছেদ)। উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে গেলে রাষ্ট্রপতির মতো একই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। এছাড়া উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে (66 অনুচ্ছেদ)।

মন্ত্রী পরিষদ

সংবিধানের 74 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাষ্ট্রপতিও তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বলতে পারেন কিন্তু মন্ত্রিসভা পুনর্বিবেচনা করে যে পরামর্শ দেবেন রাষ্ট্রপতি সেই মতো কাজ করবেন।

মন্ত্রী পরিষদ থাকবে এর অর্থ অবশ্যই বুঝতে হবে যে সব সময় মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। সংবিধানে এমন কোনও পরিস্থিতির উল্লেখ নেই যেখানে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদ থাকবে না। সাংবিধানিক ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রে 356 অনুচ্ছেদ জারি করে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসন প্রয়োগ করার কোনও ব্যবস্থা সংবিধানে নেই।

সংবিধানের 42 ও 44তম সংশোধনের পর মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক। তার পূর্বেই অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন (*সামশের বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* AIR 1974 SC 2192)।

এমন কি লোকসভার অবলুপ্তি হলেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শানুযায়ী চলতে বাধ্য। *ইউ. এন. রাও বনাম ইন্দিরা গান্ধী* মামলায় (AIR 1971 SC 1002) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত রাষ্ট্রপতির যে কোনও কাজই অসাংবিধানিক কারণ তা 74(1) অনুচ্ছেদের বিরোধী।

যাই হোক, মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্রপতি নিজে ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। 44তম সংশোধনী রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করার সুযোগ দিয়েছে এবং কোনও ব্যাপারে সম্মতি জানাবার পূর্বে মন্ত্রিসভাকে পুনর্বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি বলতে পারেন।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গোপনীয়। মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দেয় তাও গোপন রাখা হয়। এজন্য কোনও কোর্টে এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না (*এস. পি. গুপ্তা বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1982 SC 149; *রাজস্থান বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1977 SC 136/1)।

75 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী তিনি অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অন্য মন্ত্রীরা কাজ করেন। মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সমস্ত কাজ করতে বাধ্য থাকলেও ঠিক কার পরামর্শ মতো তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন তা পরিষ্কার নয়। সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যাঁকে খুশি প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন। শর্ত একটাই — তাঁকে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন জোগাড় করতে হবে। কোনও দল লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলে কোনও অসুবিধা নেই। কারণ এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রচলিত রীতি অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার জন্য মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহ্বান করেন।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন ধরনের বোঝাপড়া প্রয়োজন এবং যে পরিস্থিতিতে সাংসদ আনুগত্য পরিবর্তন করতে পারেন, সেখানে প্রধানমন্ত্রী বাছাই করা যথেষ্ট কঠিন ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। লোকসভার অধিকাংশের সমর্থন আদায় করতে পারবেন এমন নেতা বাছার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হয়।

যদিও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং বলা হয় তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ রাষ্ট্রপতির আস্থার উপর নির্ভরশীল, কার্যত, প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ব্যতীত কাউকে তিনি মন্ত্রী করতে পারেন না এবং মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর আস্থার উপর নির্ভরশীল। কোনও মন্ত্রীর উপর প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হলে তিনি সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন, তাঁকে খারিজ করাব জন্য রাষ্ট্রপতিকে বলতে পারেন অথবা পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে ঐ মন্ত্রীকে বাতিল করে আবার মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন।

যুক্তরাজ্যে সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে অবশ্য সমষ্টির দায়িত্বের কথা আছে, যার অর্থ কোনও একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না। সরকারের যে কোনও কাজের জন্য মন্ত্রী পরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সেজন্য আস্থা বা অনাস্থা যৌথভাবেই হয়। সভার আস্থা হারালে পুরো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। যৌথ দায়িত্বের অর্থ মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে ভিন্ন সুরে কথা বলবেন না। গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও মন্ত্রীর ভিন্ন মত থাকলে তিনি হয় পদত্যাগ করবেন নয়তো সিদ্ধান্ত মেনে সমান এবং যৌথ দায়িত্ব স্বীকার করবেন।

যুক্তরাজ্যে মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতা অবশ্য ভিন্নভাবে চালু হয়েছে। রাজা কোনও ভুল

করতে পারেন না — প্রচলিত এই ধারণার জন্য সরকারি কোনও ভুল-ত্রুটির জন্য রাজাকে দায়ী করা যায় না, সেজন্য মন্ত্রীদের সেই দায়ভার বহন করতে হয়। রাষ্ট্রের যে কোনও কাজের জন্য কোনও না কোনও মন্ত্রী দায়ী থাকেন। সে কারণেই রাজার যে কোনও নির্দেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর স্বাক্ষর লাগে।

বিপরীতক্রমে ভারতে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে — প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার নিরিখে। ভারতে রাষ্ট্রপতির নামে করা কোনও কাজের জন্য মন্ত্রীদের কোনও আইনগত বাধা নেই। সেইজন্য রাষ্ট্রপতির কোনও আদেশে মন্ত্রীরা নয়, বিভাগীয় সচিব অথবা ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মচারীরা স্বাক্ষর করেন।

সংবিধান মন্ত্রীদের কোনও স্তরও বিন্যাস করেনি। সংবিধানে ক্যাবিনেটমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর উল্লেখ নেই। তাছাড়া সংবিধানে মন্ত্রী পরিষদের কথা বলা হয়েছে এবং একমাত্র 352 (1979 সালের সংশোধনীর পর) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ক্যাবিনেট হল ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রী পরিষদ। বাস্তবে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়। বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদ সাধারণত কোনও সভায় মিলিত হন না।

প্রধানমন্ত্রী

প্রশাসন ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখা, রাষ্ট্রপতি কোনও তথ্য চাইলে তাঁকে তা সরবরাহ করা অথবা রাষ্ট্রপতি কোনও বিষয় মন্ত্রিসভার পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানালে, তা মন্ত্রিসভার সামনে পেশ করা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে (78 অনুচ্ছেদ)।

সংসদীয় রীতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংসদ ও প্রশাসন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করেন। সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব দেখে অনেকে এই ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী নির্ভর ব্যবস্থা বলেন। মন্ত্রিসভার প্রধান হিসাবে তিনি সরকারেরও প্রধান। তাছাড়া তিনি সংসদে তাঁর দলের নেতা — এমন কি লোকসভারও নেতা তিনি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ কথা বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, জাতি, সংসদ ও দলের মধ্যে তাঁর প্রভাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা ও প্রভাব উপভোগ করেন। তাঁর সুপারিশে সমস্ত মন্ত্রীর নিয়োগ হয়, তাঁর ইচ্ছাতে তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেন প্রধানমন্ত্রী। ইচ্ছা করলেই তিনি তাঁদের দপ্তর পরিবর্তন করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে তিনিই যোগাযোগ রক্ষা করেন।

সংবিধান চালু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক এবং মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতপার্থক্য ছিল, আবার প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুরও মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি যে শুধুমাত্র সাংবিধানিক প্রধান, সে বিষয়ে সমস্ত সংশোধনী ও বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার পরেও রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করে এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে খারিজ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল

সংবিধানের শাসন বিভাগ অধ্যায়ে 76 অনুচ্ছেদে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা-সম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ করা হয়, আইনগত বিষয়ে সরকারকে সাহায্য ও উপদেশ দেওয়ার জন্য। এছাড়াও আইনগত যে কোনও বিষয় তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত।

রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী তিনি এই পদে বহাল থাকেন। যেহেতু অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হন সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে, সেজন্য সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেন, এমন একটা প্রথা তৈরি হয়েছে।

তিনি সরকারের আইন-সংক্রান্ত অফিসার। ভারতের যে কোনও আদালতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া সংসদের যে কোনও কক্ষের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এবং বক্তব্য রাখতে পারেন, তবে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারেন না। তিনি সংসদের পূর্ণ সময়ের উর্ধ্বতন কর্মী নন, এমন কি যুক্তরাজ্যের মতো মন্ত্রিসভার সদস্যও তিনি নন। তিনি আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারেন তবে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মামলা তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

বারো

আইন পরিষদ

অংশ V, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ 79-123 সংসদ

ভারতের সর্বোচ্চ আইনসভাকে সংসদ বলা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থায় ভারতের সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংসদের গঠন

রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভাকে নিয়ে ভারতের সংসদ গঠিত। 79 অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলা হয়েছে কেন্দ্রের জন্য একটি সংসদ থাকবে। যার অর্থ সব সময়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংসদ থাকবে। সংসদেব তিনটি অংশের মধ্যে একমাত্র লোকসভার অবলুপ্তি ঘটে। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী বা ধারাবাহিক কক্ষ এবং দেশে সব সময় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতির কাজ করছেন এমন একজন ব্যক্তি থাকেন।

রাষ্ট্রপতি ঃ ভারতীয় সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও রাষ্ট্রপতি সংসদের কোনও কক্ষেই বসেন না, বা আলোচনায় অংশ নেন না — যদিও দুটি সভার অধিবেশন তিনিই আহ্বান করেন। দুটি কক্ষের অধিবেশন স্থগিত অথবা লোকসভার অবলুপ্তি তিনিই করেন। অধিবেশন শেষ হলে তিনি সভা স্থগিত রাখেন এবং অবলুপ্তির অর্থ হল লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়া। সংসদে উভয় কক্ষে গৃহীত বিল আইনে পরিগণিত হতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাগে। শুধু তাই নয়, সংসদের উভয় সভা বন্ধ থাকা কালে তিনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন, যার গুরুত্ব সংসদে গৃহীত আইনের মতোই (85,111,123 অনুচ্ছেদ)।

সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনে এবং প্রতি বছরের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যৌথ সভা আহ্বান করেন এবং অধিবেশন ডাকার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া তিনি সংসদের যে কোনও কক্ষে গিয়ে ভাষণ দিতে পারেন বা তাঁর বার্তা পাঠাতে পারেন। সভা গুরুত্ব দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিবেচনা করতে বাধ্য থাকে (86, 87 অনুচ্ছেদ)। কয়েক ধরনের বিল আছে যেগুলি একমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পরই সভায় পেশ করা এবং আলোচনা করা যায় (117 এবং 274 (1) অনুচ্ছেদ)।

রাজ্যসভা ঃ নাম থেকেই বোঝা যায় এটি রাজ্যগুলির মিলন কেন্দ্র। পরোক্ষভাবে এই সভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে যেহেতু এরা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক ভোটের মাধ্যমে রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন (80 (4) অনুচ্ছেদ)। রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজ্যের সদস্য-সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এই নিয়মে যেখানে উত্তরপ্রদেশ থেকে 34 জন সদস্য আছেন সেখানে মনিপুর, মিজোরাম, সিকিম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যগুলি থেকে মাত্র 1 জন করে সদস্য আছেন। আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন এবং দিউ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যা এত কম যে সেখান থেকে কোনও সদস্যই নেই। সংবিধান অনুসারে রাজ্যসভায় 250 জনের বেশি সদস্য থাকতে পারেন না। এর মধ্যে 238 জন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন আর 12 জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন (80 (1) অনুচ্ছেদ) বর্তমানে রাজ্যসভায় নিম্নলিখিত হিসাবে 245 জন সদস্য আছেন ঃ

অন্ধ্র—18, অরুণাচল—1, আসাম—7, বিহার—22, গোয়া—1, গুজরাট—11, হরিয়ানা—3, হিমাচল—3, কাশ্মীর—4, কর্ণাটক—12, কেরালা—9, মধ্যপ্রদেশ—16, মহারাষ্ট্র—19, মনিপুর—1, মেঘালয়—1, মিজোরাম—1, নাগাল্যাণ্ড—1, ওড়িশা—10, পাঞ্জাব—7, রাজস্থান—10, সিকিম—1, তামিলনাড়ু—18, ত্রিপুরা—1, উত্তরপ্রদেশ—34, পশ্চিমবঙ্গ—16, দিল্লি—3, পণ্ডিচেরি—1 ও মনোনীত—12।

লোকসভার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এবং যে কোনও সময় রাষ্ট্রপতি লোকসভা খারিজ করে দিতে পারেন। রাজ্যসভা তেমন নয়। এটি একটি স্থায়ী কক্ষ। সংসদে গৃহীত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য 6 বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি দু'বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন (83 (1) অনুচ্ছেদ)। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হন। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন (64, 66, 89 অনুচ্ছেদ)।

লোকসভা : সংসদের অপর কক্ষের নাম লোকসভা বা জনগণের সভা। এই সভা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। আইনগত ভাবে অযোগ্য বিবেচিত না হলে প্রত্যেক 18 বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক ভোট দিতে পারেন (326 অনুচ্ছেদ)। সংবিধানে বলা হয়েছে রাজ্যসমূহ থেকে সর্বাধিক 530 জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে সর্বাধিক 20 জনকে নিয়ে লোকসভা গঠিত হবে। (81(1) অনুচ্ছেদ)। এছাড়া প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রপতি 2 জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন (331 অনুচ্ছেদ)। সংবিধানের নির্দেশানুসারে সংসদ সর্বোচ্চ 552 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। প্রতিটি রাজ্যকে জনসংখ্যার নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে কয়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাগ করা হয়। এই অনুপাত সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে একই (81 (2) (a) অনুচ্ছেদ)। 1971 সালের আদমশুমার অনুসারে জনসংখ্যা স্থির করা হয়। আগামী 2000 সাল অবধি লোকসভাব সদস্য সংখ্যার কোনও পরিবর্তন হবে না (81(3) অনুচ্ছেদ)।

জনসংখ্যার অনুপাতে তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য রাজ্যভিত্তিক আসন সংরক্ষিত থাকে। গোড়াতে এই সংরক্ষণ ছিল 10 বছরের জন্য, কিন্তু প্রতিবারই পরবর্তী 10 বছরের জন্য এই মেয়াদ বাড়ানো হয় (330 ও 334 অনুচ্ছেদ)।

আমেরিকার প্রতিনিধি সভা ও যুক্তরাজ্যের সাধারণ সভার (হাউস অব কমন্স) মতো আমাদের লোকসভার মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। প্রতিনিধিত্বকারী গণতন্ত্রের মূল কথা হল সরকারে থাকার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জনগণের রায় গ্রহণ করা। ভারতের লোকসভার মেয়াদ প্রথম সভার দিন থেকে ঠিক 5 বছর। 5 বছর পূর্ণ হলে সভার অবলুপ্তি ঘটে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সভাব অবলুপ্তি ঘটানো যায়। জরুরি অবস্থার সময় সভাব মেয়াদ একবারে এক বছরের বেশি বাড়ানো যায় না এবং কোনও অবস্থাতেই জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর 6 মাসের বেশি মেয়াদ বাড়ানো যায় না (83 অনুচ্ছেদ)। বাস্তবে প্রথম লোকসভা থেকে শুরু করে প্রতিটি সভাই তার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করার আগেই অবলুপ্ত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় একবার সভার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু সেই বর্ধিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সভা অবলুপ্ত হয়।

সংসদের সদস্যগণ :

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা : সংবিধানের 83 অনুচ্ছেদে সংসদের দুই কক্ষের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে—রাজ্যসভার ক্ষেত্রে যাঁর বয়স 30 বছর এবং লোকসভার ক্ষেত্রে 25 বছরের কম নয়। অন্যান্য যোগ্যতা আইন করে ঠিক করা হয়।

সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা ঃ 102 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও ব্যক্তিকে সাংসদ-প্রার্থী করা যাবে না বা কোনও সাংসদ যে কোনও সভার সদস্য থাকার যোগ্যতা হারাবেন যদি তিনি (i) ভারতীয় নাগরিক না হন। (ii) আদালত কর্তৃক বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত বা দেউলিয়া ব্যক্তি হন। (iii) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে কোনও লাভজনক পদে চাকরি করেন। অবশ্য মন্ত্রীর চাকরি বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনও পদ এই নিয়মের আওতায় পড়ে না। (iv) সংসদে গৃহীত কোনও আইনবলে অযোগ্য বিবেচিত হন।

তাছাড়া সংবিধানের 52তম সংশোধনীর দশম তফসিলের উল্লেখমতো দলত্যাগ জনিত কারণে একজন সদস্য অযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

কোনও সদস্য অযোগ্য কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে রাষ্ট্রপতি, নির্বাচনী কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন। লোকসভার ক্ষেত্রে দলত্যাগ সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন অধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান।

সদস্যপদ ত্যাগ ঃ 101 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও সদস্য সংসদের উভয় কক্ষ বা রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হলে তাঁকে কোনও এক জায়গার সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদি কোনও সদস্য বিধানসভা থেকে পদত্যাগ না করেন তবে সংসদ তাঁর আসন শূন্য ঘোষণা করতে পারে। অন্য কোনও ভাবে অযোগ্য বিবেচিত হলে অথবা পদত্যাগ করলে সেই আসন শূন্য হয়। তাছাড়া কোনও সদস্য বিনা অনুমতিতে 60 দিন অনুপস্থিত থাকলে সভা সেই আসনকে শূন্য ঘোষণা করতে পারে।

সদস্যদের শপথ গ্রহণ ঃ সাধারণ নির্বাচনোত্তর প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা "ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশের" এবং "ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার" শপথ গ্রহণ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাংসদের দায়িত্ব পালনের কথা ঘোষণা করেন। সভায় আসন গ্রহণ করার আবশ্যিক শর্ত এই শপথ গ্রহণ করা (99 অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় তফসিল)।

বেতন ও ভাতা ঃ সময় সময় সাংসদরা সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন অনুযায়ী বেতন ও ভাতা পান (106 অনুচ্ছেদ)। লক্ষ্য করার বিষয় এক্ষেত্রে পেনসনের কোনও উল্লেখ নেই। যদিও সংসদ সদস্যদের জন্য পেনসন মঞ্জুর করেছে। নবম লোকসভার সময়ে সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত এক বিলে প্রস্তাব করা হয় অন্তত এক বছর যে কোনও কক্ষের সদস্য থাকলেই একজন সদস্য পেনসন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু সেই বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়নি।

উভয় কক্ষের দায়িত্বশীল পদাধিকারীগণ ঃ

সংবিধানে লোকসভার জন্য একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার

জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নিয়োগ করার কথা বলা আছে। পদাধিকার বলে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ভারতের রাজ্যসভার সভাপতি। রাজ্যসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। লোকসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভার কাজ পরিচালনা করেন। একই ভাবে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি রাজ্যসভার কাজ পরিচালনা করেন। এই কাজ করার সময় তাঁরা অধ্যক্ষ ও সভাপতির সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন (64, 89, 91 এবং 93-95 অনুচ্ছেদ)।

সাধারণভাবে বলা যায় ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ ইংল্যাণ্ডের সাধারণ সভার অধ্যক্ষের পরিপূরক। জাঁকজমকপূর্ণ এই পদ অত্যন্ত সম্মানিত ও ক্ষমতামণ্ডিত। ইনিই লোকসভার প্রধান। সভা সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। সভার ভিতরে এবং সভা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে তাঁর কথা চূড়ান্ত। তাঁর বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে দেওয়া হয়, অর্থাৎ সংসদে এই বিষয়ে ভোট দেওয়া যায় না। তাঁর আচরণ নিয়ে নির্দিষ্ট প্রস্তাব ব্যতিরেকে সভায় আলোচনা করা যায় না। সাধারণত তিনি সভায় কোনও ভোট দেন না, তবে কোনও বিষয়ে সমান সমান ভোট পড়লে তিনি ভোট দেন (94, 96, 100 (1), 112 (3) (6))।

দুই কক্ষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিষয়ে অধ্যক্ষের বিশেষ ভূমিকা আছে। কোন কোন বিষয় অর্থসম্পর্কিত, তিনিই তা নির্ধারণ করে সেগুলিকে লোকসভার একান্ত এক্তিয়ারভুক্ত করেন। কোনও বিলকে তিনি অর্থ বিল ঘোষণা করলে, তাঁর সিদ্ধান্তটিকে চূড়ান্ত ধরা হয় (110 অনুচ্ছেদ)। দুই কক্ষের মধ্যে আইনগত কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য হলে উভয় সভার যৌথ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর নির্দেশ মতো পরিচালিত হয়। (108 ও 118 (4) অনুচ্ছেদ)।

লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নিজ পদে অব্যাহতি পান যদি তিনি সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা হারান। তিনি অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন। সভার একটা প্রস্তাবের মাধ্যমে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষকে অপসারিত করা যায়। এজন্য 14 দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থনে তাঁকে অপসারণ করা যায় (94 অনুচ্ছেদ)। রাজ্যসভার সহ-সভাপতির ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (90 অনুচ্ছেদ)। লোকসভার অবলুপ্তি হোক অথবা না হোক নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত বিদায়ী অধ্যক্ষ তাঁর পদে বহাল থাকেন। (94 অনুচ্ছেদ 2 ধারা)।

সংসদের অধিবেশন ঃ

রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সভা আহ্বান করেন। তবে সংবিধানের 85 (1)

অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি অধিবেশনের 6 মাসের মধ্যে সেই সভার অধিবেশন ডাকতে হয়। সাধারণত বছরে তিনটি অধিবেশন হয়—বাজেট অধিবেশন (ফেব্রুয়ারি-মে), বর্ষাকালীন অধিবেশন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ও শীতকালীন অধিবেশন (নভেম্বর-ডিসেম্বর)। রাজ্যসভার ক্ষেত্রে বাজেট অধিবেশনকে দুটি পর্বে ভাগ করে বছরে চারটি অধিবেশন করা হয়। বাজেট অধিবেশনের মাঝে চার সপ্তাহের একটা বিরতি দেওয়া হয়।

সংসদের কার্য পরিচালনা ও আইনগত পদ্ধতি ঃ
সংবিধানের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে প্রত্যেক সভা নিজের কার্যপদ্ধতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে (118 অনুচ্ছেদ)। সংসদের কার্যপদ্ধতি নিয়ে কোর্টে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না বা সংসদের কোনও পদাধিকারী বা সদস্যকে আদালতে হাজির করা যায় না (122 অনুচ্ছেদ)। সংবিধানে কার্যপদ্ধতির কিছু উল্লেখ আছে। সংবিধানের 100 অনুচ্ছেদে বলা আছে (1) সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতিকে নিন্দা প্রস্তাব, অধ্যক্ষ বা বিচারপতিদেব অপসাবণ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সভায় উত্থাপিত যে কোনও প্রশ্ন সভায় উপস্থিত এবং ভোটদানে রত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, সাধারণভাবে এই ভোটাভুটিতে লোকসভাব অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার সভাপতি অংশ নেন না। (1) তবে কোনও সময় দু'দিকে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তাঁরা ভোট দেন। (2) যে কোনও সভার সকল কার্যপদ্ধতিই বৈধ। সদস্যপদ শূন্য থাকা বা অনধিকার ভোট দেওয়ার অজুহাতে কোনও কার্যপদ্ধতি বাতিল করা যায় না। (3) সভার মোট সদস্যের একের দশমাংশ নিয়ে কোরাম হয়।

অর্থ বিল ও অর্থ সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য সব বিল যে কোনও কক্ষে পেশ করা যায। রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাবার পূর্বে এই সমস্ত বিল সংসদের উভয কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। এই অনুমোদন সংশোধনী ব্যতীত বা উভয় কক্ষে গৃহীত সংশোধনী সহ হতে পারে। অর্থ বিল ছাড়া অন্য যে কোনও বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি বিরোধ মেটাবার জন্য উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডাকেন (107-108 অনুচ্ছেদ)।

অর্থ সংক্রান্ত বিল ঃ সংবিধানে অর্থ সংক্রান্ত বিল ও অর্থ বিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় আয়-ব্যয় বিষয়ক যে কোনও বিলকে অর্থ সংক্রান্ত বিল বলা যায়। সংবিধানের 110 অনুচ্ছেদে অর্থ বিল সম্পর্কে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও অন্য আরও বিষয়ে উল্লেখ থাকে যে সমস্ত বিলে তাকে অর্থ সংক্রান্ত বিল বলে। সুবিধার্থে অর্থ সংক্রান্ত বিলকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর অর্থ সংক্রান্ত বিলে 110 অনুচ্ছেদে অর্থ

বিলে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্য আর্থিক বিষয়ের কথা বলা থাকে, যেমন— একটা বিল যেখানে কর সংক্রান্ত ধারা আছে অথচ সম্পূর্ণভাবে কর সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিল বলতে সেই সমস্ত বিলকে বোঝায় যার জন্য ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয় করতে হয় (110 ও 117 অনুচ্ছেদ)।

অর্থ বিলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

ভারতের সংবিধানের 110 অনুচ্ছেদে অর্থ বিলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে য়ে বিলে কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন, বা নিয়ন্ত্রণ বা সরকারি ঋণ গ্রহণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা বা ভারত সরকার কর্তৃক ঋণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দান এবং সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিক ব্যয় তহবিল থেকে অর্থ গ্রহণ বা প্রদান, কেন্দ্র বা রাজ্যের হিসাব পরীক্ষার উল্লেখ থাকে সেগুলি অর্থ বিল। কোনও বিলকে অর্থ বিল বলা নিয়ে মতবিরোধ হলে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রপতিব কাছে সম্মতির জন্য পাঠাবার পূর্বে অর্থ বিলে অধ্যক্ষ অর্থ বিল ঘোষণা করে স্বাক্ষর করেন (110 অনুচ্ছেদ)। অর্থ বিল একমাত্র লোকসভাতেই পেশ করা যায় এবং তাও রাষ্ট্রপতির সুপারিশ পাওয়ার পর। লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পর বিল রাজ্যসভায় যায়। 14 দিনেব মধ্যে রাজ্যসভা তার কিছু সুপারিশ থাকলে সেই সুপারিশ সহ বিল লোকসভায় ফেরত দেয়। লোকসভা ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। যে সমস্ত সংশোধনী লোকসভা গ্রহণ করতে পারে ধরে নেওয়া হয় সেগুলি সহ বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত হয় আর লোকসভা যদি কোনও সংশোধনী গ্রহণ না করে বা রাজ্যসভা 14 দিনের মধ্যে বিলটি ফেরৎ না পাঠায় তাহলে লোকসভা যেমন ভাবে পাঠিয়েছিল তেমনভাবে উভয় সভায় গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয় (109 অনুচ্ছেদ)।

বিলে সম্মতি ঃ

সংবিধানের 111 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। তিনি সম্মতি দিতে পারেন আবার না-ও পারেন। অর্থ ঠিক না হলে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি সংসদে ফেরৎ দিতে পারেন। সংসদ যদি সংশোধনী সহ অথবা হুবহু ঐ বিল পুনরায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে সম্মতির জন্য পাঠায় তখন রাষ্ট্রপতি অসম্মতি জানাতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি বিল সম্পর্কে, সরকারের কাছে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারেন অথবা মন্ত্রিসভার কাছে সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরৎ দিতে পারেন (74 (2) ও 78 (b))। জৈল সিং যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন ডাক-তার বিল এবং বেঙ্কটরামন যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন

'এক বছর হলেই সাংসদদের পেনসন দেওয়া', সংক্রান্ত বিল নিয়ে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল।

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পদ্ধতি ঃ

বাজেট ঃ প্রতি আর্থিক বৎসরে সরকারের আয়-ব্যয়ের খসড়া হিসাব রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণকে বাজেট বলা হয়।

বাজেটে আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়।

(ক) ভারতে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়

(খ) সঞ্চিত তহবিল থেকে অন্যান্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের দাবি। সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(1) রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ও তাঁর অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ।

(2) রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা,

(3) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদেব বেতন, ভাতা ও পেনসন, ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিদের পেনসন, হাইকোর্টের বিচারপতিদের পেনসন,

(4) সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষকের বেতন, ভাতা ও পেনসন,

(5) কোর্টের রায় কার্যকর করতে যে খরচ হয়,

(6) তাছাড়া সংসদ আইন করে যে সমস্ত ব্যয় সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য করে।

আনুমানিক হিসাব এবং ব্যয় অনুমোদনের দাবি ঃ সঞ্চিত তহবিল থেকে যে অর্থ খরচ করা হয় তার ওপর সংসদে ভোটাভুটি করা যায় না, কিন্তু ঐ বিষয়ে আলোচনা করা যায়। অন্য সমস্ত আনুমনিক খরচকে ব্যয় অনুমোদনের দাবি হিসাবে লোকসভায় পেশ করা হয়। লোকসভা যে কোনও দাবি গ্রহণ বা বাতিল করতে পারে—এমন কি লোকসভা ইচ্ছা করলে যা দাবি করা হয়েছে তা কমিয়ে দিতে পারে। এই সমস্ত দাবিই রাষ্ট্রপতির সুপারিশ সহ পেশ করতে হয়। (113 অনুচ্ছেদ)।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল ঃ ব্যয় অনুমোদনের দাবি লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পর সঞ্চিত তহবিল থেকে খরচ করার জন্য একটি বিল পেশ করা হয়। অর্থের পরিমাণ কম বেশি করে কোনও সংশোধনী তোলা যায় না। এই বিল-এর প্রয়োজন হয়, কারণ লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ তোলা যায় না। অতিরিক্ত বা অনুপূরক অনুদান আলাদাভাবে ভোটে দিতে হয় কিন্তু একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। (114-115 অনুচ্ছেদ)।

116 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে (i) গণনানুদান বা ভোট অন অ্যাকাউন্ট

অর্থাৎ বাজেট প্রস্তাবের পূর্বেই যে অগ্রিম অনুমোদন দেওয়া হয়। (ii) বিশেষ ব্যতিক্রম অনুদান যা কোনও আর্থিক বছরের এক্তিয়ারভুক্ত নয় (iii) অস্বাভাবিক ও অনির্ধারিত চরিত্রের দাবিসমূহ।

নির্দিষ্ট সময়ে অর্থকরী বিষয় শেষ করার জন্য সংসদ আইন করে যে কোনও পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (119 অনুচ্ছেদ)।

সংসদের ভাষা ঃ

সংবিধানে বলা হয়েছে সংসদের কাজকর্ম হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরিচালিত হবে। তা সত্ত্বেও এই দুটি ভাষায় যাঁদের ব্যুৎপত্তি নেই, সেই সদস্যদের মাতৃভাষায় বলার অনুমতি সভার পরিচালকরা দেন (120 অনুচ্ছেদ)।

সংসদীয় অধিকার ঃ

সংবিধানের 105 অনুচ্ছেদে সংসদের উভয় কক্ষ, সাংসদ এবং বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা ও অধিকাবের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ বা কয়েকজন ব্যক্তি যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা স্বাধীনতা ভোগ করেন তাকেই 'অধিকার' বলে। আইনী ভাষায় এর অর্থ দায়িত্ব, কর্তব্য, উপস্থিতি অথবা দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি। এই 'অধিকার' অন্যে ভোগ করে না, এমন অধিকার হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। সংসদীয় অধিকার হচ্ছে সেই ধরণের সুবিধা যা সংসদের উভয় কক্ষ সাংসদ ও সংসদীয় কমিটি উপভোগ করে। এই অধিকার ব্যতিরেকে সাংসদরা তাঁদের কাছ থেকে যেমন কাজ আশা করা হয় তা তেমনভাবে করতে পারেন না। কোনও রকম বাধা বিপত্তি ছাড়া কাজ করার জন্য এবং সংসদের ভাবমূর্তি অটুট রাখতে এই বিশেষ অধিকার। কার্যত এই অধিকার কিছু ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যতিক্রমী প্রবণতার জন্ম দেয়—তবে এর অর্থ এই নয় যে সাংসদরা আইনের চোখে সাধারণ নাগরিকের চাইতে আলাদা। সাংসদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময়টুকু ছাড়া তাঁরা সাধারণ নাগরিকের মতো একই অধিকাব ও স্বাধীনতা ভোগ করেন। এই অধিকার অবশ্য সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে না। সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁদের ওপর সমান ভাবে বর্তায়।

সংসদের অভ্যন্তরে বাক-স্বাধীনতাই সাংসদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার । সংসদে কিছু বলা বা কোনও ভোট দেওয়ার জন্য কোনও সাংসদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। সংবিধানের 105 অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ আছে।

1. সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিয়ম কানুন অনুযায়ী সংসদের অভ্যন্তরে সদস্যদের বাক্ স্বাধীনতা থাকবে।

2. **সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য, ভোট দেওয়ার জন্য বা সংসদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না (*তেজ কিরণ বনাম সঞ্জিব* AIR 1970 SC 1573; *গেটিশ বনাম হরিসাধন* (1956) 60 CWN 971, AIR 1961 SC 613)।**
3. **সংসদের উভয় কক্ষ, তার সদস্যগণ ও কমিটিগুলির বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও অব্যাহতি সংসদে আইন করে স্থির করা হয়। যতদিন সেই বিশেষ আইন প্রণীত না হয় ততদিন সাংসদরা 1978 সালের 44তম সংশোধনী বলবৎ হওয়ার পূর্বের মতো বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করবেন।**
4. **সংসদের মধ্যে বক্তব্য রাখা অথবা অন্যভাবে সংসদের কাজে অংশগ্রহণকারী যে কোনও ব্যক্তিই 1, 2 এবং 3 ধারার সুযোগ সুবিধা পাবেন।**

অন্যভাবে বলা যায় 1950 সালের 26 জানুয়ারির পূর্বে ব্রিটেনের সাধারণ সভায় যে অধিকার ও অব্যাহতি কার্যকর ছিল আমাদের সংসদ, তার বিভিন্ন কমিটি ও সদস্যরা সংবিধানে উল্লিখিত বিশেষ সুবিধাগুলি ছাড়াও সেগুলিই উপভোগ করে।

সংসদীয় দায়িত্ব পালনেব সময় প্রাপ্য বাক্-স্বাধীনতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে নাগরিকদের বাক্ স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 105 ও 194 অনুচ্ছেদে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাংসদ ও বিধায়কদের বাক্ স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। 19 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বাক্ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ আছে যেমন সংসদে কুৎসা বা মানহানিকর বক্তব্য রাখা যায় না। কোনও সাধারণ মানুষ মানহানিকর বক্তব্য রাখলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কিন্তু একজন সাংসদ সংসদে বা কোনও সংসদীয় কমিটিতে কারও বিরুদ্ধে কুৎসা করলেও আদালতে ঐ সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

সাংসদদের জনগণের অভাব অভিযোগ তুলে ধরতে হয়, জনস্বার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। এই কাজ করার জন্য তাঁদের কোনও অসুবিধা বোধ করা উচিত নয়, মন খুলে কথা বলতে এবং নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম হওয়া চাই। সংসদে অথবা সংসদীয় কমিটিতে একজন সদস্য সংসদীয় রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে যা খুশি তাই বলতে পারেন, বাইরের কোনও শক্তির সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। ভয় ভীতিহীন হয়ে কাজ করার জন্য একজন সাংসদের বাক্স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আইনের অব্যাহতি না থাকলে একজন সদস্য প্রাণ খুলে কথা বলবেন আশা করা যায় না। এ জন্যই সংবিধানে বলা হয়েছে সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য বা ভোট দেওয়ার জন্য কোনও সাংসদের বিরুদ্ধে সংসদ ছাড়া অন্য কোনও আদালতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য কোনও সদস্যকে উত্যক্ত করা বিশেষ অধিকার ভঙ্গের

সামিল। সংসদে কিছু বলার জন্য কোনও আদালতে অভিযোগ জানালে সাংসদের বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হয়।

সার্চলাইট মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করেন যে 105 অনুচ্ছেদ বলে সদস্যরা যে বাক্‌ স্বাধীনতা ভোগ করেন তা কেবলমাত্র সংসদের কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করার জন্য সাংবিধানিক রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ নাগরিকদের বাক্‌ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে যে 19 (2) অনুচ্ছেদ তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের কোনও প্রচেষ্টা সাংসদের অধিকারের ওপর চরম হস্তক্ষেপ। এমন কি সংসদের কোনও কক্ষে কোনও সাংসদ আদালত অবমাননাকর বক্তব্য রাখলেও, আদালতে ঐ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় না। এক্ষেত্রে আদালত যেহেতু বাইরের কর্তৃপক্ষ, সে জন্য এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার কোনও অধিকার আদালতের নেই। 122 অনুচ্ছেদে সংসদীয় কাজকর্মে আদালতের হস্তক্ষেপ বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সাংসদ ও বিধায়কের বিশেষ অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে কি না তা স্থির করার চূড়ান্ত ক্ষমতা সংসদ ও বিধানসভার। ভারতের বিচার ব্যবস্থা বহু পূর্বেই তা স্বীকার করেছে। এ কথাও বলা হয় ব্রিটেনের সাধারণ সভার মতো আমাদের সংসদের ক্ষমতা এবং কোনও আদালতের এই ক্ষমতা বিচার করার এক্তিয়ার নেই।

বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতির অর্থ সংসদের চার দেওয়ালের মধ্যে যা খুশি তাই বলার অবাধ স্বাধীনতা নয়। উল্লেখযোগ্য, সংসদের এই বিশেষ অধিকার সংবিধানের অন্যান্য ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার শর্তাধীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 118 ও 121 অনুচ্ছেদ মতে কোনও বিচারপতির অপসারণ দাবি ব্যতীত সংসদের কোনও কক্ষে তাঁর আচরণ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। অর্থাৎ, সংসদের বাক্‌ স্বাধীনতা এক্ষেত্রে সংসদীয় রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (*এম এস শর্মা বনাম শ্রীকৃষ্ণ সিনহা,* AIR 1959 SC 395)।

1965 সালে সুপ্রিম কোর্ট উপদেশমূলক মতামত দিতে গিয়ে 1964 সালের একটি বিশেষ উল্লেখ্য মামলা (কেশব সিং মামলা) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন ঃ

> সার্চলাইট মামলায় অধিকাংশের রায়কে মাথায় রেখে 194(3) অনুচ্ছেদের সঙ্গে তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সব সময় 194(3) গুরুত্ব পাবে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। অধিকাংশের রায়ে বলা আছে 19(1a) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না— এক্ষেত্রে 21 অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। 194(3) অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে এই ধারা প্রয়োগ করার সময় মৌলিক অধিকার ব্যাহত হলে সমন্বয়ের মাধ্যমে সে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই উপদেশের পর এলাহাবাদ হাইকোর্ট কেশব সিং মামলাটির রায় দিতে গিয়ে 10 মার্চ 1965 বলেন ঃ (সুপ্রিম কোর্টের উপদেশমূলক মতামত দানের পরে)

(i) সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশ অনুধাবন করে আমরা মনে করি 194 (3) অনুচ্ছেদ বলে মানহানির প্রশ্নে বিধানসভা ব্রিটেনের সাধারণ সভার মতই ক্ষমতাবান।

(ii) যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি বা আটক করার বিরুদ্ধে 22 (2) প্রয়োগ করা যায় বলে আমরা মনে করি না

(iii) যেহেতু আমরা মনে করি মানহানির শাস্তি দেওয়ার অধিকার বিধানসভার অছে এবং 208 (1) ধারা বলে কার্যপদ্ধতি পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন বিধানসভাই তৈরি করেছে, তাই আবেদনকারীর ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্ন সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদ অনুসারে বিবেচ্য

(iv) বিধানসভার মানহানির বিচার করা ও সেই অপরাধে শাস্তি দেওয়ার এক্তিয়ার আছে, এই সিদ্ধান্তে আসার পর, শাস্তিদানের সঠিকতা ও নৈতিকতা ও আইনগ্রাহ্যতা নিয়ে আমরা কোনও প্রশ্ন তুলতে পারি না। মানহানির প্রশ্নে কোনও আবেদনকারী 226 অনুচ্ছেদ বলে কোনও আবেদন করলে আদালত সেই আবেদন বিচার করে বিধানসভার সিদ্ধান্ত নাকচ করতে পারেন না। নিজের কার্যপদ্ধতির প্রশ্নে এবং বিধানসভার অবমাননা হয়েছে কি না এই প্রশ্নে বিধানসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অতঃপর সরকার সংবিধান সংশোধন না করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার মনে করেন, সুপ্রিম কোর্টের অভিমত ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভা ও বিচার বিভাগ নিজস্ব রীতিনীতি গড়ে তুলবেন।

এজন্য বিশেষ অধিকারের প্রশ্নে সার্চলাইট মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় আজও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

বিশেষ অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ ঃ 105(3) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংবিধানে বর্ণিত বিশেষ অধিকার ছাড়াও সংসদ প্রয়োজন বোধে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। অবশ্য অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোনও আইন সংসদে গৃহীত হয়নি।

সাংবিধানিক শর্ত "যতক্ষণ না সংসদ আইন করে ব্যাখ্যা করবে" এবং সংসদীয় সংজ্ঞা ও লিপিবদ্ধকরণের প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

যখন সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন বন্ধ থাকে এবং রাষ্ট্রপতি তৎক্ষণাৎ কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন তখন সংবিধানের 123 অনুচ্ছেদ বলে অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এই সমস্ত অধ্যাদেশ আইনের মর্যাদা ও গুরুত্ব পায়। একমাত্র এই সমস্ত অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে সংসদ চালু হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে

সংসদের অনুমোদন নিতে হয়। এ কথা বলা হয়, রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিচার বিভাগের এক্তিয়ারের বাইরে কিন্তু রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি মানে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সন্তুষ্টি বোঝায়। *এ কে রায় বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1982 SC 710; *কুপার বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1970 SC 564; *সৎপাল বনাম লেঃ গভর্নর* AIR 1979 SC 1550; *ভেঙ্কট বনাম অন্ধ্র প্রদেশ* AIR 1985 SC 725 ; *নাগরাজ বনাম অন্ধ্র প্রদেশ,* AIR 1985 SC 55; *রাজস্থান বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1977 SC 136)।

সংসদ থেকে অনুমোদন নেওয়ার পরিবর্তে একটি অধ্যাদেশের পুনরায় প্রচলন বা একটি অধ্যাদেশ চালু করার জন্যই সভা না ডাকা সংবিধানের ওপর বলাৎকার বলে বিবেচিত হয়েছে—বিহারের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে (*ডি সি ওয়াধওয়া বনাম বিহার সরকার* AIR 1987 SC 579)। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনা অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বেশ কয়েকবার আদালতে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে প্রশ্নে তোলা হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে অধ্যাদেশের সাংবিধানিক বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা, সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মতোই সীমাবদ্ধ; কোনও বিচারাধীন বিষয়, মৌলিক অধিকার সপ্তম তফসিলীতে বর্ণিত আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রভৃতি। (*পাঞ্জাব রাজ্য বনাম মোহর সিং* AIR 1955 SC 84; *ওড়িশা রাজ্য বনাম ভূপেন্দ্র* AIR 1962 SC 945; নাগরাজ বনাম অন্ধ্র প্রদেশ AIR 1985 SC 551; *ভেঙ্কটা বনাম অন্ধ্র প্রদেশ* AIR 1985 SC 724; *আর কে গর্গ বনাম ভারত ইউনিয়ন* 1981 SC 2139; *এ কে রায় বনাম ভারত ইউনিয়ন* AIR 1982 SC 710)।

সংসদের দুই কক্ষের পারস্পরিক ভূমিকা ঃ

অর্থ সংক্রান্ত বিষয় এবং মন্ত্রী পরিষদের দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত বিষয়ে সংসদের উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয় এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর দায়বদ্ধতা একান্তভাবে লোকসভার বিষয়। সেজন্য রাজ্যসভার ক্ষমতার মধ্যে নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় ঃ

(i) অর্থ বিল রাজ্যসভায় পেশ করা যায় না।
(ii) অর্থ বিলেব পরিবর্তন বা বর্জন করার ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই। রাজ্যসভা অর্থ বিলের উপর শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে। যদি 14 দিনের মধ্যে রাজ্যসভা সুপারিশ সহ অর্থ বিল লোকসভায় ফেরত না পাঠায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় বিলটি লোকসভায় যেমনভাবে গৃহীত হয়েছে সেই রূপেই উভয় সভার অনুমোদন পেয়েছে (109 অনুচ্ছেদ)।
(iii) 110(3) অনুচ্ছেদে লোকসভার অধ্যক্ষই স্থির করেন কোন্‌টি অর্থ বিল।
(iv) রাজ্যসভা "বার্ষিক অর্থ সংক্রান্ত বিবরণের' ওপর অলোচনা করতে পারে (113 অনুচ্ছেদ) কিন্তু অনুমোদনের দাবির ওপর ভোট দিতে পারে না।

(v) মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। (75(3) অনুচ্ছেদ)।

অর্থ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য সব বিষয় আলাদা আলাদাভাবে সংসদের দুই কক্ষে অনুমোদন না পেলে আইনে পরিণত হতে পারে না। রাষ্ট্রপতিকে নিন্দা করা, উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা, সংবিধান সংশোধন করা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ (সংবিধানের 56, 61, 67, 124 (1), 217 (1) (b) অনুচ্ছেদ) রাষ্ট্রপতির জারি করা অধ্যাদেশ, জরুরি অবস্থা জারি বা কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যর্থতা সম্পর্কিত আদেশ অবশ্যই সংবিধানের উভয় কক্ষে পেশ করতে হয় (123, 352(4) ও 356(4)। অর্থ বিল ও সংবিধান সংশোধন বিল ব্যতীত অন্য কোনও বিল সম্পর্কে দুই কক্ষে মতপার্থক্য দেখা দিলে উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়। লোকসভার অধ্যক্ষ এই যুক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন (108 ও 3118 (4) অনুচ্ছেদ)।

সংবিধান রাজ্যসভার ওপর বিশেষ কিছু ক্ষমতা অর্পণ করেছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয় নিয়ে সংসদে আইন করার ঘোষণা জাতীয় স্বার্থে একমাত্র রাজ্যসভাই করতে পারে। যদি দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় রাজ্যসভা এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে সংসদ সমগ্র দেশ অথবা কোনও অংশের জন্য এমন কি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় নিয়েও আইন তৈরি করতে পারে (249 অনুচ্ছেদ)। জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করে রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এক বা একাধিক সর্বভারতীয় চাকুরির প্রস্তাব গ্রহণ করলে সংসদ ঐ বিষয়ে আইন তৈরি করে (312 অনুচ্ছেদ)।

সংসদ ও প্রশাসন ঃ

নতুন লোকসভা গঠিত হওয়ার পর অধিকাংশের বেশি সমর্থনপুষ্ট দল বা দলগুলির নেতাকে সরকার গঠন করার জন্য রাষ্ট্রপতি আহ্বান করেন। প্রধানমন্ত্রী সাধারণভাবে লোকসভার সদস্য হন কিন্তু উভয় সভার সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। দুই কক্ষের সদস্য নন এমন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে যে কোনও এক কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হতে হয়। অন্যথায় তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রিসভা যেহেতু যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ (75 অনুচ্ছেদ) সেজন্য লোকসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা সাংবিধানিক ভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে।

আমাদের সংবিধানে প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুই বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর এবং শত্রুতা ও বিভাজন নেই বললেই চলে। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী

হিসাবে নয়, সরকারি কাজ করার জন্য বিভাগ দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংসদ একটি বিশাল ব্যাপার। নিজের পক্ষে নিজেকে শাসন করা সম্ভব হয় না। মন্ত্রিসভাকে এক অর্থে বলা যায় সংসদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। অন্য অর্থে প্রশাসন কোনও বহিরাগত সংস্থা নয়। মন্ত্রিসভা যেহেতু সংসদের মধ্য থেকেই তৈরি হয় এবং মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী থাকে, তাই বলা যায় সম্পর্কটা পরস্পর নির্ভর এবং সামগ্রিকের একটি অংশমাত্র। যদিও প্রশাসনের ক্ষমতা ও সংসদের ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে (75 অনুচ্ছেদ)। সংসদ আইন তৈরি করে, উপদেশ দেয়, সমালোচনা করে এবং জনগণের ক্ষোভকে প্রকাশ করে। আর সংসদের তরফ থেকে শাসন কাজ পরিচালনা করাই হল প্রশাসনের দায়িত্ব।

প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগেই আইনগত বা অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাবাদি সংসদে পেশ করা হয়। সংসদ যে কোনও তথ্য জানতে চাইতে পারে, যে কোনও বিষয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা করতে পারে এবং প্রশাসন বিভাগের প্রস্তাবের ওপর সম্মতি দিতে পারে, প্রশাসন সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, সংসদ প্রশাসন বিভাগের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং প্রশাসনের ওপর সংসদীয় নজরদারি বহাল রাখে।

সংসদ ও বিচারবিভাগ ঃ

বিচারালয়ের সংবিধান, সংগঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে প্রধান বিচারপতি ছাড়া 7 জনের বেশি বিচারক থাকবে না। অবশ্য সংসদ ইচ্ছা করলে এই সংখ্যা বাড়াতে পারে (124 অনুচ্ছেদ), আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সংসদ আইন করে

(i) হাইকোর্টের এক্তিয়ারে কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে বা হাইকোর্টের এক্তিয়ার থেকে কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বের করে নিতে পারে।

(ii) দুই বা ততোধিক রাজ্য অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ তৈরি করতে পারে

(iii) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাইকোর্ট তৈরি করা অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও আদালতকে হাইকোর্টের মর্যাদা দিতে পারে (241 অনুচ্ছেদ)।

সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠাতে পারেন। কোনও বিচারপতির বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে বিশেষ গরিষ্ঠতায় অর্থাৎ মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। (124(4) 218)। কোনও বিচারকের অপসারণ দাবি করে

রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানানো ছাড়া সংসদ সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতির আচরণ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে পারে না (121 অনুচ্ছেদ)।

সংসদ আইন করে কেন্দ্রের জন্য একটি প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল এবং রাজ্যগুলির জন্য আলাদা আলাদা বা দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে। এজন্য তৈরি আইনে ট্রাইবুনালের ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের উল্লেখ করা হয়। এই আইন অন্য আদালতের এক্তিয়ার বর্জন করতে পারে। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র 136 অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক্তিয়ার (323A ও 323B অনুচ্ছেদ)। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে সংসদ সর্ব-ভারতীয় বিচার-কৃত্যক তৈরি করতে পারে যেখানে জেলা জজের উর্ধ্বস্তন পদমর্যাদার নিয়োগ হতে পারে (312 (1) ও (3) ধারা)।

ক্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির অভিযোগ করেও সংসদের কার্যবিবরণীর বৈধতা কোনও আদালতে তোলা যায় না (122 (1) ও 212 (1) অনুচ্ছেদ)। অধ্যক্ষ অথবা অন্য কোনও সদস্য যিনি সভার কাজ পরিচালনা করছিলেন, অথবা সংসদের সিদ্ধান্ত কার্যকরি করার জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না (122 (2) ও 105 (3))।

কোনও আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তোলা যায় যখন ঐ আইনের বিষয়বস্তু

i. যে আইনসভায় আইনটি গৃহীত হয়েছে তার এক্তিয়ার ভুক্ত নয়
ii. সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপন্থী
iii. অথবা কোনও একটি মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় চূড়ান্ত। তার বিরুদ্ধে কোনও আবেদন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট যতক্ষণ না নিজে পর্যালোচনা করে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ততক্ষণ তা দেশের আইন হিসাবে কার্যকর থাকে। অবশ্য এই আইন বা সংবিধান সংশোধন করতে পারে সংসদ। বিচার বিভাগ সংসদের কোনও কাজকে বাতিল করলে সংসদ ক্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় তা চালু করতে পারে। তাছাড়া সংসদ তার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারে যাতে ঐ আইনকে আর অসাংবিধানিক বলা যাবে না। অর্থাৎ, ভারতের সংসদ ব্রিটিশ সংসদের মতো ক্ষমতাবান নয়। ব্রিটিশ সংসদে গৃহীত আইন সম্পর্কে বিচার বিভাগ কোনও অভিমত প্রকাশ করতে পারে না। একই ভাবে ভারতের বিচার বিভাগ আমেরিকার বিচার বিভাগের মতো সর্বশক্তিমান নয়। বিচার বিভাগ সেখানে যে কোনও বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সংসদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এমন কি সুপ্রিম কোর্টেও ভিন্নমত রয়েছে। (*এ কে গোপালন বনাম মাদ্রাজ* (1950) SCR 88, *শঙ্করী প্রসাদ বনাম ভারত ইউনিয়ন*

AIR 1951 SC 458) গোপালন মামলায় অবশ্য নিজের এক্তিয়ারে সংসদ সর্বোচ্চ বলে রায় দেওয়া হয়েছে।

সংসদের কার্যাবলী ঃ

আইন প্রণয়ন ঃ প্রথানুসারে আইন প্রণয়নই সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 245-246 অনুচ্ছেদ মতে সংসদ সমগ্র ভারত অথবা কোনও বিশেষ অঞ্চলের জন্য আইন করতে পারে। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে তিনটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় সংসদের ক্ষমতা পরিপূর্ণ। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে সংসদের আইনের সঙ্গে বিধানসভা প্রণীত আইনের বিরোধ বাধলে পূর্বোক্ত আইন বলবৎ থাকে (254 অনুচ্ছেদ)। অবশিষ্ট বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা সংসদের ওপর অর্পিত হয়েছে (248 অনুচ্ছেদ এবং কেন্দ্রীয় তালিকার 97 ক্রমাঙ্ক)।

বেশ কিছু ধারা বলে বিভিন্ন বিষয়ে সংসদের ওপর আইন করার দায়িত্ব বর্তায় যখন "সংসদ পারে আইন দ্বারা" অথবা "সংসদ যতক্ষণ না আইন করে সুপারিশ করছে" বা "সংসদ আইনত যা করতে পারে তা ব্যতীত" প্রভৃতি বলা হয়। 2, 3 এবং 4 অনুচ্ছেদ বলে সংসদ কোনও রাজ্যের নাম ও সীমা পরিবর্তন করতে পারে, নতুন রাজ্য সৃষ্টি করতে পারে, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতে পারে, অতিরিক্ত আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (124 ও 247 অনুচ্ছেদ) 249 অনুচ্ছেদে সংসদ রাজ্য তালিকা থেকেও আইন তৈরি করতে পারে। 253 অনুচ্ছেদে সংসদ বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে করা চুক্তি কার্যকর করার জন্য আইন তৈরি করতে পারে বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হলেও। এছাড়া রাষ্ট্রপতি শাসনে (356 অনুচ্ছেদ) বা জরুরি অবস্থায় (352 অনুচ্ছেদ) সংসদ রাজ্য বিষয়ে আইন করতে পারে।

প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ঃ 368 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রয়োজনীয় কিছু ক্ষমতা আছে। বেশ কিছু অনুচ্ছেদ সংসদ সংশোধন করতে পারে বিশেষ গরিষ্ঠতায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করতে রাজ্যগুলির সম্মতি লাগে।

সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় এবং আমাদের সাংবিধানিক পরিধিতে শাসন বিভাগ ও মন্ত্রিসভার দায়িত্ব, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে সংসদকে সচেতন থাকতে হয়। শাসন বিভাগ বা সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। (i) লোকসভার নিকট মন্ত্রিসভার যৌথ দায়বদ্ধতার সাংবিধানিক পদ্ধতি এবং (ii) সংসদের বাজেট নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা (75, 114-116, 265 অনুচ্ছেদ)।

শাসন বিভাগের উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক। কিন্তু শাসন বিভাগের দায়বদ্ধতা প্রত্যক্ষ, অবিরাম এবং নিত্যনৈমিত্তিক। সংসদের অধিবেশন কালে সরকারের স্থায়িত্ব প্রতি মুহূর্তে সংসদের আস্থার ওপর নির্ভর করে। সভা অধিকাংশের ভোটে যে কোনও সময়ে সরকার ফেলে দিতে পারে। অর্থাৎ, শাসকদল অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারালে সরকার পড়ে যায়। এজন্য কোনও যুক্তি তর্ক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সভা যখন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে যে সরকারকে সভা সমর্থন করছে না তখন সরকারকে পদত্যাগ করতেই হয়। সরকারের প্রতি সংসদের আস্থাহীনতা প্রকাশ করা যায় :- (a) মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে, (b) নীতি সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকার পক্ষকে পরাস্ত করে, (c) মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ করে, (d) অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরাস্ত করে।

সরকারি অর্থের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ — কর বসানো বা সংশোধন বা ব্যয় বরাদ্দের ওপর ভোটের মাধ্যমে সংসদ শাসন বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদে গৃহীত আইন ব্যতীত জনসাধারণের ওপর কোনও কর ধার্য করা বা সরকারি কোষাগার থেকে কোনও অর্থ ব্যয় করা যায় না (114-116 ও 265 অনুচ্ছেদ)।

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু বাজেট নিয়ন্ত্রণের পুঁথিগত বিষয় এবং অনাস্থা ভোটের চূড়ান্ত পদক্ষেপ ব্যতীত সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ আর বিশেষ কার্যকর নয়, এমন কি সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থানেও। কার্যত সভার গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে সরকারই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার ইচ্ছা করলে সংসদ বাতিল ঘোষণা করে নতুন নির্বাচন করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করতে পারে।

প্রশাসনকে সংযত রাখা হয় আইন প্রণয়ন করে। তাছাড়া সংসদীয় বিভিন্ন পদ্ধতি—যেমন প্রশ্ন করা, বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে আলোচনা, সংসদীয় কমিটির নজরদারির মাধ্যমে এবং সর্বোপরি বিভাগীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে যিনি সংসদের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

অন্য কার্যাবলী ঃ এছাড়াও সংসদ আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে। যেমন রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতির অপসারণ, ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষক, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, দুই কক্ষের সভাপতিদের অপসারণ, সংসদের কাজের মধ্যে পড়ে (61, 124, 217, 148, 324, 90 অনুচ্ছেদ)

দলত্যাগ বিরোধী আইন ঃ

1985 সালের 52তম সংবিধান সংশোধনী আইন সংবিধানের 101,102,190,191

অনুচ্ছেদ সংশোধন করে। সংসদ ও বিধানমণ্ডলীর সদস্যপদে অযোগ্যতা ও শূন্য আসন সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করে সংবিধানে একটি নতুন তালিকা (দশম তফসিলী) অন্তর্ভুক্ত করে। দশম তফসিলে আছে ঃ

i. কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য সংসদ কিংবা রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় দলের সভ্যপদ ত্যাগ করলে বা দলের নির্দেশ অমান্য করে সভায় ভোট দিলে বা ভোটদানে বিরত থাকলে তিনি দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী অযোগ্য বিবেচিত হবেন।
ii. সংসদ ও বিধানমণ্ডলীর কোনও নির্দল সদস্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
iii. সংসদ ও বিধানমণ্ডলীর কোনও মনোনীত সদস্য যিনি মনোনয়ন পাওয়ার সময় কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, বা আসন গ্রহণ করার ছ'মাসের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেননি, তিনি যদি ছ'মাস পর কোনও দলে যোগ দেন তবে দলত্যাগ বিরোধী আইন বলে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
iv. তবে কোনও রাজনৈতিক দলের মোট সাংসদ বা বিধায়কের এক তৃতীয়াংশ যদি দল ভেঙে আসেন অথবা দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অন্য দলের সঙ্গে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
v. লোকসভা বা বিধানসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান বা বিধান পরিষদের সভাপতি বা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ যদি তাঁর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন তাহলে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন না।
vi. সংসদ বা বিধানমণ্ডলীর কোনও সদস্য অযোগ্য কি না তা স্থির করবেন সেই ব্যক্তি যে সভার সদস্য তার অধ্যক্ষ বা সভাপতি। যেখানে অধ্যক্ষ বা সভাপতিকে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে সেখানে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কোনও সদস্যকে এজন্য মনোনীত করা হয় এবং তিনিই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
vii. এই তালিকার ধারাগুলি কার্যকর করার জন্য সভার অধ্যক্ষ বা সভাপতিকে বিধি তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই বিধি সদস্যদের সামনে পেশ করতে হয় এবং তা পরিবর্তন বা বর্জন করা যায়।
viii. দশম তফসিলের নিরিখে কোনও সদস্য অযোগ্য কি না তা নির্ধারিত হবে সাংসদদের ক্ষেত্রে 122 অনুচ্ছেদ এবং বিধায়কদের ক্ষেত্রে 212 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
ix. এতদসত্ত্বেও কোনও আদালতের কোনও সদস্য অযোগ্য কিনা তা বিচার করার এক্তিয়ার নেই।

সংবিধানের 52তম সংশোধনী আইন 1985, যা পরবর্তীকালে দলত্যাগ বিরোধী আইন নামে বেশি পরিচিত হয়েছে, প্রথম থেকেই যথেষ্ট বির্তক সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন অজুহাতে এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে—যেমন এটি সংবিধানের মূল আদর্শের পরিপন্থী, এটি সংসদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বা এই আইনে নীতির চাইতে যৌক্তিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দশম তফসিলের সপ্তম প্যারাগ্রাফ, যেখানে আদালতের এক্তিয়ার অস্বীকার করা হয়েছে তা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সংবিধান-বিরোধী বলে খারিজ করে

দিয়েছেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। তাছাড়া এই আইনের যৌক্তিকতা ও সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একাধিক লিখিত আবেদন সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছে। সরকারের অনুরোধে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন আদালতে এ বিষয়ে পেশ করা সমস্ত আবেদন বিচার করার জন্য নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে এসেছেন। সুপ্রিম কোর্ট (*খিতো হোলাহন বনাম যাচিল্লু* এবং অন্যান্য মামলা, SC CWP 17 1991) এর মধ্যে আইনগত ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, কারণ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার আগে এই সংবিধান সংশোধন বিল প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়নি। তাছাড়া দশম তফসিলে অধ্যক্ষের কাজের আইনগ্রাহ্যতা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় অভিমতের প্রয়োজন আছে। তালিকার সপ্তম প্যারাগ্রাফ, যেখানে আদালতের হস্তক্ষেপ নিষেধ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সেটি বাতিল করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করার সময় অধ্যক্ষের ভূমিকা ট্রাইবুনালের মতো দাঁড়ায়, তাই অন্য সমস্ত ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের মতো এক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তও বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার যোগ্য। দলত্যাগকে বেআইনি ঘোষণা করার জন্য যাঁরা 52তম সংবিধান সংশোধনের মুসাবিদা করেছিলেন, তাঁরা অনেক পরিস্থিতির কথা ভাবতেই পারেননি। তাছাড়া দশম তফসিলের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক একজন সভাপতি এক এক রকমের রায় দেওয়ার ফলে আইনের প্রয়োগ নিয়ে বেশ জটিলতা দেখা দেয় এবং বেশ কয়েকটি ত্রুটি পাদপ্রদীপের সামনে চলে আসে।

কেন্দ্রে ভি পি সিং ও চন্দ্রশেখরের সরকার খুব দ্রুত পড়ে যায়। যদিও চন্দ্রশেখর জনতা দল (এস) সরকার গঠন করেন এবং প্রস্তাবের মাধ্যমে সভার আস্থা অর্জন করেন, তথাপি শাসক জনতা দল (এস) এর সকল সদস্যই হয় ভি পি সিং কর্তৃক বহিষ্কৃত, অথবা অধ্যক্ষ রবি রায় কর্তৃক "বিযুক্ত" বলে ঘোষিত। অথবা দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী অধ্যক্ষ রবি রায় তাঁদের ওপর কারণ দর্শাবার নোটিশ জারি করেন। অধ্যক্ষের এই আদেশ চন্দ্রশেখর সহ মন্ত্রিসভাব সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই অবস্থা 1991 সালের 11 জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল যেদিন রবি রায় শাসক দলকে সন্দেহের অবকাশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন এবং এই ভাঙ্গনকে এককালীন পদ্ধতি যা 5 নভেম্বর শুরু হয়েই শেষ হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 54 জন সাংসদ নিয়ে জনতা দল (এস) কে রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দেওয়া হয়। যে সাতজন সদস্য ভাঙ্গনের পরে যোগ দেন তাঁদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

জনতা দল ভাঙ্গনের অপর একটি ক্ষেত্রে, 59 জন জনতা দল সদস্যের মধ্যে 20 জন 1992 সালের 7 আগস্ট দলবদ্ধভাবে সশরীরে অধ্যক্ষ শিবরাজ পাটিলের

সামনে হাজির হয়ে দাবি করেন, তাঁরা একটি গোষ্ঠীভুক্ত এবং ভি পি সিং-এর নেতৃত্বাধীন জনতা দল থেকে তাঁদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হোক। যদিও এঁদের মধ্যে 8 জনকে জনতা দল পূর্বেই দু'দফায় বহিষ্কার করে, তথাপি অধ্যক্ষ লোকসভায় তাঁদের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা করেন। যদিও লোকসভার সমস্ত সরকারি নথিপত্রে তাঁদের জনতা দল সদস্য হিসাবেই দেখানো হতে থাকে। 1993 সালের 1 জুন অধ্যক্ষ পাতিল তাঁর চূড়ান্ত রায়ে ঘোষণা করেন: (i) সংবিধানে রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনও সাংসদ বা বিধায়কের সংসদীয় মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার জন্য তাকে বহিষ্কার করার অধিকার দেওয়া হয়নি (দশম তফসিল ব্যাখ্যা (4) থেকে অনুচ্ছেদ 2(1)) এবং (ii) 1992 সালের 7 আগস্ট তারিখে এই 20 জন সাংসদের কেউ অযোগ্য ছিলেন না এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় এক-তৃতীয়াংশ শক্তি সেদিন ছিল। সেজন্য জনতা সংসদীয় দল থেকে তাঁদের দলত্যাগ বৈধ। অধ্যক্ষ ঐ 20 জনের মধ্যে 4 জনকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন—স্বেচ্ছায় দলীয় নির্দেশ অমান্য করার জন্য। যদিও নির্দেশ জারি করার দিন থেকে এই অযোগ্যতা বিবেচিত হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অধ্যক্ষ স্বীকার করেন দলত্যাগ বিরোধী আইন ত্রুটিপূর্ণ এবং এর পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন। তিনি আরও সুপারিশ করেন যে দশম তফসিল অনুযায়ী সাংসদদের অযোগ্যতা কোনও বিচারপতিকে দিয়ে নির্ধারণ করা হোক।

সকলেই মনে করেন দলত্যাগ বিরোধী আইন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং ইতিমধ্যে এই আইন আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বহু ক্ষতি করেছে এবং সেজন্য অতি সত্বর এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'রাজনৈতিক দল', 'ভাঙ্গন', 'একীভূত' প্রভৃতি শব্দগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

দশম তালিকায় 'সংসদীয় দল' বা "মূল রাজনৈতিক দল" উভয়কেই রাজনৈতিক দল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে রাজনৈতিক দলের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক দলকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং দলত্যাগ বিরোধী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এর স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, শর্তসমূহের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন কারণ দশম তফসিলের তৃতীয় প্যারাগ্রাফের সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী ভেঙে আসা অংশকে 'রাজনৈতিক দলের' মর্যাদা দেওয়া হয় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের 1 নং ধারা অনুযায়ী (এস সি কাশ্যপ— "দলত্যাগ বিরোধী আইন ও সাংবিধানিক অব্যাহতি", ত্রিপাঠি, বোম্বে 1993)।

তেরো

বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ 124 - 147 এবং 214 - 237

ভারতের বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের 'কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থা' শিরোনামে। রাজ্যস্তরের বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে 'রাজ্যের হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালত, শিরোনামে। উল্লেখ করা প্রয়োজন আমাদের এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা নেই।

সমগ্র ভারতে অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা চালু আছে। প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্র-রাজ্য বিষয়ে বা আন্তঃরাজ্য বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একমাত্র আপিল আদালত।

প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রিম কোর্ট

গঠন ও বিচারপতি পদের শর্তাদি ঃ সংবিধানের 124 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন প্রধান বিচারপতি ও সাতজন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য ঐ অনুচ্ছেদে সংসদে আইন করে এই সংখ্যা বাড়াবার কথাও বলা আছে। 1986 সালে আইন করে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত ঐ সংখ্যা 25 করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচারক নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের যে সমস্ত বিচারকের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বোধ করবেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। বিচারকদের নিয়োগের সময় তিনি প্রধান

বিচারপতির সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করবেন। সুপ্রিম কোর্ট মনে করেন কার্যকরী পরামর্শ, মতবিনিময় ও মেধার পরীক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব কিছুতেই সম্মতি দিতে হবে। বিচারপতি ভগবতী মনে করেন, প্রধান বিচারপতির নাম সুপারিশ করার জন্য একটি প্যানেল গঠন করা উচিত, তাতে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে। (*এস. পি. গুপ্তা বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* AIR 1982 SC 149)। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে গেলে একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টের অ্যাড্ভোকেট হিসাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা বা খ্যাতনামা আইনজ্ঞীবী হওয়া চাই।

প্রধান বিচারপতির সুচিন্তিত অভিমত পাওয়ার পর মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে আলোচনা করে কাদের নিয়োগ করতে হবে সেই পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দেন। রাষ্ট্রপতি সেইমতো কাজ করেন। প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম বিচারককে নিয়োগ করা হয়। সত্তরের দশকে স্বল্প সময়ের জন্য এই রীতি অস্বীকার করা হয়। কয়েকজন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন তাঁদের চাইতে প্রধান বিচারপতিদের টপকে। যাই হোক, প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের রীতি আবার চালু হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ 65 বৎসর পর্যন্ত নিজেদের পদে থাকতে পারেন। অসদাচরণ ও অযোগ্যতার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি যে কোনও বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন। তবে এই অপসারণ প্রস্তাব সংসদের উভয় সভার মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন, সংসদ আইন করে এই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (124 অনুচ্ছেদ)। সম্প্রতি বিচারপতি রামাস্বামীকে অপসারণের প্রস্তাব লোকসভায় প্রয়োজনীয় সমর্থন পায়নি।

প্রচলিত ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে আমাদের সংবিধানে বিচারপতিদের ইমপিচমেন্ট করার কোনও ধারা নেই। একমাত্র রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া অপসারণ পদ্ধতি ও ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এমন কি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গ্রহণ এবং কোনও বিচারপতিকে অপসারণ করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করার প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ইমপিচমেন্টের ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে সংসদের উভয় সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি তাঁর রাষ্ট্রপতি থাকার যোগ্যতা হারান। কিন্তু অপসারণ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির কথা ভাবতেও পারেন।

কার্যভার গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক বিচারক রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি মনোনীত

ব্যক্তিদের সামনে সংবিধান নির্দেশিত বয়ানে শপথ গ্রহণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরূপে কাজ করেছেন এমন কোনও ব্যক্তি ভারতের কোনও আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারেন না (124 (l) এবং (7)) অনুচ্ছেদ।

125 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের বেতন, সংসদ আইন করে স্থির করবে। যতদিন তা না হয় দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত বেতন পাবেন। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি মাসিক 10,000 টাকা মূল বেতন পান, অন্যান্য বিচারকরা পান 9000 টাকা। তাছাড়া ভাতা, বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসভবন, দেশের মধ্যে ভ্রমণ খরচা, পেনশন তাঁরা পান।

প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে, কাজ চালাবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মধ্য থেকে (126 অনুচ্ছেদ) রাষ্ট্রপতি একজন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

কোনও মামলা বিচার করার সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক পাওয়া না গেলে ভারতের প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের বিচারকদের মধ্যে থেকে সুপ্রিম কোর্টে অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই এবং প্রধান বিচারপতি যতদিন ইচ্ছে ততদিন তাঁদের ঐ পদে রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে এই নিয়োগ করেন। এ ধরনের বিচারকদের সুপ্রিম কোর্টের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে প্রধান বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদেরও অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, যাঁর সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ছিল এমন ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করা হয়। নিয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিচারকের সঙ্গে কথা বলা যায়। প্রধান বিচারপতি যতদিন প্রয়োজন মনে করেন ততদিন তাঁদের অস্থায়ী বিচারপতি হিসাবে কাজ করতে হয় (127 ও 128 অনুচ্ছেদ)।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার ঃ সংবিধানের 129 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে অভিলেখ আদালত বলা হয়েছে এবং এরূপ আদালতের সমস্ত ক্ষমতাই সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলে সুপ্রিম কোর্টের কার্য-বিবরণী, আইন, সিদ্ধান্ত সবই সংরক্ষিত থাকে, প্রয়োজনে আইনের সমর্থনে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তুলে ধরার জন্য। সুপ্রিম কোর্টে সংরক্ষিত নথিপত্র ভারতের যে কোনও আদালত প্রামাণ্য তথ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত অভিলেখের সত্যতা নিয়ে কোনও আদালতে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না (*দপ্তরী বনাম গুপ্তা* AIR 1971 SC 1172; *নাম্বুদ্রিপাদ বনাম নাম্বিয়ার* AIR 1970 SC 2015)।

অভিলেখ আদালত নিজের অবমাননার জন্য শাস্তি নিজেই দিতে পারে। কিন্তু এই চরম ক্ষমতা একান্ত বাধ্য না হলে প্রয়োগ করা হয় না। আদালত ও তার কাজকর্মের সুস্থ ও গঠনমূলক সমালোচনায় এই শাস্তি দেওয়া হয় না। জনস্বার্থে বিচার বিভাগীয় কোনও কাজের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা, আদালত অবমাননা বলে বিবেচিত হয় না।

সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্ষেত্রকে মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা — এই ভাবে ভাগ করা যায়। মূল এলাকার অর্থ — প্রথমেই যে মামলার শুনানি ও বিচার করা হয়। সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার, মধ্যে (ক) কেন্দ্রের সঙ্গে কোনও এক বা একাধিক রাজ্যের বিবাদ (*যেমন পশ্চিমবঙ্গ বনাম কেন্দ্র* AIR 1963 SC 1241) (খ) একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অন্যদিকে এক বা একাধিক রাজ্য সরকার এমন কোনও বিরোধ, (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোনও সন্ধি বা চুক্তি যা কার্যকর রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে কোনও বিবাদ সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারে পড়ে না (131 অনুচ্ছেদ)। আরও কিছু ক্ষেত্র সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে যেমন, আন্তঃরাজ্য জল-বিবাদ (262 অনুচ্ছেদ), অর্থ কমিশনে প্রেরিত বিষয়সমূহ (280 অনুচ্ছেদ) এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের কিছু কিছু ব্যয় ও পেনশন সংক্রান্ত সমঝোতা (290 অনুচ্ছেদ)। কোনও রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না (131 অনুচ্ছেদ)। সাধারণ অর্থকরী বিষয়গুলি এই ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় (*কেন্দ্র বনাম রাজস্থান সরকার* (1984) 4 SCC 238)। আইন এবং আইনের অধিকার সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য আনা যায়।

1978 সালের 4তম সংবিধান সংশোধন করে 139A অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার ফলে সুপ্রিম কোর্ট ইচ্ছা করলে এক বা একাধিক হাইকোর্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ের মামলা নিজ হাতে নিতে পারেন। আবার বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট কোনও মামলা এক হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করতে পারেন।

মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়টিও সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকা সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের অন্তর্গত। এই আইন কার্যকর করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট লেখ (writ) জারি করতে পারেন (32 অনুচ্ছেদ)। আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে কোনও সাধারণ নাগরিক মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল এলাকা দেওয়ানি, ফৌজদারি, সংবিধানের ব্যাখ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। দেওয়ানী মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্ন জড়িত আছে বলে ধর্মাধিকরণ কোনও প্রমাণপত্র দিলেই তা সুপ্রিম কোর্টে

আপিলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কোনও দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রিম কোর্টে হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করলে সেই মামলার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় (133 অনুচ্ছেদ)।

ফৌজদারি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় (ক) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালতে নির্দোষ বলে প্রমাণিত কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেন অথবা (খ) নিম্ন আদালতে বিচার চলাকালীন কোনও বিচার নিজের হাতে নিয়ে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন (134 অনুচ্ছেদ) (*রামকুমার বনাম মধ্যপ্রদেশ* AIR 1975 SC 1026; *পদ্মা নারায়ণ বনাম উত্তর প্রদেশ* AIR 1975 SC 1252)।

134 (1) (c) অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় যদি হাইকোর্ট 134 (a) অনুচ্ছেদে মামলাটিকে সুপ্রিম কোর্টের নিকট আপিলযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু উপধারা (c) তে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেই এই আপিল করতে হবে। ফৌজদারি মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশ্ন জড়িত আছে বলে হাইকোর্ট মনে করলে অথবা সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের অনুমতি না পেলে অভিযুক্তের প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে বলে হাইকোর্ট মনে করলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার অনুমতি হাইকোর্ট দিতে পারেন।

136 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট ইচ্ছা করলে ভারতের অন্তর্গত যে কোনও আদালতের রায়, আদেশ, মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন। বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করার যে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের আছে তা 134 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টগুলি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার যে প্রমাণপত্র দেয় তার চাইতে অনেক ব্যাপক। একমাত্র সামরিক আদালত ব্যতীত যে কোনও আদালতের যে কোনও রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট এই বিশেষ অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট নিজেই ঘোষণা করেছেন একমাত্র যেখানে বিচারের অপব্যাখ্যা হয়েছে বলে মনে করবেন সেখানে তাঁরা বিশেষ আবেদনের অনুমতি দেবেন (*হরিপদ দে বনাম পঃ বঙ্গ* AIR 1965 SC 1050; *রাম সরন বনাম সি. টি. ও.*, AIR 1962 SC 1326)।

সংবিধানের 143 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে পরামর্শ দানের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত নিতে পারেন অথবা জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ের উপর সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির অনুরোধ পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে মতামত জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপতি এই পরামর্শ গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পারেন। এই সংক্রান্ত প্রথম উল্লেখ *'দিল্লি আইন মামলা'* (1951) SCR 747।

এছাড়া সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার পত্র,

সনদ প্রভৃতি যা পরবর্তী সময়ে চালু আছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের অভিমত চাইতে পারেন।

138 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত যে কোনও বিষয়ে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থাবলে সুপ্রিম কোর্টের উপর কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারেন, সংসদ আইন করে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। এর ফলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে তাড়াতাড়ি রায় দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি যে কোনও মামলা নিজ এক্তিয়ারে নিয়ে আসতে পারেন।

সংবিধানের 144 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য, ভারতের সীমানার অন্তর্গত সমস্ত অসামরিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্থাকে সুপ্রিম কোর্টের সাহায্যে কাজ করতে বলা হয়েছে। আদালতের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে বিধি তৈরি করেন। প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়োগ করেন অথবা অন্য বিচারপতি বা অফিসারকে সেই কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেন (145-146 অনুচ্ছেদ)।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে বোঝায় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও আইন, ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করা। এ বিষয়ে আমাদের সংবিধান মার্কিন রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই কেন্দ্র বা রাজ্যের যে কোনও আইন সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। এজন্য ভারত ছাড়া প্রায় সর্বত্র কোনও আইনকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে সংবিধান সংশোধন করে সেই আইনকে কার্যকর করা হয়।

কোনও আইন কার্যকর করার সময় সরকার প্রায়শই তার বিচার বিভাগীয় অধিকার লঙ্ঘন করেন বলে সুপ্রিম কোর্টে বহু মামলা হয়। সাধারণত কোনও রাজ্য সরকার বা ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক, সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ক্ষমতা নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা করেন। এমন আইন পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচাব বিভাগীয় অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে কি না তা বিচার করেন। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর একটি অধ্যায় সংযোজিত হওয়ায় এই ধরনের পর্যালোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। 12 অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করে। এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ও বিধানমণ্ডলী সহ ভারতের সমস্ত সরকারি এবং স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহকে বোঝানো হয়েছে।

13 অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী যে কোনও আইনকে বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। 1967 সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট মনে করতেন সংবিধান সংশোধন

করে গৃহীত কোনও অধিনিয়ম 13(2) অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে 'আইনের' মর্যাদা পেতে পারে না। কিন্তু *গোলকনাথ মামলায়* সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, সংবিধান সংশোধন করে গৃহীত অধিনিয়মও আইনের মর্যাদা পাবে এবং সেই আইন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এক্তিয়ারভুক্ত। 24তম সংবিধান সংশোধনী 1971 নতুন একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করে। এটি 13(4) অনুচ্ছেদ। এতে বলা হয় 13(2) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধন কোনও আইন নয়। *কেশবানন্দ ভারতী মামলায়* সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত সমর্থন করেন।

মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে 32 অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের উপর বিশেষভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ-বলে মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য যে কোনও নাগরিক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকায় এই আবেদনের শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টকে প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিক অধিকার বজায় রাখার জন্য নির্দেশ, আদেশ, লেখ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

226 অনুচ্ছেদে রাজ্যের হাইকোর্ট সমূহকে একই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট নিজের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করতে পারেন যার মধ্যে বন্দিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করা, নিম্ন আদালতে হুকুম জারি করা, নিষিদ্ধ করা বা নিম্ন আদালতের কাগজ-পত্র তলব করা উল্লেখযোগ্য। (লেখ সম্পর্কে বিশদ জানতে হাইকোর্ট অধ্যায় দেখুন)।

আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি বনাম আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ঃ মার্কিন সংবিধানে কোনও ব্যক্তিকে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ব্যতীত তাঁর স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সুযোগ পান। এই অধিকার সমূহ সংকোচন করে কোনও আইন তৈরি হলে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করতে পারেন, শুধুমাত্র বেআইনী বলে নয়, অযৌক্তিক বলেও। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট কোনও আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করার সময় মূল বিষয় অর্থাৎ আইন তার নিজের পরিধির মধ্যে আছে কি না তা বিচার করেন। এর যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

একটি নির্দিষ্ট মামলায় নির্দিষ্ট আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন। সুপ্রিম কোর্ট সাধারণভাবে কোনও বিষয়ের ওপর অভিমত দেন না। একজন অত্যাচারিত ব্যক্তি, যাঁর অধিকার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যে আইনের দ্বারা, তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। কোনও আইনের

জন্য তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে অথবা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এ কথা তাঁকে প্রমাণ করতে হয়।

জনস্বার্থে মামলা ঃ বিচারক-বদলি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাত সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন, 226 অনুচ্ছেদে একজন নাগরিক সরাসরি যুক্ত না হয়েও জনস্বার্থে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন, এমন কি মৌলিক অধিকার আক্রান্ত হলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারেন। দারিদ্র্য, অসহায়তা, অক্ষমতা বা সামাজিক ও আর্থিক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য যদি কেউ আদালতে যেতে না পারেন তবে তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কেউ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে একটি চিঠির মাধ্যমেই আদালতে আবেদন করা যায় (*এস. পি. গুপ্তা বনাম ভারতের রাষ্ট্রপতি*, AIR 1982 SC 149)। এই রায়ের পরে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পরোপকারী ব্যক্তির পক্ষে জনস্বার্থে বিচার বিভাগীয় সাহায্য পাওয়া সহজ হয়েছে। *বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত সরকার* মামলায় (AIR 1984 SC 803) দাস শ্রমিকদের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এমন একটি সংগঠন, সুপ্রিম কোর্টকে চিঠি দিয়ে জানায় যে হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলার পাথর-খাদে বিভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে তারা দেখেছে, এই সমস্ত খাদে শ্রমিকদের "অমানবিক ও অসহনীয়" পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় এবং এদের মধ্যে অনেকেই দাস-শ্রমিক। শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্দশা ও অসহায়তার প্রতিকার করার জন্য ঐ সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের কাছে লেখ (রিট) জারির আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্ট ঐ চিঠিকে লেখ-আবেদন বলে গণ্য করেন এবং ঐ অঞ্চলে সরেজমিন তদন্ত করে সমস্ত বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন পেশ করার জন্য দুজন ব্যবহারজীবীকে নিয়োগ করেন।

লক্ষীকান্ত পাণ্ডে বনাম ভারত সরকার মামলায় একটি চিঠির ভিত্তিতে লেখ-আবেদন গৃহীত হয়। ভারতীয় শিশুদের বিদেশি পিতা-মাতার হাতে দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যে সমস্ত দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তার উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয় যে, দত্তক দেওয়ার নাম করে শিশুদের দূর দেশে পাঠানো হয়, ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে। শিশুদের ঠেলে দেওয়া হয় বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে, তাদের আশ্রয় ও ভবিষ্যৎ থাকে অনিশ্চিত। প্রধান বিচারপতি পি. এন. ভগবতী শিশুদের মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু নিয়ম ও রীতি নির্ধারণ করে দেন। সরকারও এ বিষয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন সংস্থাকে এই নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেয় (AIR 1987 SCC 667)।

সাংবিধানিকতার পক্ষে অনুমান ঃ এই অনুমান সর্বদাই সাংবিধানিকতার পক্ষে যায়।

কোনও আইনের বৈধতার প্রশ্নে সব কিছু প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় আবেদনকারীর উপর।

পৃথকীকরণ তত্ত্ব : কোনও আইন সম্পর্কে মতামত দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ আইনটি অথবা তার অংশবিশেষ অসাংবিধানিক কি না সে সম্পর্কে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যদি অবস্থা তেমন দাবি করে তাহলে আদালত কোনও আইনের অংশবিশেষকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন।

প্রগতিশীল ব্যাখ্যার তত্ত্ব : সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট সর্বদা প্রগতিশীল ভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট সব সময় পরিবর্তিত সামাজিক ও আইনী পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানকে বিচার করেন।

কোনও আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার প্রভাব : সংবিধনের 141 অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট কোনও আইন জারি করলে তা সারা ভারতে প্রযোজ্য হয়। তেমনই সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও আইনকে অবৈধ ঘোষণা করলে তা ভারতের সমস্ত আদালেতে প্রযোজ্য। এই আইনটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে এবং পরবর্তী কার্যবিবরণীতে এর কোনও উল্লেখ থাকবে না। (*স্টার কোম্পানি বনাম ভারত সরকার* AIR 1987 SC 179; *গৌর বনাম ঠাকুর* AIR 1986 SC 1440)।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : প্রতিনিধিত্বকারী গণতন্ত্রে নাগরিকদের অধিকারের প্রশ্নে ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তির অধিকারকে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করে এই নিরাপত্তা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে এবং শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে, সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ গৃহীত হয়েছে — সেখানে স্বাধীন ও সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ প্রয়োজন। গণতন্ত্র রক্ষা এবং নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাই কার্যকর ভাবে ব্যক্তির অধিকারকে মর্যাদা দিতে পারেন, গণতন্ত্রকে দৃঢ় করতে পারেন। ভারতে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সংবিধানে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন : বিচারপতিদের নিয়োগ ও অপসারণ, চাকরির স্থায়িত্ব, বেতন ও চাকরির শর্তাবলী ইত্যাদি। তাছাড়া বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত ব্যয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়, ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হয়। প্রয়োজনীয় নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা, অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের অন্য আদালতে কাজ করতে না পারা, অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা প্রভৃতিও বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার কয়েকটি পদক্ষেপ।

হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ

সংবিধান প্রত্যেক রাজ্যের একটি ধর্মাধিকরণ-এর কথা বলেছে। সংসদ অবশ্য আইন করে দুই বা ততোধিক রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি ধর্মাধিকরণের ব্যবস্থা করতে পারে (214 ও 231 অনুচ্ছেদ)।

সুপ্রিম কোর্টের মতো হাইকোর্টগুলিও মূল এবং আপিল আদালত রূপে কাজ করে। আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার অধিকার সহ সমস্ত ক্ষমতাই মহাধর্মাধিকরণের আছে (215 অনুচ্ছেদ)। রাজ্যপাল ও ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় তিনি প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও কথা বলেন। *এস. পি. গুপ্তা বনাম কেন্দ্র* মামলায় বলা হয় পরামর্শ করার সময় তিনজনকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত (AIR 1982 SC 149)। হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হতে গেলে একজনকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, বিচার বিভাগীয় পদে দশ বছরের অভিজ্ঞতা বা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে দশ বছর কাজ করতে হবে। নিযুক্ত হয়ে প্রত্যেক বিচারপতিকে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয়। 62 বছর বয়স পর্যন্ত একজন হাইকোর্টে বিচারপতি রূপে কাজ করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে যেমন ভাবে অপসারণ করা হয় হাইকোর্টের বিচারপতির ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। তাছাড়া হাইকোর্টের মর্যাদার জন্য হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারকগণ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কোনও আদালতে সওয়াল করতে পারেন না। সংসদ সময় সময় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা ঠিক করে অথবা দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত হারে বিচারপতিদের বেতন দেওয়া হয়। বর্তমানে হাইকোর্ট বিচারকদের চাকরির শর্ত আইন অনুযায়ী হাইকোর্টের বিচারপতিগণ মাসে 8,000 টাকা এবং প্রধান বিচারপতি 9,000 টাকা বেতন পান। তাছাড়া বিচারপতিগণ বিনামূল্যে বাসস্থান সহ বিভিন্ন ভাতা পান।

ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের বদলি করতে পারেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট অভিমত দিয়েছেন, একজন বিচারপতির সম্মতি ব্যতীত তাঁকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না (*কেন্দ্র বনাম সংকল চাঁদ* AIR 1977 SC 2328)। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া প্রযোজন বোধ করলে রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক দু'বছরের জন্য হাইকোর্টে অতিরিক্ত এবং অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ করতে পারেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন। (সংবিধানের 215, 217-224 (ক) অনুচ্ছেদ)।

প্রত্যেক হাইকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপতি যেমন মনে করবেন ততজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে (216 অনুচ্ছেদ)। হাইকোর্ট এলাকার মধ্যে যে কোনও আদালত বা ট্রাইবুনালের তত্ত্বাবধান করা হাইকোর্টের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, শুধুমাত্র সামরিক আদালত এই এক্তিয়ারের বাইরে থাকে (227 অনুচ্ছেদ)।

নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে মনে করলে মামলাটি হাইকোর্ট নিজ হাতে নিতে পারেন অথবা সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তি করে নিম্ন আদালতে মামলাটি রায় দেওয়ার জন্য ফেরত দিতে পারেন (228 অনুচ্ছেদ)।

কর্মচারীদের উপর হাইকোর্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। হাইকোর্টের বিচারপতি ও কর্মচারীদের বেতন রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন প্রধান বিচারপতি স্বয়ং অথবা তাঁর নির্দেশে অন্য কেউ। হাইকোর্টের কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী প্রধান বিচারপতি তৈরি করেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন (229 অনুচ্ছেদ)। একটি হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে কেন্দ্রশাসিত কোনও অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেওয়া যায় (230 অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে হাইকোর্ট *হেবিয়াস কর্পাস, ম্যানডামাস, প্রহিবিশন, কুও ওয়ারেন্টো ও সার্টিওরারি* লেখ-নির্দেশ (রিট) ও আদেশ জারি করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য ঐসব লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারেন। অথচ 226 অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ছাড়াও যে কোনও উদ্দেশ্যে ঐসব লেখ নির্দেশ জারি করতে পারেন। হাইকোর্ট যে কোনও বেআইনী নির্দেশ বাতিল করতে পারেন, কোনও আইন বা অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারেন, বেআইনীভাবে চাপানো কর ফেরৎ দিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের তৈরি কোনও আইন যেমন ভারতেব যে কোনও আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই হাইকোর্ট ঘোষিত কোনও আইন সেই রাজ্য বা হাইকোর্টের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত নিম্ন আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (*উড়িষ্যা বনাম মদনগোপাল* (1952) SCR 28; *রম্বাদ্রাইয়া বনাম সচিব* AIR 1981 SC 1653; *দেশাই বনাম রোশন* AIR 1976 SC 578; *ভাইলাল বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার* AIR 1964 SC 1006)।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়া ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে লেখ-নির্দেশ জারি করা স্বাভাবিক নয় এবং এমন আশা করা উচিত নয়। এটি ক্ষতিপূরণের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি এবং বিশেষ ক্ষেত্রেই কোর্টের নির্দেশে এই প্রতিকার পাওয়া যায় (*হিম্মতলাল শা বনাম উঃ প্রঃ সরকার* AIR 1954 SC 403; *আব্রাহাম বনাম আই টি ও* AIR 1961 SC 609; *ভূপাল চিনি শিল্প বনাম আই টি ও* AIR 1967 SC 549; *করমচাঁদ বনাম রাজস্থান সরকার* AIR 1965 SC 913)।

কোনও প্রকার শাস্তি ব্যতিরেকে কারও অধিকার খর্ব করা হলে, মামলার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে না গিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের হাতে লেখ বা রিট জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই লেখ 5 রকমের হয়।

'হেবিয়াস কর্পাস'-এর অর্থ *বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ*। কোনও ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে আটক করা হলে এই আইন প্রয়োগ করা হয়। এই লেখ জারি করার অর্থ গ্রেপ্তারকারী কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ দেওয়া যাতে বন্দীকে আদালতের সামনে হাজির করার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। যদি এই গ্রেপ্তার বেআইনী বলে প্রতিভাত হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। 44তম সংবিধান সংশোধনের পর জরুরী অবস্থার সময়েও 21 অনুচ্ছেদ মুলতুবি রাখা যায় না। নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য এই লেখ গুরুত্বপূর্ণ।

সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকার খর্ব করার জন্য *বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ* লেখ জারি করতে পারেন একমাত্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু হাইকোর্ট এই লেখ বেসরকারি ব্যক্তিদের উপর জারি করতে পারেন অন্যায় ভাবে আটক রাখার জন্য।

আইনসম্মতভাবে কাজ করা এবং বেআইনী কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য উচ্চ-আদালত নিম্ন-আদালতসমূহকে যে নির্দেশ দেন তাকে 'ম্যানডামাস' বলে। 'ক'-এর আইনি অধিকার 'খ'-এর আইনি দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত । সেক্ষেত্রে 'ক' ম্যানডামাস প্রার্থনা করতে পারে যাতে 'খ' তার কর্তব্য 'সম্পাদন করে সেজন্য। যে কোনও সংস্থা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সরকারি এমন কি বিচার বিভাগীয় কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যানডামাস প্রার্থনা করা যায়। সরকারি কোনও আইনের জন্য কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার খর্ব হলে সুপ্রিম কোর্ট ম্যানডামাস জারি করতে পারেন। হাইকোর্ট এই লেখ জারি করতে পারেন কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে তাঁর সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালন করার জন্য, কোনও নাগরিককে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার জন্য, এবং অসাংবিধানিক আইন না করতে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করার জন্য।

উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত বা ট্রাইবুনালে প্রহিবিশন জারি করা যায়। নিম্ন আদালতসমূহ যাতে নিজেদের এক্তিয়ারের বাইরে না যায় সেজন্য এই আদেশ জারি করা হয়, কোনও প্রশাসনিক সংস্থার বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি করা হয় না শুধুমাত্র বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় সংস্থার ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য।

সার্টিওরারি শুধুমাত্র বিচার বিভাগ বা আধা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কোনও ট্রাইবুনাল বা নিম্ন আদালত নিজ এক্তিয়ারের বাইরে চলে যায় বা কোনও বেআইনী আদেশ জারি করে, তখন উচ্চতর আদালত সেই আদেশ খারিজ করে সমস্ত কাগজপত্র উচ্চ আদালতে বিচারার্থে তলব করতে পারে।

কৃও ওয়ারান্টো প্রশ্ন তোলে কোন অধিকারে বা কোন ক্ষমতাবলে। কোনও ব্যক্তি সরকারি পদে আসীন থাকবার দাবি পেশ করলে জনস্বার্থে এই লেখ জারি করা যায়। যে কোনও ব্যক্তি এমন লেখ জারির আবেদন করতে পারেন, যদি আলোচ্য পদটি স্থায়ী সরকারি পদ এবং সংবিধান স্বীকৃত হয় এবং সেই পদে নিয়োগটি যদি সংবিধান বা দেশের আইনের বিরুদ্ধাচরণ না করে।

266 অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্ট লেখ জারি ছাড়াও ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারেন (*টি. সি. বাসাপ্পা বনাম নাগাপ্পা* AIR 1954 SC 440)। (জনস্বার্থে মামলা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন)।

অধস্তন আদালতসমূহ

রাজ্যপাল হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে জেলা জজ নিয়োগ করেন। কোনও ভারতীয় নাগরিক, যিনি অন্তত 7 বছর আইনজীবী হিসাবে কাজ করেছেন এবং অন্য কোনও সরকারি পদে যুক্ত নেই, তিনিই জেলা জজ হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য (233 অনুচ্ছেদ)।

বিংশতিতম সংবিধান সংশোধনীর ফলে 233A অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। এর ফলে বেশ কিছু জেলা জজের নিয়োগ এবং তাঁদের প্রদত্ত রায় সিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। উপযুক্ত আইনানুসারে, জেলা জজ ব্যতীত রাজ্যে বিচার বিভাগের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। এইসব ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালকে, রাজ্য লোকসেবা আয়োগ ছাড়া হাইকোর্টের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হয়। (234 অনুচ্ছেদ)।

জেলা জজের আদালত সহ অন্যান্য নিম্ন আদালতের উপর হাইকোর্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। হাইকোর্টের বিচারপতির অধস্তন যে কোনও বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর প্রভৃতি হাইকোর্টের এক্তিয়ারে পড়ে। (235 অনুচ্ছেদ) (*তেজপাল বনাম ইউ. পি. রাজ্য* (1985) 3 SCC 604; *রঙ্গ মহম্মদ বনাম আসাম রাজ্য* AIR 1967 SC 903) 236 অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যামূলক বলা যায়, যেখানে জেলা জজ, বিচার বিভাগীয় কাজ প্রভৃতির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চোদ্দ

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

অংশ VI, অনুচ্ছেদ 152-213 ঃ অংশ VIII, অনুচ্ছেদ 239-240

ভারতের সংবিধান শুধুমাত্র কেন্দ্রের জন্য নয়, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কার্যত ভারতের সংবিধানের মধ্যে বহু রাজ্যের সংবিধান অন্তর্নিহিত আছে এবং কয়েকটি রাজ্যের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। সাধারণভাবে বলা যায় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রধানসহ সংসদীয় ব্যবস্থার সরকার আইনসভার কাছে মন্ত্রিপরিষদের দায়বদ্ধতা প্রভৃতি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রশাসনিক প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। "রাজ্যপালের সন্তুষ্টি'র অর্থ মন্ত্রিসভার সন্তুষ্টি (*আর জে কাপুর বনাম পাঞ্জাব* AIR 1955 SC 549; *শ্যামসের সিং বনাম পাঞ্জাব* AIR 1974 SC 2193)।

ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জম্মু ও কাশ্মীর একমাত্র এমন রাজ্য যার নিজস্ব আলাদা সংবিধান আছে। এছাড়াও বেশ কিছু রাজ্য বিশেষ মর্যাদা পায়। এসব রাজ্যের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য এ রকম বিশেষ কিছু ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য (371 অনুচ্ছেদ), নাগাল্যান্ড (371A অনুচ্ছেদ), আসাম (371B), মনিপুর (371C), অন্ধ্র প্রদেশ (371D ও E), সিকিম (371F), মিজোরাম (371G), অরুণাচল প্রদেশ (371H) এবং গোয়া (371 I)।

রাজ্যের শাসন বিভাগ

রাজ্যপালের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী ঃ 153 অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকেন। অনেক সময় একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক রাজ্যের

রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন (155 অনুচ্ছেদ)। সাধারণভাবে পাঁচ বছরের জন্য একজন রাজ্যপাল মনোনীত হন এবং তাঁর চাকরিতে বহাল থাকা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে (156)। তবে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিচারযোগ্য নয়। রাজ্যপালের চাকরির স্থায়িত্ব নেই, তিনি যে কোনও সময় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন (*সূর্যনারায়ণ বনাম কেন্দ্র* AIR 1982 Raj)।

ভারতের নাগরিক এবং 35 বছর বয়স না হলে রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হওয়া যায় না (157 অনুচ্ছেদ)। তাছাড়া রাজ্যপাল সংসদ বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য হতে পারেন না। কোনও সাংসদ বা বিধায়ক রাজ্যপাল নিযুক্ত হলে শপথ নেওয়ার দিন থেকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। রাজ্যপাল অন্য কোনও লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পরেন না। রাজ্যপালগণ বিনামূল্যে সরকারি বাসস্থান সহ বেতন ভাতা ইত্যাদি পান। সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন বা সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী রাজ্যপালদের বেতন, ভাতা নির্ধারিত হয়। 1987 সালে সংসদে গৃহীত আইন অনুযায়ী একজন রাজ্যপাল মাসিক 11000 বেতন পান। *হরগোবিন্দ বনাম রঘুকুল* (AIR 1979 SC 1109) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন রাজ্যপালের পদ কোনও লাভজনক পদ নয়।

প্রত্যেক রাজ্যপালকে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন এবং সংবিধান ও আইনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয় (159 অনুচ্ছেদ)।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সাহায্য অনুসারে কাজ করেন (163 অনুচ্ছেদ)।

যদিও প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যের রাজ্যপাল দুজনেই সাংবিধানিক প্রধান মাত্র, তথাপি পদ দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান। যেমন (i) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন আর রাজ্যপাল মনোনীত হন; (ii) নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতিকে সরাতে হয় কিন্তু রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ওপর রাজ্যপালের অপসারণ নির্ভর করে। (iii) রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য, কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে 163 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও কোনও বিষয়ে রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সে ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। 42তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের 74 অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি "পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন" সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু 163 অনুচ্ছেদে সে রকম কোনও সংশোধনী আনা হয়নি। এ কথা বলা হয় যে সাধারণভাবে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার পরামর্শ ব্যতীত কোনও কাজ করতে পারেন না। (*সঞ্জীবি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1970 SC 1102; *ইউ পি সার্ভিস কমিশন বনাম সুরেশ* (AIR 1987 SC 1953), সুনীত কুমার বনাম পঃ বঙ্গ (AIR 1950 Cal 274)।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী চলতে হয়। যেমন (ক) এককভাবে কোনও দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না বা কোনও ব্যক্তি অধিকাংশের

সমর্থন জোগাড় করতে পারে না সেই রকম অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ, (খ) অধিকাংশের সমর্থন হারিয়ে অথবা সভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে তাকে বরখাস্ত করার সময়, (গ) গরিষ্ঠের আস্থা হারিয়ে যদি কোনও মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা বাতিল করার কথা বলেন সেই ধরণের ক্ষেত্রে, (ঘ) ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী আসামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে খনিজ লাইসেন্সের রয়্যালটি নির্ধারণ, (ঙ) রাজ্যে সাংবিধানিক শাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট করা ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা, (চ) বিলসমূহে সম্মতি দেওয়ার সময়। কোনও কোনও রাজ্যপালকে 371 থেকে 371(9) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর মনোনীত কর্মচারীদের মাধ্যমে সেই কাজ করেন (154 অনুচ্ছেদ)। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মতো সমবিস্তৃত। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল অথবা প্রচলিত আইনের ওপর নির্ভরশীল (246 ও 162 অনুচ্ছেদ; মধ্য প্রদেশ বনাম জৈন AIR 1981 SC 2045)।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং নিম্ন আদালতের বিচারকদের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন (165, 316, 284, 283)।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর পরামর্শ মতো মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। রাজ্যপালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে মন্ত্রীরা নিজ নিজ পদে আসীন থাকেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। বাস্তবে এর অর্থ বিধানসভায় গরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয় এবং মন্ত্রিসভা যতক্ষণ অধিকাংশের সমর্থন পান ততক্ষণ ঐ পদে থাকেন। (164 অনুচ্ছেদ)

সমস্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের নামে গ্রহণ করা হয়। কাজের সুবিধা ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করার জন্য প্রয়োজন হলে রাজ্যপাল নিয়ম তৈরি করতে পারেন। রাজ্যপালের নামে ঘোষিত এবং স্বাক্ষরিত না হলে, মন্ত্রিসভার কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে না (166 অনুচ্ছেদ, *কেরালা রাজ্য বনাম লক্ষ্মীকুটী,* AIR 1987 SC 331 ; *বি এল কটন বনাম পঃ বঙ্গ* AIR 1967 SC 1145)।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ যে সব রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেই সব রাজ্যে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ সদস্যকে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সমবায় আন্দোলনের পারদর্শীদের মধ্যে থেকে রাজ্যপাল মনোনীত করেন (17(3) (e) ও (5) অনুচ্ছেদ) তাছাড়া রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়

যথেচ্ছভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়নি, তাহলে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে একজনকে বিধানসভায় মনোনীত করেন (333 অনুচ্ছেদ)।

168 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হন। তিনি রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। প্রয়োজনে তিনি রাজ্য বিধানসভা ভেঙেও দিতে পারেন (174 অনুচ্ছেদ)। তিনি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে বা নির্দেশ পাঠাতে পারেন (175-176 অনুচ্ছেদ) বিধানমণ্ডলীতে গৃহীত হলেও রাজ্যপালের সম্মতি না পাওয়া গেলে কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না (200 অনুচ্ছেদ)।

বিধানসভা এবং বিধানপরিষদে (যদি থাকে) একটি বিল গৃহীত হওয়ার পর মন্ত্রিমণ্ডলীর সুপারিশসহ সম্মতির জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়। রাজ্যপাল (i) বিলে তাঁর সম্মতি দিতে পারেন, (ii) অসম্মতি প্রকাশ করতে পারেন, (iii) রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটি সংরক্ষণ করতে পারেন, (iv) অর্থ বিল ব্যতীত যে কোনও বিল পুনর্বিবেচনার জন্য সত্বর ফেরত পাঠাতে পারেন (200 অনুচ্ছেদ)। এছাড়া আর একটি সম্ভাবনা আছে—কিছু তথ্য এবং ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে রাজ্যপাল বিলটি সরকারের কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন, যার অর্থ বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভার কাছে সুপারিশ করা বোঝায় (167 অনুচ্ছেদ)।

কিছু মন্তব্যসহ যে সমস্ত বিল রাজ্যপাল ফেরত পাঠান মন্ত্রিসভা সেই বিল পুনর্বিবেচনার পর সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত বিলটি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠালে তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য। একমাত্র যখন বিলটি সরকারের কাছে ফেরত পাঠানো হয় সেই সময় ছাড়া, অন্য সব ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছেন বলা হয়।

রাজ্য আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন রাজ্যপাল 213 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যে অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। 123 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা আছে, রাজ্যপালের এই ক্ষমতা তারই পরিপূরক। আইনসভা প্রণীত আইনের মতোই এগুলি কার্যকর হয়। এমন কি বিধানসভায় গৃহীত আইনের মতো এগুলি সীমাবদ্ধ। সেজন্য তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ছাড়া রাজ্যপাল অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন না—যথা (i) যে সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি ছাড়া রাজ্য বিধানমণ্ডলী বিল উত্থাপন করতে পারে না, (ii) যে সব বিষয়ে গৃহীত বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রেখেছেন, (iii) যে সব বিষয়ে প্রণীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হতে পারে না।

রাজ্যপালের জারি করা প্রতিটি অধ্যাদেশ বিধানসভায় (দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকলে উভয় কক্ষে) পেশ করতে হয়। আইনসভার অধিবেশন হওয়ার পর ছ'সপ্তাহ

অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকতে পারে। অবশ্য বিধানসভা এর মধ্যে অর্ডিন্যান্স অনুমোদন না করে প্রস্তাব নিলে সঙ্গে সঙ্গে তা বাতিল হয়ে যায়। আবার রাজ্যপাল যে কোনও সময়ে অধ্যাদেশ তুলে নিতে পারেন (213 অনুচ্ছেদ)। রাজ্যপালের অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার অপব্যবহারের জঘণ্য দৃষ্টান্তটি *ডি সি ওয়াধাওয়া বনাম বিহার সরকার* মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। 1967 থেকে 1981 সাল অবধি বিহারের রাজ্যপাল 256 বার অধ্যাদেশ জারি করেছেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তে বারবার একই অধ্যাদেশ জারি করে সেগুলিকে চালু রাখা হয়েছিল। আদালতের মতে এই ব্যবস্থা "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ধ্বংসের কারণ" এবং "সংবিধানের ওপর জালিয়াতি"। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মিতব্যয়ীর মতো এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একে বিপথগামী হতে দেওয়া যায় না।"

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ঃ 202 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উত্থাপনের ব্যবস্থা করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোনও অর্থ বিল উত্থাপন করা যায় না বা ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করা যায় না। এমন কি কোনও সংশোধনী আনতে গেলেও রাজ্যপালের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা ঃ রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা বিষয়ে প্রণীত কোনও আইন ভঙ্গের জন্য সাজা-প্রাপ্ত অপরাধীর দণ্ড হ্রাস করার, স্থগিত রাখার, এমন কি ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা আছে রাজ্যপালের। *কে এম নানাবতী বনাম বোম্বাই রাজ্য* (AIR 1961 SC 99) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেন, একজন অপরাধীকে রাজ্যপাল যে কোনও সময় এমন কি সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ঝুলে রয়েছে তখনও ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল সুপ্রিম কোর্টে বিচার চলাকালীন তাঁর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের তৈরি নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যেই রাজ্যপালের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

রাজ্যের আইনসভা

রাজ্যের আইনসভা রাজ্যপাল এবং রাজ্য বিধানসভাকে নিয়ে গঠিত। অবশ্য যে সব রাজ্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে সেখানে রাজ্যপাল, বিধানসভা ও বিধান পরিষদ নিয়েই রাজ্যের আইনসভা গঠিত হয়। বর্তমানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কর্নাটক রাজ্যে বিধান পরিষদও আছে (168 অনুচ্ছেদ), বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া বা বিধান পরিষদ স্থাপন করার সুপারিশ রাজ্য বিধানসভা সংসদের কাছে করতে পারে (169 অনুচ্ছেদ)।

বিধানসভা কমপক্ষে 60 জন এবং অনধিক 500 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। ভৌগোলিক নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এঁরা বিধানসভায়

আসেন। বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন 40 এবং কোনও অবস্থাতেই বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। বিধান পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ পৌরসভা, জেলা বোর্ড ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা; এক দ্বাদশাংশ অন্তত তিন বছর পূর্বে যাঁরা স্নাতক হয়েছেন তাঁদের দ্বারা; এক দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের দ্বারা; এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। বিধান পরিষদের নির্বাচন একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় (170-171 অনুচ্ছেদ)। সাধারণভাবে বিধানসভার মেয়াদ 5 বছর। বিধান পরিষদ স্থায়ী কক্ষ, তাই বিধান পরিষদকে কখনও ভেঙে দেওয়া যায় না, কিন্তু মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দু'বছর অন্তর অবসর নেন। (172 অনুচ্ছেদ)।

রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে গেলে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে এবং মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার দিন বিধানসভার ক্ষেত্রে 25 বছর এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে 30 বছর বয়স হওয়া চাই (*হুসেন বনাম নাগালিঙ্গাপ্পা,* AIR1969 SC1034)। রাজ্য তালিকাভুক্ত সমস্ত বিষয়ে বিধানমণ্ডলীর আইন করার পরিপূর্ণ অধিকার আছে এবং তৃতীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে যৌথ অধিকার আছে (245-246 অনুচ্ছেদ) [কেন্দ্রবাজ্য সম্পর্ক অধ্যায় দেখুন]।

রাজ্যে বিধানপরিষদের অবস্থান কেন্দ্রের রাজ্যসভার মতো। আইনসভার সুযোগ-সুবিধা, ছাড়, সদস্যদের অযোগ্যতা, দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক, আইনগত পদ্ধতি, অর্থ বিল-এর উৎস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। বিধানসভায় একজন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকেন, যেমনটি আছে লোকসভায়। বিধান পরিষদে সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। (178-187 অনুচ্ছেদ) (কেন্দ্রীয় আইনসভা অধ্যায় দেখুন)।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

যে সমস্ত অঞ্চলে কেন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে সেই সব অঞ্চলকে 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল' বলে। বর্তমানে সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। দিল্লি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরি ও চণ্ডীগড় তফসিল। পূর্বে দিল্লিতে মেট্রোপলিটন কাউন্সিল ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলর ছিলেন। বর্তমানে দিল্লীকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (ন্যাশনাল ক্যাপিট্যাল টেরিটরি) বলা হয়—যেখানে একটি বিধানসভা ও মন্ত্রী পরিষদ আছে (239AA ও 239AB অনুচ্ছেদ)।

সংসদে গৃহীত আইনের সাহায্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি এই সমস্ত অঞ্চলের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে

শাসনকাজ পরিচালনা করেন। প্রশাসককে সাধারণভাবে লেফটান্যান্ট গভর্নর বলা হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপালকেও প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন। একজন রাজ্যপাল সেক্ষেত্রে রাজ্য-মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন (239 অনুচ্ছেদ)। সংসদ যে কোনও অঞ্চলের জন্য আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে আইন পাশ করাতে পারে।

কেন্দ্রশাসিত পণ্ডিচেরি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লিতে এই রকম আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ আছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আইনসভার পরিবর্তে মনোনীত পর্ষৎ আছে (239A অনুচ্ছেদ)। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের রাজ্যের রাজ্যপালদের মতোই অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা আছে (239B অনুচ্ছেদ)। যেখানে আইনসভা আছে সেই অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য রাষ্ট্রপতির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে (239A-240 অনুচ্ছেদ)। সংসদ যে কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য আইন করে হাইকোর্ট গঠন করতে বা অন্য কোনও আদালতকে হাইকোর্ট বলে ঘোষণা করতে পারে।

পনেরো

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

অংশ - XI, অনুচ্ছেদ 245-263

আমাদের সংবিধানের 1 অনুচ্ছেদে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন' বলা হয়েছে। ভারতে ইংরেজ শাসন ছিল এক-কেন্দ্রিক। ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে রাখার জন্য ইংরেজরা কঠোরভাবে কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ইংরেজদের খুবই প্রয়োজন ছিল। 1833 সালের সনদ আইন চরমভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের হাত থেকে সমস্ত আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গভর্নর-জেনারেল-পরিষদের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই আইন গভর্নর-জেনারেল-কাউন্সিলের হাতে সমগ্র ভারতের অসামরিক ও সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধান নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়।

ভারত শাসন আইন, 1919 অবশ্য বেশ কিছু ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে হস্তান্তর করে। সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত যৌথ কমিটি 1934 সালে বলেন ঃ 1919 সালের আইনে প্রদেশগুলির হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হলেও ভারত এক-কেন্দ্রিক। গভর্নর জেনারেল-কাউনসিলের হাতে মূল সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত।

গ্রেট ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স-এ 'কমনওয়েল্‌থ অব ইণ্ডিয়া' বিলটি নিয়ে আলোচনার সময় সরকার পক্ষের মুখপত্র ম্যালকম হেইলি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করে বলেন' শেষ পর্যন্ত কোনও এক ধরণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে। রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলির সমস্যা এবং ইংরেজদের বাণিজ্যিক

স্বার্থ ব্রিটিশ প্রভুদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি জোরদার করেছিল। সাইমন কমিশন (1927-29) ও বাটলার কমিটি (1927-30) সারা ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়নের কথা ভেবেছিল।

1935 সালের ভারত শাসন আইন ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিল। একটি কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় প্রদেশগুলিকে তাদের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার সরাসরি ইংল্যান্ডের রাজার কাছ থেকে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়। এই আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় তা কখনই কার্যকর হয়নি। 1935 সালের আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অংশই কার্যকর হয়। যেহেতু প্রাদেশিক স্তরে গঠিত সরকারগুলির বেশি ক্ষমতা ছিল না, জাতীয়তাবাদীরা প্রাদেশিক স্তরে আরও ক্ষমতা দাবি করেন। এই পদ্ধতি ক্ষণস্থায়ী ছিল। যাই হোক, সমগ্র দেশ একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে 1919 আইন অনুযায়ী শাসিত হচ্ছিল।

1946 এবং 1947 সালের গোড়ার দিকে যখন গণপরিষদ সবে বসছে সে সময় কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কথা ভাবা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি কার্যকর কিছু করার আগেই 3 জুন 1947 মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার সব আশাই ব্যর্থ হল এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেল। যা আশা করা হয়েছিল তাই হল, শক্তিশালী কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি ও প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি 5 জুনের যৌথ সভায় ঠিক করে : "3 জুনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট মিশন সংবিধানের ধাঁচ" সম্পর্কে যে সীমারেখা নির্দেশ করেছিলেন তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। দেশভাগ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করার কোনও দরকার নেই। কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি 6 জুনের সভায় মোটামুটি ঠিক করেন শক্তিশালী কেন্দ্র সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করে তিনটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করা হবে।

"শক্তিশালী কেন্দ্র সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল," এই সুপারিশ করে 1947 সালের 5 জুলাই 'কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটি' গণপরিষদের সভাপতির কাছে দ্বিতীয় একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয় কেন্দ্রের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সঙ্কুচিত করে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গণপরিষদ গ্রহণ করেছিল, প্রশাসনিক অসুবিধা হবে তা জেনেও, শুধুমাত্র মুসলিম লীগকে খুশি করার জন্য। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটি সর্বসম্মতভাবে মনে করতেন, একটি দুর্বল কেন্দ্র দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। কারণ সে রকম কেন্দ্র শান্তি বজায় রাখতে পারবে না, সাধারণ স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমন্বয় সাধনে অক্ষম হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবে না। ইতিমধ্যে ছশোর কিছু বেশি

রাজন্য-শাসিত অঞ্চল প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ফলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ্ প্রদেশগুলির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে যাদের নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে খসরা কমিটি ভারতকে ইউনিয়ন ও ভারতের সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। গুরুত্ব সহকারে ভারতকে একটি ইউনিয়ন বলার অর্থ অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও চুক্তি না করে, ভারতের জনগণের আস্থাভাজন গণপরিষদের ইচ্ছাতেই, এই সিদ্ধান্তর মাধ্যমে কথা ঘোষণা করা। তাছাড়াও এমন ভাবনার আসল উদ্দেশ্য ছিল এ কথা ঘোষণা করা যে, রাজ্যগুলির কাছে অধস্তন থাকবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসন, কিন্তু বনিয়াদ সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকর ক্ষমতায় কেন্দ্রের প্রাধান্য বজায় থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট *পঃ বঙ্গ বনাম ভারত* মামলায় (AIR 1963 SC 1241) এই মতবাদকে সমর্থন করেন।

সংবিধান প্রণেতাদের এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিচার করার জন্য যে সমস্ত কমিশন এবং কমিটি তৈরি হয়েছিল, যেমন জেভিপি কমিটি, দার কমিশন, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন, রাজামান্নার কমিটি, সারকারিয়া কমিশন —এদের প্রত্যেকেরই প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ

> ভারত ইউনিয়নই আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা। রাজ্যগুলি কেন্দ্রের অঙ্গবিশেষ। আমরা মনে করি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হবে শক্তিশালী ও সুস্থ। কিন্তু দেশের সমস্ত পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হবে কেন্দ্র থেকে এবং কেন্দ্রের শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যেই নিহিত থাকবে উন্নতি ও অগ্রগতির রহস্য।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক

সংবিধানের 245 থেকে 255 অনুচ্ছেদ কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছে। সংসদ সারা ভারত বা দেশের কোনও অংশের জন্য আইন করতে পারে। রাজ্য আইনসভা সমগ্র রাজ্য বা তার অন্তর্গত কোনও অংশের জন্য আইন তৈরি করতে পারে। রাজ্যের সীমার বাইরে কোনও রাজ্য আইন প্রযোজ্য নয় (*কোচুনি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য* AIR 1960 SC 1080) অবশ্য লক্ষ্য ও রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকলে ভিন্ন কথা (*বোম্বে বনাম আর. এম. ডি. সি.* AIR 1957 SC 699; *টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোং বনাম বিহার* AIR 1958 SC 452)। সংসদে গৃহীত আইন সম্পর্কে ভূখণ্ডগত প্রশ্ন তোলা যায় না (245অনুচ্ছেদ)। সপ্তম তফসিলে তিনটি তালিকার কথা বলা হয়েছে : (ক) কেন্দ্রীয় তালিকা (খ) রাজ্য তালিকা (গ) যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় 97টি, রাজ্য তালিকায় 66টি এবং যুগ্ম তালিকায় 47টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 246 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করার অধিকার সংসদের, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করতে পারে রাজ্য আইনসভা। যুগ্ম তালিকার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন করতে পারে। যুগ্ম তালিকার কোনও বিষয়ে সংসদ ও বিধানসভায় গৃহীত আইনের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে, সংসদের গৃহীত আইন কার্যকর হবে, রাজ্যের আইনের বিতর্কিত অংশ বাতিল হবে। অবশ্য কোনও রাজ্য আইন যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না (248 অনুচ্ছেদ)। কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি ও সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সংসদ সারা ভারত বা তার কোনও অংশের জন্য আইন করতে পারে (253 অনুচ্ছেদ)।

সর্বজনীন স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়, যেগুলি সম্পর্কে ভারতের সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার, সেই সমস্ত বিষয়কেই কেন্দ্রীয় তালিকায় রাখা হয়েছে। যে সমস্ত বিষয়ে স্বার্থ ও প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে সেগুলি রাজ্য তালিকাভুক্ত। আর যে সমস্ত বিষয়ে সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ আইন বাঞ্ছনীয় কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় সেগুলি যৌথ তালিকায় রাখা হয়েছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যগুলির হাতে ব্যাপকতম ক্ষমতা দেওয়া হলেও দুটি ব্যতিক্রম আছে। 249 অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতায় এমন প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে সংসদের আইন করা দরকার। সেক্ষেত্রে সংসদ তা করতে পারে সমগ্র ভারতের জন্য, বা কোনও বিশেষ অঞ্চলের জন্য। এ ধরনের প্রস্তাবের মেয়াদ সাধারণত এক বছর, তবে নতুন প্রস্তাব এনে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানো যায়। বছর শেষ হওয়ার 6 মাস পরে গৃহীত আইন বাতিল বলে গণ্য হয়।

পুনরায় 250 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে সংসদ সমগ্র ভারতের জন্য বা ভারতের কোনও অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করতে পারে। এমন আইন জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পরেও 6 মাস বলবৎ থাকতে পারে।

249 ও 250 অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনও আইনের সঙ্গে রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত আইনের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে সংসদে গৃহীত আইন বলবৎ থাকবে এবং বিধানসভায় গৃহীত আইনের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে সংসদে গৃহীত আইন বলবৎ থাকবে এবং বিধানসভায় গৃহীত আইন অকার্যকর হবে (251 অনুচ্ছেদ)।

252 অনুচ্ছেদ অনুসারে দুই বা ততোধিক অঙ্গরাজ্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করার জন্য সংসদকে অনুরোধ করলে সংসদ উক্ত বিষয়ে আইন করতে পারে। তেমন আইন অন্য অঙ্গরাজ্যেও প্রযোজ্য হতে পারে যদি সেই রাজ্যের আইনসভা এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রশাসনিক সম্পর্ক

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় সংবিধানের 256 থেকে 265 অনুচ্ছেদ অনুসারে। সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের প্রশাসনিক সম্পর্ক অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ থাকে। ভারতের সংবিধান দুই প্রান্তের মধ্যে সহজ কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রের আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা সংবিধান রেখেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকারকে শাসন-কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে।

এইভাবে 257 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অঙ্গরাজ্যগুলিকে এমনভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। তাছাড়া রেলপথ সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, জাতীয় ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্র প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ কার্যকর করার জন্য রাজ্যগুলির যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তা কোষাগার থেকে রাজ্যগুলিকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। 261 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে কেন্দ্র বা রাজ্য কর্তৃক গৃহীত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। এর ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অনেক সহজ হয়েছে। আন্তঃরাজ্য নদীগুলির উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃরাজ্য জল বিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারার প্রয়োগে বিরোধ মীমাংসা করার ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য এবং রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা অনেক কমে গিয়েছে (262 অনুচ্ছেদ)। আসলে সংবিধান প্রণেতারা কোনও কিছুই ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেননি, সেজন্য আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করেন। সংবিধানের 263 অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি সাধন, রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ও মতপার্থক্য নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা এই পরিষদের কাজ।

258 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর বিশেষ কতকগুলি কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিতে পারেন। অনুরূপভাবে 258A অনুচ্ছেদে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে ঐ রাজ্যের কর্মচারীদের বর্ধিত দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের প্রশ্নে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর

মধ্যেও কেন্দ্রিকতার প্রবণতা দেখা যায়। আর্থিক ভাবে কেন্দ্র অনেক ক্ষমতাবান। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির নিরিখে কেন্দ্রের এই ক্ষমতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাই হোক, রাজ্যগুলির নিজস্ব সম্পদ আছে। কেন্দ্রও করের অংশ এবং অনুদান হিসাবে বেশ কিছু অর্থ দেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন করা হয় — কোন্ ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে অনুদান দেওয়া হবে বা রাজস্বের কত অংশ রাজ্যগুলি পাবে, তা নির্ধারণ করার জন্য। এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে আর্থিক প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে সাহায্য করে। (আর্থিক ধারাগুলি সম্পর্কে বিশদ জানতে 16 পরিচ্ছেদ দেখুন)।

ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'কেন্দ্র ও রাজ্য' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। সংবিধানে 'কেন্দ্র' শব্দের উল্লেখ নেই, বস্তুত 'কেন্দ্রীয় সরকার', 'কেন্দ্রীয় আইনসভা', 'কেন্দ্রীয় আইন' প্রভৃতি শব্দগুলি কেন্দ্রীভূত ঔপনিবেশিক শাসনের দুঃখজনক পরিণাম। 'কেন্দ্র' ও 'ইউনিয়ন' শব্দ দুটি ভিন্নমুখী ভাবনাকে প্রকাশ করে। বৃত্তের মধ্যবর্তী একটি বিন্দুকে বলে কেন্দ্র আর পরিপূর্ণ বৃত্তটি হল ইউনিয়ন। ইউনিয়ন ও রাজ্যের সম্পর্ক হল সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক; ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ও তার পরিমণ্ডলের সম্পর্ক নয়।

ষোল

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য ইত্যাদি

অংশ V, অধ্যায় 5 এবং অংশ XII ও XIII,

অনুচ্ছেদ 148 - 151 এবং 264 - 307

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া

সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ প্রশাসনের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক শর্তই হল একটি নিরপেক্ষ হিসাব পরীক্ষক সংস্থা। সংবিধান একজন ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষকের (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) কথা উল্লেখ করেছে। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই পদকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে সরকার সহজে অপসারণ করতে পারেন না। অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংসদের উভয় সভার মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে, অপসারণের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। যেমনটি হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে — সংবিধানের 124 (4) অনুচ্ছেদ অনুসারে। তাছাড়া তিনি ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের অন্য কোনও পদে যোগ দিতে পারেন না। তাঁর বেতন, ভাতা ইত্যাদি সংসদে আইন করে স্থির করা হয়। ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষক (দায়িত্ব, কর্তব্য ও চাকুরির

শর্তাবলী) আইন 1971-এর সংশোধনী এই বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সমান বেতন ভাতা পান। রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে হিসাব পরীক্ষা বিভাগে কর্মরতদের চাকুরির শর্তাবলী ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেন। মহা হিসাব পরীক্ষকের অফিসের প্রশাসনিক ব্যয় ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয় (148 অনুচ্ছেদ)।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহের ব্যয়ের হিসাব কেমন ভাবে রাখা হবে, সে সম্পর্কে মহা হিসাব পরীক্ষকের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেন। সংবিধানের 149 ও 150 অনুচ্ছেদ অনুসারে, কেন্দ্র ও রাজ্যের হিসাব নিকাশের নিয়ন্ত্রণ এবং মহা হিসাব পরীক্ষকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকে। অবশ্য 151 অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রের ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব মহা হিসাব পরীক্ষক রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষে তা পাঠিয়ে দেবেন। একই ভাবে রাজ্যগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনি রাজ্যপালদের কাছে পেশ করবেন এবং রাজ্যপালগণ রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে আলোচনার জন্য তা প্রেরণ করবেন।

অর্থ, সম্পত্তি চুক্তি ও মামলা

265 অনুচ্ছেদ "বিনা প্রতিনিধিত্বে কোনও কর নয়" এই নীতিকেই তুলে ধরেছে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে আইনের অনুশাসন ব্যতীত কোনও কর নয়।

সঞ্চিত তহবিল ঃ আনুষঙ্গিক ব্যয় ও রাজ্যগুলির বরাদ্দ ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় সরকার সংগৃহীত সমস্ত রাজস্ব ও ঋণের অর্থ নিয়ে সঞ্চিত তহবিল গঠিত হয়। একই ভাবে প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা ভাবে সঞ্চিত তহবিল থাকে। কেন্দ্রে বা রাজ্যে অন্যভাবে সংগৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। আইনের অনুশাসন ব্যতীত সঞ্চিত তহবিল থেকে কোনও অর্থ তোলা যায় না। সরকারি অন্য হিসাবের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। (সংবিধানের 266 অনুচ্ছেদ)।

সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য তহবিল ঃ আকস্মিক কোনও ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে কিছু অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হতে পারে। সেইজন্য 267 অনুচ্ছেদ সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলিকে নিজস্ব কনটিনজেনসি ফান্ড বা সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য তহবিল গড়ার অধিকার দিয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে এই তহবিল থাকে। যাতে আকস্মিক কোনও ব্যয় তাঁরা করতে পারেন, পরবর্তী কালে সংসদ বা বিধানসভা তা মঞ্জুর করে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ঃ সংবিধানের 268 থেকে 273 অনুচ্ছেদে কেন্দ্র

ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত কর বাবদ সংগৃহীত সমস্ত অর্থ রাজ্যেই থাকে কিন্তু কেন্দ্র কর্তৃক আরোপিত ও সংগৃহীত করের কিছু অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়।

রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য তালিকায় ভাগ করা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে কর্পোরেশন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পত্তি কর, আয়করের উপর অতিরিক্ত কর প্রভৃতি।

সম্পূর্ণভাবে রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রণে থাকে ভূমি রাজস্ব, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে স্ট্যাম্প কর, জলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কর, জমি ও বাড়ির উপর কর, খনিজ সম্পত্তির উপর কর, রাজপথে চলাচল যোগ্য যানবাহনের উপর কর, বিজ্ঞাপন, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, বিলাস দ্রব্য, আমোদ প্রমোদ, বছরে অনধিক 2500 টাকার বৃত্তিকর প্রভৃতি। হুণ্ডির উপর স্ট্যাম্প কর, কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত ওষুধ ও প্রসাধনীর উপর কর নির্ধারণ করে কেন্দ্র। কিন্তু এই সমস্ত কর সংগ্রহ করে রাজ্যগুলি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যতিরেকে রাজ্যগুলি সংগৃহীত রাজস্বের কিছু অংশ ভোগ করে (268 অনুচ্ছেদ)।

কৃষি জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর; কৃষি জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তির উপর সম্পত্তি কর, রেল, বিমান ও জলপথে যাত্রী ও পণ্যের ওপর প্রান্তিক কর; রেল ভাড়া ও রেল মাশুলের উপর কর; স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের উপর কর, সংবাদপত্র ক্রয় ও বিক্রয় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর, সংবাদপত্র ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের আন্তঃরাজ্য ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আরোপিত হয়, কিন্তু সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য প্রাপ্য অর্থ ভারতের সঞ্চিত তহবিলে জমা দেওয়া হয় (269 অনুচ্ছেদ)।

কেন্দ্রীয় তালিকাধীন আয় কর বা অন্তঃশুল্ক কেন্দ্র কর্তৃক আরোপিত ও সংগৃহীত হয় কিন্তু সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। অর্থ কমিশন গঠিত হলে, তার সুপারিশ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি আয় কর থেকে রাজ্যগুলিকে দেয় অর্থের পরিমাণ ঠিক করেন। অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে বণ্টনের পরিমাণ সংসদে আইন করে ঠিক করা হয় (272 অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানের 273, 275 ও 282 অনুচ্ছেদে তিন ধরনের অনুদানের কথা বলা হয়েছে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলিকে এই অনুদান দেওয়া যাবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এইরূপে, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুল্কের বিনিময়ে আসাম, বিহার, ওড়িশা ও পঃ বঙ্গে অনুদান দেওয়া যেতে পারে (273 অনুচ্ছেদ)। আবার 275 অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনে যে কোনও রাজ্যকে অনুদান দেওয়া যায়। 282 অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্র বা রাজ্য জনহিতকর কাজে অনুদান দিতে পারে — এমন কি সেই কাজ কেন্দ্র বা রাজ্যের আইনসভা চৌহদ্দির বাইরে হলেও।

রাজ্য তালিকাভুক্ত করের ওপর প্রভাব পড়ে এমন কোনও বিল পেশ করতে গেলে 274 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হয়।

রাজ্য বিধানসভা আইন করে পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়ের উপর কর বসাতে পারে। একজন ব্যক্তির উপর সর্বোচ্চ বার্ষিক 2500 টাকা কর বসানো যায়। এজন্য অবশ্য সংসদের আয়কর সংক্রান্ত আইন করার কোনও তারতম্য হয় না।

অর্থ কমিশন ঃ সংবিধানের 280 অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে অর্থ কমিশন নিয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছে। একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য কমিশন গঠিত হয়। কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্বের অংশ নির্ধারণ, ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অনুদানের নীতি ও পরিমাণ সুপারিশ করে। রাষ্ট্রপতি ঐ সুপারিশ এবং তার ওপর গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ সংসদের উভয় সভায় আলোচনার জন্য পাঠান (280-281 অনুচ্ছেদ)।

বিভিন্ন অর্থকরী ব্যবস্থা ঃ সঞ্চিত তহবিল, বিশেষ ব্যয়ের জন্য তহবিল এবং সরকারি কোষাগারে জমা পড়া অর্থ, সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (283 অনুচ্ছেদ)। মামলা-মোকদ্দমা বা অন্যান্য সূত্র থেকে সরকারি কর্মচারীরা, বা আদালত যে অর্থ গ্রহণ করে তা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কোষাগারে প্রয়োজনানুসারে জমা দিতে হয়। (284 অনুচ্ছেদ)।

কেন্দ্রের সম্পত্তির উপর রাজ্যগুলি কর বসায় না আবার রাজ্যের সম্পত্তিও কেন্দ্রীয় কর থেকে রেহাই পায় (285 এবং 289 অনুচ্ছেদ)।

286-288 অনুচ্ছেদ অনুসারে বিদ্যুৎ ও জলসম্পদ ব্যবহার করার জন্য, বা বিক্রি করার জন্য, রাজ্যের বাইরে কোনও কিছু কেনা-বেচার জন্য, আমদানি বা রপ্তানির উপর রাজ্য সরকার কোনও কর বসাতে পারে না।

সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে যাঁরা সরকারি কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের পেনশন সহ বিভিন্ন আদালত বা কমিশনের কিছু কিছু ব্যয় সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রের বোঝাপড়া হয়, 290 অনুচ্ছেদ অনুসারে। কেরালা ও তামিলনাড়ু সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে 290A অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্রিবাঙ্কুরের দেবশ্বম তহবিলে বার্ষিক কিছু অনুদান দেওয়া হয়।

ঋণ গ্রহণ ঃ সংসদ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে কেন্দ্র সঞ্চিত তহবিল থেকে খরচ করতে পারে (292 অনুচ্ছেদ)। অনুরূপভাবে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে রাজ্যগুলিও সঞ্চিত তহবিল থেকে টাকা তুলতে পারে। ঋণ গ্রহণ সীমার মধ্যে থেকে ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে ধার দিতে পারে অথবা রাজ্যগুলির সংগৃহীত ঋণের জন্য জামিনদার হতে পারে। এ ধরনের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ না হলে কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া রাজ্যগুলি পুনরায় ঋণ নিতে পারে না (293 অনুচ্ছেদ)।

সম্পত্তি, চুক্তি, অধিকার, দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা ও মামলা : 294, 295, 296 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে ভারতীয় ডোমিনিয়ন প্রদেশ বা রাজ্যগুলির যে সমস্ত সম্পত্তি, ঋণ বা সরকারী দায়-দায়িত্বে ছিল সে সবই কেন্দ্রীয় সরকার বা নির্দিষ্ট রাজ্য সরকারের ভাগে বর্তাবে।

সমুদ্র সীমান্ত বা মহাদেশীয় অঞ্চলে মহার্ঘ্য যে সমস্ত জিনিস থাকবে বা পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (EEZ) সম্পদ কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে যাবে (297 অনুচ্ছেদ)।

ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার, সম্পত্তির অধিগ্রহণ, প্রত্যর্পণ, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি প্রশ্নে কেন্দ্র বা রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজ নিজ আইনসভায় গৃহীত আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা যায় (298 অনুচ্ছেদ)। 245 অনুচ্ছেদ ছাড়াও প্রশাসনিক ক্ষমতার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উৎস হল এই অনুচ্ছেদ। *খাজান সিং বনাম উঃ প্রদেশ* মামলায় (AIR 1974 SC 669) সুপ্রিম কোর্ট বলেন, 298 অনুচ্ছেদ বলে একটি রাজ্য সরকার অন্য রাজ্য সরকারের এলাকায় গিয়েও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে (*আরো দ্রষ্টব্য মহারাষ্ট্র সরকার বনাম আনরাজ* AIR 1984 SC 781)।

ন্যস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে কেন্দ্র বা রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে যে সব চুক্তি সংঘটিত হবে সেগুলি (i) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল এবং (ii) তাঁর নির্দেশিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা যে পদস্থ আধিকারিকরা চুক্তি স্বাক্ষর করেন তাঁদের উপর কোনও ব্যক্তিগত দায়িত্ব বর্তাবে না (299 অনুচ্ছেদ)। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় 299 অনুচ্ছেদ বাধ্যতামূলক এবং এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্পাদিত না হলে কোনও চুক্তি কার্যকর করা যায় না (*বিহার এফ. জি. এফ সমবায় সমিতি বনাম সিপাহী সিং* AIR 1977 SC 2149; *মুলনচাঁদ বনাম মধ্যপ্রদেশ* AIR 1968 SC 1818; *পশ্চিমবঙ্গ বনাম বি. কে. মণ্ডল* AIR 1962 SC 779; *বোম্বে বনাম করমশী* AIR 1964 SC 1714)।

সংসদ বা রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত আইন অনুসারে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার যে কোনও নালিশ করতে পারে বা অভিযুক্ত হতে পারে। কোনও মামলায় ভারতীয় ডোমিনিয়ন কোনও পক্ষ হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকলে, তার পরিবর্তে কেন্দ্র সেই মামলায় প্রতিনিধিত্ব করবে। অনুরূপ ভাবে কোনও প্রদেশ বা ভারতীয় রাজ্য কোনও মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে থাকলে, উপযুক্ত রাজ্য তাকে প্রতিনিধিত্ব করবে (300 অনুচ্ছেদ)।

সম্পত্তির অধিকার ঃ মূল সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত দেওয়া হয় 19 (f) ও 31 অনুচ্ছেদ অনুসারে। কিন্তু সংবিধানের 4তম সংশোধন করে 1979 সালের 20 শে জুন থেকে ঐ দুটি অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে নতুন একটি অনুচ্ছেদ 300A সংযোজিত হয়, যেখানে বলা হয়,

"আইনের অনুশাসন ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।" অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত না হলেও সাংবিধানিক অধিকার বা আইনগত অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। 300A অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হলে 32 অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে রিট আবেদন করা না গেলেও হাইকোর্টে 226 রিট অনুসারে অবশ্যই আবেদন করা যায়। 300A অনুচ্ছেদে গৃহীত কোনও আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, একজন নাগরিককে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা না থাকার জন্য (*বিশ্বেশ্বর বনাম ইউ পি রাজ্য* AIR 1982 SC 33; *মেনকা গান্ধী বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* AIR 1978 SC 597) [এছাড়া মৌলিক অধিকার অধ্যায় দেখুন]।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক মেলামেশার স্বাধীনতা

301 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ভারতের এলাকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অবাধ মেলামেশায় কোনও বিধি নিষেধ থাকবে না। তবে জাতীয় স্বার্থে সংসদ আইন করে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বা মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে (301 ও 302 অনুচ্ছেদ)। সংসদ বা কোনও বাজ্যের বিধানসভা এমন কোনও আইন করতে পারে না যে আইন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি রাজ্য অপেক্ষা অন্য রাজ্যকে গুরুত্ব দেয়। তবে ভারতের কোনও প্রান্তে কোনও জিনিসের অভাব দেখা দিলে, সেই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সংসদ আইন করে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (303 অনুচ্ছেদ)।

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতার অর্থ অবাধ বাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ না করা। তবে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বা কর বসিয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিরোধী। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য এই স্বাধীনতার অন্তর্গত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক মেলামেশা বলতে পণ্য ও মানুষের অবাধ চলাচল বোঝায় (*আটিয়াবাড়ী টি কোং বনাম আসাম রাজ্য* AIR 1961 SC 237; *অটোমোবাইল ট্রান্সপোর্ট বনাম রাজস্থান সরকার* AIR 1962 SC 406; *হরিহর প্রসাদ দেবুকা বনাম বিহার রাজ্য* (1989) 2 SCC)।

301 অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা 302 ও 303 অনুচ্ছেদ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি 304 অনুচ্ছেদে ভিন্ন রাজ্য থেকে আগত দ্রব্যের ওপর যে কোনও রাজ্য সরকার কর আরোপ করতে পারে, যদি সেই রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর কর বসানো থাকে। অর্থাৎ রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্য এবং ভিন্ রাজ্য থেকে আনা দ্রব্যের মধ্যে কোনও রকম পার্থক্য করা হয় না। জনস্বার্থে যে কোনও রাজ্য সরকারও বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। তবে এই মর্মে

কোনও বিল আইনসভায় পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। 301 ও 303 অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই প্রচলিত আইন বা রাজ্যের একচেটিয়া বিষয় সংক্রান্ত আইনকে প্রভাবিত করতে পারে না (305 অনুচ্ছেদ)।

301 অনুচ্ছেদ থেকে 304 অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বিষয় কার্যকর করার জন্য সংসদ যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে পারে 307 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

সতেরো

জরুরি ব্যবস্থা

অংশ XVIII, অনুচ্ছেদ 352-360

'জরুরি অবস্থা' বলতে কঠিন পরিস্থিতিকে বোঝায়, যে সময় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়—তা সংবিধান নির্দেশিত বিশেষ ক্ষমতা বলেই হোক, বা আপৎকালীন পরিস্থিতির চাপে গৃহীত অন্য কোনও পদ্ধতিতেই হোক।'

সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন, এমন বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যখন সংবিধান অনুযায়ী স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব হবে না। সেই পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য সংবিধানের কোনও কোনও অংশের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হতে পারে।

ডঃ অম্বেদকর মনে করতেন, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনন্য। অন্যত্র যা অসম্ভব, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জরুরি অবস্থার সময় সমগ্র দেশ এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। *গুলাম সারওয়ার বনাম ভারত সরকার* মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একই মনোভাব ব্যক্ত করেন (AIR 1967 SC 1335)।

সংক্ষেপে, সংবিধানে দু'ধরণের জরুরি অবস্থার কথা বলা হয়েছে (i) জাতীয় জরুরি অবস্থা (352 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, সশস্ত্র বিদ্রোহ হেতু। (ii) 360 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আর্থিক জরুরি অবস্থা। তৃতীয় ধরণের অবস্থা অর্থাৎ 356 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত জারুরি অবস্থা। এই অবস্থাকে যদিও জরুরি অবস্থা পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সঠিকভাবে বললে এই অবস্থাকে জরুরি অবস্থা বলা যায় না।

জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা ঃ

সংবিধানের 352 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন—যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সমগ্র ভারত বা তার কোনও অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তিনি সমগ্র ভারত বা তার কোনও অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তিনি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ঘোষণা করতে পারেন। যে কোনও জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে সংসদের উভয় সভায় পেশ করতে হয় এবং এক মাসের মধ্যে উভয় সভার অনুমোদন না পাওয়া গেলে ঐ ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়। আর সংসদের সম্মতি পেলে একনাগাড়ে 6 মাস চালু রাখা যায়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে তার আগেও এক ঘোষণা দ্বারা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। জরুরি অবস্থার ঘোষণাকে সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। আবার লোকসভা যদি এই ঘোষণাকে সম্মতি না দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়। মোট সাংসদের এক দশমাংশের স্বাক্ষরিত কোনও প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বা অধ্যক্ষের কাছে দেওয়া হলে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য 14 দিনের মধ্যে সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হয়।

1978-79 সালে সংবিধানের 44তম সংশোধনীর মাধ্যমে 352 অনুচ্ছেদকে আরও কঠোর করা হয়। 1979 সালের 20 জুন এই সংশোধনী কার্যকর হয়। "অভ্যন্তরীণ অসুবিধা"র জন্য 1975 সালের 25 জুন জারি করা জরুরি অবস্থার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার জন্য এই সংশোধনী আনা হয়। অপপ্রয়োগ রোধ করার জন্য "সশস্ত্র বিদ্রোহ"-র পরিবর্তে "অভ্যন্তরীণ অসুবিধা" শব্দ দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের লিখিত অনুরোধ, জরুরি অবস্থা ঘোষণার অন্যতম শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং পুরো পদ্ধতিটাই সংসদের বিশেষ করে লোকসভার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল।

353 ও 365 অনুচ্ছেদ একযোগে পাঠ করলে বোঝা যায়, জরুরি অবস্থার সময় শাসনকার্য পরিচালনায় কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ কার্যকর না হলে 356 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা যায়।

জরুরি অবস্থার সময় সংসদের হাতে কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত নয় এমন সমস্ত বিষয়ে আইন করার অধিকার বর্তায়।

354 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা (268 থেকে 279 অনুচ্ছেদ) জরুরি অবস্থার সময় প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যায়।

সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারগুলি জরুরি অবস্থার সময় 358 অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থগিত রাখা যায়। আর 359 অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত মৌলিক অধিকার বাতিল করার ক্ষমতা দিয়েছে। শুধুমাত্র 20 এবং 21 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচারে

আত্মপক্ষ সমর্থন এবং জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রদত্ত মৌলিক অধিকার এই ক্ষমতা অনুযায়ী বাতিল করা যায় না।

358 ও 359 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 20 এবং 21 অনুচ্ছেদ ব্যতীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র আইন বিভাগ নয় প্রশাসনও হস্তক্ষেপ করতে পারে।

358 ও 359 অনুচ্ছেদে গৃহীত কোনও আইন তখন বৈধ বিবেচিত হয়, যখন সেখানে 'জরুরি অবস্থা জারি থাকার দরুন' কথাগুলি উল্লেখ করা হয়। জরুরি অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের আইনের কার্যকারিতা শেষ হয়।

ভারতে তিনবার জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। চীনা আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে 1962 সালের অক্টোবর মাসে; পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 1971 সালের ডিসেম্বর মাসে এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য 1975 সালের জুন মাসে। জরুরি অবস্থার সময় সংবিধান সংশোধন করে এবং বিভিন্ন আইন বলে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন।

বিশেষ ভাবে অভ্যন্তবীণ জরুবি অবস্থার সময় ক্ষমতা অপব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। পরের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিবা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং জনতা দল সরকার গঠন করে। 1978 সালে সংবিধানের 44তম সংশোধন করে বলা হল, যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণেব সময়ই সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত বাখা যাবে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাজনিত জরুরি অবস্থার সময় 19 ধারার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। ঐ একই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোনও রকম জরুবি অবস্থাব সময়ই 20 এবং 21 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্ব করা চলবে না।

1978 সালের সংশোধনীর পূর্বে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা সুপ্রিম কোর্ট বিচার করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জরুরি অবস্থাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে এই সমস্ত মামলা দায়ের করা হয়। 21 ও 22 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে জারি করা রাষ্ট্রপতিব আদেশ সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখেন (*মোহন চৌধুরি বনাম চিফ কমিশনার* AIR 1974 SC 173)। *মাখন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* (AIR 1964 SC 381) মামলায় দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকার ও জরুরি অবস্থাকালীন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হলে ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হবেই, এই অভিমত ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট বলেন ঃ

> জরুরি অবস্থা কত দিন বহাল থাকবে এবং জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারে কতটা বিধি নিষেধ বলবৎ করা হবে তা স্থির করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। কেননা বাস্তব পরিস্থিতি এবং সঙ্কট কালে কোন কোন বিষয় মাথা চাড়া দিতে পারে সে সম্পর্কে শাসন বিভাগই সম্যক ওয়াকিবহাল।

আপৎকালীন আইন যার সাহায্যে কাউকে অন্যায় ভাবে বন্দী করা হয় বা প্রশাসনের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়, তার বৈধতা বিচার করার এক্তিয়ার আদালতের আছে বলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন। অপর একটি মামলায় আদালত রায় দেন, যে সংবিধি অনুসারে প্রশাসনের হাতে যে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বৈধ এবং বিনা বিচারে আটক করা মূলত প্রশাসনিক কাজ, বিচার বিভাগের পর্যালোচনার বিষয় নয়। (*সাধু সিং বনাম দিল্লি প্রশাসন* AIR 1966 SC 91)। *মহারাষ্ট্র সরকার বনাম প্রভাকর পাণ্ডুরাং সাংগিরি* (AIR 1966 SC 424) মামলায় আদালত মনে করেন, যেহেতু জরুরি অবস্থা জারি করার কারণসমূহের সঙ্গে সরকারের জারি করা বিধি নিষেধের কোনও সম্পর্ক নেই, সেহেতু একজন বন্দী তার বই প্রকাশ করার জন্য জেলখানার বাইরে পাঠাতে পারে। *কে আনন্দ নামবিয়ার বনাম চিফ সেক্রেটারি* (AIR 1966 SC 657) মামলায় একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিচারপতি গজেন্দ্রগদকর মন্তব্য করেন, এমন কি জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত করে জারি করা রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বিচার করে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। *রাম মনোহর লোহিয়া বনাম বিহার রাজ্য* মামলায় (AIR 1966 SC 740) বলা হয় ঃ আপাতদৃষ্টিতে আটক আদেশ যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত, "আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নের" সঙ্গে "জন-স্বার্থের প্রশ্ন"কে সম পর্যায়ভুক্ত করা চলবে না এবং ভারত রক্ষা আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি বৈধ বিবেচিত হতে পারে যদি তা "জন-স্বার্থেই" গৃহীত হয়ে থাকে, "আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে" নয়। জরুরি অবস্থার সময় জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোত্তম গুরুত্ব দিয়েও ভারত রক্ষা আইনে বিধৃত যথেষ্ট কারণ ব্যতীত কোনও নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা যায় না। এই কারণে আদালত একটি আটক "সম্পূর্ণ অন্যায়" বলে রায় দেন (*জি সদানন্দন বনাম কেরালা রাজ্য* 1966 SC 1925)। *পি এল লক্ষ্মণ পাল বনাম কেন্দ্র* (AIR 1967 SC 1507) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সাধু সিং মামলার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন এবং বলেন, আটক আদেশ বিচার করার জন্য স্বাভাবিক ন্যায়নীতিই প্রয়োগ করা উচিত। *ভরত সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার* মামলায় (AIR 1967 SC 1170) আদালত বলেন ঃ

> কোনও নাগরিকের স্বার্থহানি করে গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থার পিছনে আইনী সমর্থন অবশ্য প্রয়োজন এবং 358 অনুচ্ছেদ এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। 358 অনুচ্ছেদ নাগরিকদের স্বার্থ বিরোধী যে কোনও কাজ করার অবাধ অধিকার রাষ্ট্রকে দেয় না। জরুরি অবস্থার সময় আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে 358 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এমন কিছু আইন করা যায় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, যে সমস্ত আইন সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদ কার্যকর থাকলে বাতিল হয়ে যেত।

জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মৌলিক অধিকারের উপর স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে *মহম্মদ ইয়াকুব বনাম জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য* মামলায় (AIR 1968 SC 765), সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে রায় দেন যে, 359 অনুচ্ছেদে ক্ষমতা প্রয়োগ ও

ভারতের নিরাপত্তার মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করার সুযোগ নেই। *ভূতনাথ বনাম পঃ বঙ্গ* (AIR 1974 SC 806) মামলায় জরুরি অবস্থা বজায় রাখা অযৌক্তিক, সুপ্রিম কোর্ট এ কথা বলতে অস্বীকার করেন, বিচারপতি আয়ার বলেন, দেশে "প্রকৃতই কোনও জরুরি অবস্থা নেই," এই যুক্তি বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না। *কালেক্টর অব হায়দরাবাদ বনাম ইব্রাহিম কোঃ* (AIR 1970 SC 1275) মামলায় একই অবস্থার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। আদালত বলেন ঃ

> সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যতীত যে সমস্ত প্রশাসনিক আদেশ দিতে রাষ্ট্র যোগ্য, সেই সমস্ত আদেশ অনাক্রম্য। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যা অন্যভাবে অচল তা শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় গৃহীত হয়েছে বলে দায়মুক্ত হতে পারে না।

358 অনুচ্ছেদে এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থার সময়ে করা কোনও কাজ সম্পর্কে জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না, এমন কি সংবিধানের 19 অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করা হলেও তা চলবে না। (*বেনেট কোলম্যান বনাম কেন্দ্রীয় সরকার* AIR 1973 SC 106)।

অভ্যন্তরীণ জরুরি সময় (1975-1977) মৌলিক অধিকার খর্ব করার প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। তাই বন্দীকে সশরীরে হাজির করে বন্দিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কোনও ব্যক্তির আটকের প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন, কারণ প্রশাসনই আটক আইনের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছিল। কোনও রাজনৈতিক বন্দী আদালতে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের (হেবিয়াস কর্পাস) আবেদন করতে পারে, যদি তার বিরুদ্ধে আপাতগ্রাহ্য আটক-আদেশ থাকে (*অতিরিক্ত জেলা শাসক বনাম শিবকান্ত শুক্লা* AIR 1976 SC 1207)।

পুনরায় *কেন্দ্র বনাম ভানুদাস* মামলায় (AIR 1977 SC 1027) আদালত রায় দেন যে, 359 অনুচ্ছেদ প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে সংবিধানের 19, 21 ও 22 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমস্ত অধিকার স্থগিত থাকবে। 42তম সংশোধনের পর আদালতের এই সমস্ত রায়ের অধিকাংশই, বিশেষ ভাবে সংশোধিত 352, 358, 359 অনুচ্ছেদে তাদের গুরুত্ব হারিয়েছে।

মিনার্ভা মিল্‌স মামলায় বলা হয় বিচার বিভাগ ব্যবস্থা তখনই নিতে পারে যদি এ কথা প্রমাণ করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্বেষপ্রসূত ভাবে ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে মামলা দায়ের করেছে। অন্যথায় রাজনৈতিক প্রতিবিধানই একমাত্র বিকল্প। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির মতো ব্যাপার আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। যদি দেখানো যায় যে সন্তুষ্টির প্রশ্ন অবান্তর, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ক্ষমতার প্রয়োগ ও অসাংবিধানিক, তাহলে আদালত তার সীমিত পরিসরে এই মামলার পর্যালোচনা করতে পারেন (AIR 1980 SC 1789)।

রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা ঃ

বহিরাক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে রাজ্যগুলিকে উদ্ধার করা এবং সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালিত হচ্ছে তা দেখা কেন্দ্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। (355 অনুচ্ছেদ) কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনও ভাবে রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য চলছে না বা শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, তাহলে তিনি এক আদেশ বলে রাজ্যপাল সহ যে কোনও সংস্থা বা শাসন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় অথবা আংশিক ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের সন্তুষ্টি এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রকৃত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। যদি কোনও রাজ্য সংবিধানের 256, 257, 353 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে রাজ্যে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করতে পারেন এবং 356 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

এই আদেশের ফলে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা সংসদ গ্রহণ করে বা সংসদের কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয় অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বরখাস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্ট ছাড়া সমস্ত সংস্থার সাংবিধানিক ক্ষমতা গ্রহণ সহ যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা দু'মাসের মধ্যে অনুমোদিত না হলে ঐ আদেশ বাতিল হয়ে যায়। সংসদের অনুমোদন পেলে তা 6 মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে সংসদ পুনরায় 6 মাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে পারে। এই ভাবে সংসদ 3 বছর পর্যন্ত কোনও রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখতে পারে। অবশ্য 1987 সালে মে মাসে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের যে আদেশ জারি করা হয়, সংবিধানের 68তম সংশোধনের সাহায্যে তা 5 বছর পর্যন্ত চালু রাখা হয়।

356 অনুচ্ছেদে জারি করা রাষ্ট্রপতির শাসনে সংসদ-রাজ্যের আইনবিষয়ক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি বা তাঁর নিযুক্ত কোনও কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করে (357 অনুচ্ছেদ)।

356 অনুচ্ছেদে কেন্দ্র রাজ্যগুলির উপর রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেয়। সেজন্য সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি সবচেয়ে বিতর্কিত ও সমালোচিত। গত 44 বছরে এই অনুচ্ছেদ বলে কেন্দ্র 90 বার রাজ্য সরকারগুলিকে বরখাস্ত করেছে। সমালোচক ও বিরোধীরা মনে করেন, কেন্দ্রের শাসক দল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে এবং রাজনীতির প্রয়োজনে বিরোধী দলের রাজ্যসরকারগুলিকে বরখাস্ত করেছে। গণপরিষদে এই অনুচ্ছেদের সমালোচনার জবাবে ডঃ অম্বেদকর কিন্তু বলেছিলেনঃ এটা ছাপার অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর একমাত্র চরম ব্যবস্থা ছাড়া এই ধারা প্রয়োগ করা হবে না। *রাজস্থান সরকার বনাম কেন্দ্র* (AIR 1977 SC 1361) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেনঃ রাষ্ট্রপতির মানসিক সন্তুষ্টির উপরই 356 অনুচ্ছেদের

প্রয়োগ নির্ভর করে। আদালত তার সন্তুষ্টি রাষ্ট্রপতির উপর চাপাতে পারেন না আবার সংবিধানের 74(2) অনুচ্ছেদের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দেয় সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান করতে পারেন না। আদালত অবশ্য আরও বলেন যে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি যদি অন্যায্য হয়, অপ্রয়োজনীয় তথ্যসঞ্জাত হয় বা আদৌ সন্তুষ্টি না হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারেন। অর্থাৎ মাত্র এই নিরিখে 356 অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নিয়ন্ত্রাধীন।

অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঃ

সংবিধানের 360 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে সমগ্র ভারত বা তার কোনও অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম বিপন্ন হয়েছে তাহলে তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। অন্য ঘোষণার দ্বারা পূর্ববর্তী ঘোষণা রদ করা যায়। অবশ্য দু'মাসের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদন না পেলে ঘোষণা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু একবার সংসদের অনুমোদন পেলে যতদিন না অন্য একটি ঘোষণা দ্বারা তাকে রদ করা হয় ততদিন পর্যন্ত আর্থিক জরুরি অবস্থা বজায় থাকে।

আর্থিক জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও রাজ্য সরকারকে বিশেষ কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি যা ভাল বুঝবেন তেমন নির্দেশ দিতে পাবেন। এই নির্দেশের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা, অর্থ বিল সহ রাজ্য বিধানসভায় (207 অনুচ্ছেদ) গৃহীত যে কোনও বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তুলে রাখা প্রভৃতি বোঝায়। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সব কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি নিতে পারেন।

সংবিধান চালু হওয়ার পর গত 45 বছরে (1950-1994) আর্থিক জরুরি অবস্থা এক বারের জন্যও চালু করা হয়নি।

আঠারো

কেন্দ্রের ও রাজ্যের অধীন লোকসেবা

অংশ XIV-XIVA, অনুচ্ছেদ 308-323B

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লোকসেবা (সিভিল সার্ভিসেস) শাসনযন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কার্যত এই অরাজনৈতিক ও অনির্বাচিত কর্মীরাই প্রশাসনের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। আইন ও নীতি অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণে এঁরা কাজ করেন।

স্বাধীনতার সময় আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি সুসংবদ্ধ সর্বভারতীয় কৃত্যক পেয়েছি। এছাড়াও কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও অধস্তন কৃত্যক আছে।

যদিও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়গুলি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি নির্দিষ্ট আইনসভায় নির্ধারিত হয়, তথাপি সংবিধান প্রণেতারা চাকরিতে নিয়োগ, নিরাপত্তা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছু সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে যান। এই পরিপ্রেক্ষিতেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ব্যবস্থা সংবিধানের রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কৃত্যক সংক্রান্ত ধারাগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সারা দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (308 অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানের 309 অনুচ্ছেদে সংসদ ও বিধানসভাগুলিকে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরি সংক্রান্ত শর্তাবলী ঠিক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যতদিন আইন তৈরি না হবে ততদিন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যেক্ষেত্রে যেমন নিয়মাবলী তৈরি করবেন।

310 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সামরিক ও অসামরিক যে কোনও সরকারি কর্মচারীর চাকুরি রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে পূর্বেই চাকরি-ছেদ হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, মুখ্যনির্বাচন কমিশনার, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষক, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যবৃন্দ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। 124, 217, 317, 324 প্রভৃতি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ ব্যতীত এঁদের পদচ্যুত করা যায় না। তাছাড়া বিশেষ কয়েক ধরনের সবকারি চাকুরির নিয়োগ ও নিরাপত্তার শর্ত নিয়ন্ত্রণ করে সংবিধানে বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আইনসভার সচিবালয়ের কর্মচারী (98 ও 187 অনুচ্ছেদ), সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টেব কর্মচারী (146 ও 299 অনুচ্ছেদ) ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক অফিসের কর্মচারী (148 অনুচ্ছেদ) — যাঁদের ক্ষেত্রে 309 অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয়।

সরকারি কর্মচারীদেব চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে 311 অনুচ্ছেদে সন্তুষ্টি বিধানের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে। যেমন, নিয়োগকর্তার অধস্তন কোনও কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত করতে পারেন না। কোনও সরকারি কর্মচারীকে পদচ্যুত, বরখাস্ত বা পদমর্যাদা হ্রাস কবার পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করতে হবে এবং অনুসন্ধান চলাকালে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবক্ষা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এমন কি বরখাস্ত, পদচ্যুতি ও পদমর্যাদা হ্রাস ব্যতীত অন্য কোনও শাস্তি অসামরিক কর্মচারীদের দেওয়া হলে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। অবশ্য এই ধারায় স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি (*নরসিমাচর বনাম মহীশূর রাষ্ট্র,* AIR 1960 SC 247; *পুরুষোত্তম বনাম কেন্দ্র,* AIR 1958 SC 36)।

এ কথা বলা হয় যে 311 অনুচ্ছেদে যে সংরক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে তা পদ্ধতি সংক্রান্ত, অস্তিত্ব ব্যঞ্জক নয়। যদি সমস্ত পদ্ধতি যথাযথভাবে মানা হয়, তাহলে কোনও প্রতিকারের প্রয়োজন হয় না। সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলি (ক) যাঁকে শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে, (খ) অভিযোগগুলি নিয়মমাফিক অভিযুক্তকে জানাতে হবে, (গ) জবাব দেওয়ার জন্য অভিযুক্তকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে, (ঘ) নিজের সমর্থনে সকল সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার তাঁকে দিতে হবে এবং যে সমুদয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর তিনি নির্ভরশীল তা পেশ করার সুযোগ দিতে হবে, (ঙ) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা তথ্য ও প্রমাণের নিরিখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারীকে না দেখিয়ে বা তাঁর বক্তব্য না শুনে কোনও তথ্যের

উপর নির্ভর করা যাবে না, মূল কথা, ন্যায় বিচার থেকে অভিযুক্ত যেন বঞ্চিত না হয়। (*ইউনিয়ন বনাম ভার্মা* AIR 1957 SC 882)।

বেতন, ভাতা বা পেনসন কাটা যাওয়ার মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ না থাকলে 311 অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করা যায় না। যেভাবেই বলা হোক না কেন, অপসারণ বা ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে 311 অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়। অবশ্য চুক্তির শর্তানুযায়ী যদি চাকুরি ছেদ করা হয়, অবসর বা নিয়ম মেনে বাধ্যতামূলক অবসরের ক্ষেত্রে 311 অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয়। পদাবনতির ক্ষেত্রে বিষয়টি শাস্তিজনিত কিনা তা বিচার্য। উচ্চপদে আসীন কোনও ব্যক্তিকে 311 অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যতীত নিম্নপদে নিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু অস্থায়ী পদ থেকে পরিবর্তন 311 অনুচ্ছেদের আওতায় আসে না যদি না তা শাস্তি দেওয়ার জন্য হয় (*পুরুষোত্তম বনাম ভারত ইউনিয়ন*)।

311 অনুচ্ছেদে যে অনুসন্ধান করার কথা বলা হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে তা পরিহার করা যায়—যেমন (ক) ফৌজদারি মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত হলে, (খ) কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করতে না পারার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করলে, (গ) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যদি মনে করেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারণে এমন অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

সর্বভারতীয় চাকরির সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির মধ্যে অনেক ফারাক আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি শুধুমাত্র কেন্দ্রের এবং রাজ্য সরকাবি চাকরি শুধু রাজ্যের বিষযে সীমাবদ্ধ। আর সর্বভারতীয় চাকরি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পর্যায়ক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যে কাজ করতে হয়। সংবিধানে দুটি সর্বভারতীয় কৃত্যকের (ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক—ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস) ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের (ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) উল্লেখ আছে। 312 অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে রাজ্যসভা যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাতীয় স্বার্থে সর্বভারতীয় বিচার কৃত্যক সহ এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠন করা দবকার, তাহলে সংসদ আইন বলে তা করতে পারে। এই অনুচ্ছেদ বলে সংসদ সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন 1951 পাশ করে। এর ফলে 1948 সালে সৃষ্ট আই এ এস এবং আই পি এস ছাড়াও বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় কৃত্যক তৈরি করা হয়। 312 অনুচ্ছেদ বলে সংসদ সর্বভারতীয় যে কোনও কৃত্যকের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

1972 সালে 28তম সংবিধান সংশোধন করে 312A অনুচ্ছেদে সংবিধান চালু করার পূর্বে রাজকীয় কৃত্যক-এর শর্তাবলীর সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়েছে। 313 অনুচ্ছেদে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার কথা বলা

আছে— অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রকৃত্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত আইন বলবৎ থাকবে। 314 অনুচ্ছেদে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের যে সুরক্ষা দেওয়া হত 28তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়।

লোকসেবা আয়োগ

সংবিধানের 315 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কেন্দ্রের জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা লোকসেবা আয়োগ সহ প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে লোকসেবা আয়োগ গঠন করা যেতে পারে। দুই বা ততোধিক রাজ্য একটি যৌথ আয়োগের দাবি করতে পারে। অনুরোধে কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগও রাজ্যের হয়ে কিছু কাজ করতে পারে।

লোকসেবা আয়োগ একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে সুদক্ষ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা আয়োগের প্রধান কাজ। রাজ্য ও কেন্দ্রের আয়োগের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয় রাজ্য ও কেন্দ্রের সঞ্চিত তহবিল থেকে (322 অনুচ্ছেদ)।

লোকসেবা আয়োগের সভাপতি ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। অন্তত অর্ধেক সদস্যের কেন্দ্রের বা রাজ্যের সরকারীর চাকরিতে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সদস্যদের ছ'বছরের জন্য মনোনীত করা হয়। অবশ্য তার পূর্বে যদি কোনও সদস্যের বয়স 65 (কেন্দ্রের ক্ষেত্রে) এবং 62 (রাজ্যের ক্ষেত্রে) পূর্ণ হয় তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। বিশেষ কয়েকটি কারণ ব্যতীত কোনও সদস্যকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যায় না। যেমন, যদি কোনও সদস্য দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন, কমিশনের সদস্য থাকাকালীন অন্য কোথাও সবেতনে চাকরি করেন, মানসিক বা শারীরিক কারণে অনুপযুক্ত হন বা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অসদাচরণের জন্য তিরস্কৃত হন বা কোনও সরকারি চুক্তির সঙ্গে জড়িত থাকেন বা লভ্যাংশের ভাগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া আয়োগের সদস্যরা কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সেই পদে পুনর্নিয়োগের যোগ্য বলে বিবেচিত হন না (সংবিধানের 316 ও 317 অনুচ্ছেদ; *উঃ প্রঃ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বনাম সুরেশ,* AIR 1987 SC 1953; *হরগোবিন্দ বনাম রঘুকুল* AIR 1979 SC 1109; Ref under 317(1) AIR 1983 SC 996)।

সংবিধানের 318 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একজন সদস্যকে নিয়োগ করার পর আয়োগের সদস্যদের স্বার্থহানি করে চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তন করা যায় না। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল আয়োগের সদস্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ঠিক করেন এবং তাঁদের চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন।

কমিশনের সদস্যরা অন্য কোনও সরকারি পদে নিযুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু

কোনও রাজ্যের লোকসেবা আয়োগের চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের চেয়ারম্যান বা সদস্য অথবা অন্য রাজ্যের লোকসেবা আয়োগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন। কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের কোনও সদস্য রাজ্যের লোকসেবা আয়োগের অথবা কেন্দ্রীয় আয়োগের সভাপতি নিযুক্ত হতে পারেন, আবার রাজ্য লোকসেবা আয়োগের কোনও সদস্য কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের সদস্য বা কেন্দ্র অথবা রাজ্য আয়োগের সভাপতি হতে পারেন (319 অনুচ্ছেদ)।

লোকসেবা আয়োগের কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

i কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা;
ii কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চাকরির জন্য সুপারিশ করা;
iii সমস্ত অসামরিক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নীতি ঠিক করা, এ সমস্ত বিষয়ে প্রার্থীর উপযুক্ততা নির্ধারণ ও সমস্ত অসামরিক কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া;
iv রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল প্রেরিত অন্য কোনও বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ দেওয়া।
v অনুরোধ পেলে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য যুক্ত সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা;
vi রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল সমীপে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা যা তাঁরা লোকসভা/বিধানসভায় পেশ করেন;
vii অন্য যে কোনও বিষয় যা সংসদ বা বিধানমণ্ডলী আইন করে ঠিক করে দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টের মতে লোকসেবা আয়োগের কার্যাবলী সম্পূর্ণ উপদেশাত্মক এবং পরামর্শের জন্য নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে সরকার আয়োগের সঙ্গে পরামর্শ করতে ব্যর্থ হলে ক্ষতিগ্রস্ত কোনও সরকারী কর্মচারি 320 অনুচ্ছেদ বলে আদালতের মাধ্যমে কোনও প্রতিকার পান না। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে আইন বা নিয়মানুযায়ী পরামর্শ করা হলে তা আদালতের বিবেচ্য হয় (320-321 এবং 323 অনুচ্ছেদ, *উঃ প্রদেশ বনাম শ্রীবাস্তব* AIR 1957, SC 912; *উঃ প্রদেশ বনাম রাজস্থান* AIR 1988 SC 162)।

প্রশাসনিক সালিসী

1976 সালে 42তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে একটি নতুন অংশ— XIVA এবং 323A ও 323B অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে সরকারি পদে নিয়োগ, চাকুরির শর্তাবলী প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একটি প্রশাসনিক সালিসী ব্যবস্থা গঠন করার আইনগত ক্ষমতা সংসদ ও বিধানসভার ওপর ন্যস্ত হয়। চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এ রকম বহু সালিসী আদালত গঠন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্য যে কোনও আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে সালিসী আদালত পড়ে না।

উনিশ

নির্বাচন

অংশ XV অনুচ্ছেদ 324-329A

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ঘটনা অবশ্যই সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। সদ্য স্বাধীন একটি দেশ, যেখানে আতঙ্কজনক অনগ্রসরতা, চরম দারিদ্র্য ও বল্গাহীন নিরক্ষরতা নিত্য সঙ্গী সেখানে সংবিধান প্রণেতারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি ভোট' রীতি চালু করেন। মানসিক ভারসাম্যহীন, সাজাপ্রাপ্ত আসামী অথবা অনাবাসী ব্যতীত ন্যূনপক্ষে 21 বছর বয়সী (পরবর্তীকালে কমিয়ে 18 বছর করা হয়েছে) প্রতিটি নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন (সংবিধানের 326 অনুচ্ছেদ)।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ সংসদ ও বিধানমণ্ডলীর সমস্ত নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদে একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি যতজন কমিশনার নিয়োগ করবেন তাঁদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হবে। যদি একাধিক কমিশনার নিযুক্ত হন তবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সভাপতিত্ব করবেন। সম্প্রতি (অক্টোবর 1993) দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন, যাঁরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সমান মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পাবেন। তাছাড়া এই কমিশনকে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে অথবা অধিকাংশের মত অনুযায়ী কমিশনকে কাজ করতে বলা হয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই আদেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত করা যায়। যে পদ্ধতি ও কারণে সুপ্রিম কোর্টের বিচারককে অপসারণ করা যায়, একমাত্র সেই কারণ ও পদ্ধতি ছাড়া মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করা যায় না। নিয়োগের পর যাতে, তাঁর অসুবিধা হয়—এমনভাবে চাকরির শর্তাবলীর পরিবর্তন করা যায় না। অন্য নির্বাচন কমিশনার (যদি থাকেন) মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশে অপসারণ করা যায়।

325 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ ও বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনকেন্দ্র পিছু একটি করেই সাধারণ নির্বাচক-তালিকা থাকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণগত কারণে কাউকে নির্বাচক তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না, একই ভাবে এজন্য কেউ বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে না।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার জন্য ভোটার তালিকা তৈরি, নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমা নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন তৈরি করার ক্ষমতা সংবিধানের 327 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের আছে।

প্রয়োজনে রাজ্য বিধানসভাকে 328 অনুচ্ছেদে বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য, আইন তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

327 ও 328 অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচনী অধিক্ষেত্রের সীমা ও সংখ্যা নিয়ে কোনও আইনের বৈধতা, সংসদের উভয় সভা ও বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করে সংবিধানের 329 অনুচ্ছেদ। রাজ্যের আইনসভার নির্বাচনের বিষয়, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে আইনানুগ ভাবে পেশ করা নির্বাচনী আবেদন (পিটিশন)-এর মাধ্যমে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, হাইকোর্টকে নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টেও আপিল করা যায়। রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে।

নির্বাচনী সংস্কার ঃ

324 অনুচ্ছেদে 'তত্ত্বাবধান করা, নির্দেশ দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করা'র যে কথা বলা হয়েছে তা সরকার এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে তুমুল বির্তকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আচরণবিধি, নির্বাচনী নিয়মকানুন প্রয়োগ করতে চাইছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। এ ব্যাপারে সরকারও নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত একটি সুসংহত আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন। এই সংক্রান্ত একটি বিলও ঝুলে রয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টাই রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক

এবং দলীয় মতবিরোধের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে ভোটারদের জন্য পরিচয়-পত্র ইস্যু করার বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিচয়-পত্র নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বেশ ভাল রকম বিতর্ক বাধে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যায়। সুপ্রিম কোর্ট পরিচয়-পত্র ইস্যু করার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা মেনে নিয়েও রায় দেন, পরিচয়-পত্র না থাকার কারণে কোনও ভোটারকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কুড়ি

ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা

অংশ III, অনুচ্ছেদ 29-30, অংশ V, অনুচ্ছেদ 120, অংশ VI, অনুচ্ছেদ 210, অংশ XVII, অনুচ্ছেদ 343-351, অংশ XXII, অনুচ্ছেদ 394A, এবং অষ্টম তফসিল

সংবিধানের অষ্টাদশ অংশটিতে সম্পূর্ণভাবে 'সরকারি ভাষা' সংক্রান্ত আলোচনা আছে। কিন্তু ভাষা সংক্রান্ত আরও নানা অনুচ্ছেদ সংবিধানের নানা অংশে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যায়।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা এবং ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্বহীনতা ঃ সংবিধানের 29 অনুচ্ছেদে ভারতের যে কোনও অঞ্চলে বসবাসকারি যে কোনও নাগরিকের তার ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সরকার পরিচালিত বা সাহায্যপুষ্ট কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে কোনও নাগরিকের ভর্তি আটকানো যায় না। 30 অনুচ্ছেদে ধর্মীয় ও ভাষাগত সমস্ত সংখ্যালঘুর নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষালয় নির্মাণ ও পরিচালনা করার অধিকারকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। ভাষা বা ধর্মভিত্তিক পরিচালনার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ না করার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (মৌলিক অধিকার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তম সংশোধনীতে সংযোজিত 350A অনুচ্ছেদে প্রতিটি রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশুদের প্রাথমিক স্তর থেকেই মাতৃভাষায়

শিক্ষাদানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়েছে। "ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী" বলতে রাজ্যের সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠী বোঝায়, যারা দেশের যে কোনও অঞ্চলের মানুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন (*কেরালা শিক্ষা বিল* AIR 1958 SC 956)।

350 অনুচ্ছেদ অনুসারে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়ে খোঁজখবর করার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করতে পারেন, যিনি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন। সংসদের দুই কক্ষে এই প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছেও পাঠানো হয়।

আইন পরিষদের ভাষা ঃ

120 অনুচ্ছেদে সংসদের সরকারি ভাষার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে সংসদের কাজকর্ম হিন্দি ও ইংরেজীতে চলবে। কোনও সদস্য হিন্দি বা ইংরেজী ভাষা না জানলে সভাপতি তাঁকে মাতৃভাষায় কথা বলার অনুমতি দিতে পারেন। আঞ্চলিক ভাষা থেকে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা সংসদের উভয়কক্ষে আছে। কার্যত দুটি কক্ষেব সমস্ত কাজ, কর্মই হিন্দি ও ইংরেজীতে সম্পন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি থেকে ইংরেজী বা ইংরেজী থেকে হিন্দিতে অনুবাদের ব্যবস্থাও আছে।

রাজ্য বিধানসভাগুলির ভাষা সংক্রান্ত বিষয় 210 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধানমণ্ডলীর কাজ-কর্ম সরকারি ভাষা, রাজ্যের ভাষা অথবা ইংরেজীতে করা যায়। যদি কোনও সদস্য এই সমস্ত ভাষায় নিজেকে সম্যকভাবে প্রকাশ করতে অপারগ হন, সভাপতি তাঁকে মাতৃভাষায় বলার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন।

কেন্দ্রের সরকারি ভাষা ঃ

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা যে সব কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তার মধ্যে কঠিনতম ছিল আমাদের ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনও একটিকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া—এমন কি সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া। শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতা সূত্র অনুযায়ী (যা 343 অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা আছে) দেবনাগরি হরফে হিন্দিকে ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জাতিক আকারসহ ভারতের সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। অন্তত 15 বছর হিন্দির সঙ্গে ইংরেজি চালু রাখার কথা বলা হয়। তারপর বিশেষ কারণে প্রয়োজন বোধ করলে সংসদ আইন করে ইংরেজি অথবা দেবনাগরি হরফে সংখ্যা ব্যবহার করতে পারে।

344 অনুচ্ছেদে পাঁচ বছর পরে এবং পরবর্তী কালে প্রতি দশ বছর অন্তর

একটি কমিশন গঠনের কথা বলা আছে। যে কমিশন (i) সরকারি কাজ-কর্মে হিন্দির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, (ii) সরকারি কাজে ইংরেজির ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা, (iii) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে ব্যবহারযোগ্য ভাষার নির্বাচন, (iv) সংখ্যা সূচকের রূপ, (v) কেন্দ্রের সরকারি ভাষা বিষয়ে অথবা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগকারী ভাষা সম্পর্কে—রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন সুপারিশ করবে। এই কমিশন ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অহিন্দিভাষী জনগণের দাবি ও স্বার্থের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাবে।

সংবিধানের 344 অনুচ্ছেদে সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে 30 জনকে নিয়ে এমন একটি কমিটি গঠন করার কথা বলা আছে, যে কমিটি এই কমিশনের সুপারিশগুলি পরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর নির্দেশের জন্য পাঠাবে। 349 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি এই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার পূর্বে ভাষা সংক্রান্ত কোনও বিল বা সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবে না। 1955 সালে প্রথম সরকারি ভাষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। 1956 সালে এই কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। সংসদের উভয় সভার সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি সেই রিপোর্ট পর্যালোচনার পর তাঁদের মতামত রাষ্ট্রপতিকে জনান এবং তিনি 1960 সালের 27 এপ্রিল একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক, আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির হিন্দি পরিভাষা এবং ইংরেজি থেকে হিন্দি অনুবাদের নির্দেশ দেন। প্রকৃত পক্ষে এই নির্দেশে দুটি কমিশন গঠিত হয়। একটি শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে, অন্যটি আইনমন্ত্রকের অধীনে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই নির্দেশে কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের (UPSC) পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি চালু রাখার কথা বলা হয়। পরে বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দি চালু হয়। সংসদীয় আইন প্রণয়ন অবশ্য ইংরেজীতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে প্রামাণ্য হিন্দি অনুবাদও দিতে হবে।

প্রথম সরকারি ভাষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংসদ 1963 সালে সংবিধানের 343 নং অনুচ্ছেদে সরকারি ভাষা আইন তৈরি করে। এই আইন বলে 15 বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার ও সংসদের সকল কাজ কর্মে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজীও চালু থাকবে।

কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দি প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে পরীক্ষার্থীদের অষ্টম তফসিলীতে বর্ণিত যে কোনও ভাষায় উত্তরপত্র লেখার অনুমতি দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ও যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা ঃ

প্রতিটি রাজ্যের সরকারি ভাষা এবং সরকারি পর্যায়ে আন্তঃরাজ্য যোগাযোগকারী ভাষার বিষয় নিয়ে 345 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনও রাজ্য আইন

করে রাজ্যে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা এবং হিন্দিসহ যে কোনও প্রকার বা সকল প্রকার সরকারি কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। যতক্ষণ অবধি তা না হচ্ছে ততদিন ইংরেজি চালু থাকতে পারে। কেন্দ্রের স্বীকৃত সরকারি ভাষাই বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগকারী সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু দুই বা ততোধিক রাজ্য নিজেদের মধ্যে হিন্দি ব্যবহার করতে সম্মত হয় (346 অনুচ্ছেদ)।

কোনও রাজ্যের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ যদি দাবি করে এবং রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে সমস্ত রাজ্যের জন্য বা নির্দিষ্ট কিছু অংশের জন্য সেই ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে পারেন।

1963 সালে সরকারি ভাষা আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্র ও অহিন্দিভাষী রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি এবং হিন্দি ও অহিন্দিভাষী রাজ্যসমূহের মধ্যে যোগাযোগের জন্য হিন্দির সঙ্গে ইংরেজি থাকবে।

উচ্চ আদালতসমূহ ও আইন বিষয়ক প্রমাণিক গ্রন্থের ভাষা ঃ

সংসদ আইন করে বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ও প্রতিটি হাইকোর্টের কাজ ইংরেজীতে চলবে। প্রতিটি বিলের প্রামাণ্য কাহিনী, সংশোধনী, আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নিয়ম-বিধি, উপ-বিধি প্রভৃতি কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে ইংরেজিতে লেখা হবে। অবশ্য কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে হাইকোর্টের কার্যবিবরণী হিন্দি অথবা রাজ্যের কোনও সরকারি ভাষায় লিখবার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে বিচার, হুকুম বা রায় অবশ্যই ইংরেজীতেই প্রকাশ করতে হবে। (348 অনুচ্ছেদ)

1963 সালের সরকারি ভাষা আইনে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বে সমস্ত আইন ইত্যাদির হিন্দি অনুবাদ অবশ্যই প্রামাণ্য হওয়া উচিত এবং প্রতিটি বিল ও সংশোধনীর অবশ্যই হিন্দি তর্জমা থাকবে।

1963 সালের ঐ আইনে রাজ্যেব আইনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিন্দি তর্জমার কথা বলা হয়েছে। হাইকোর্টের রায় ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই আইনে হিন্দি বা অন্য কোনও সরকারি ভাষার ঐচ্ছিক ব্যবহারের কথা বলা আছে, যদি ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল পূর্বেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে রায়ের ইংরেজী তর্জমা অবশ্যই দিতে হবে।

জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের ভাষা ঃ

সংবিধানের 350 অনুচ্ছেদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। শুধুমাত্র নাগরিক নয়, ভারতের যে কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রে ও রাজ্যে প্রচলিত যে কোনও

ভাষায় কেন্দ্র বা রাজ্যের যে কোনও আধিকারিকের কাছে তাঁর অভিযোগ জানাতে পারেন। সরকারি ভাষায় অভিযোগ করা হয়নি এই অজুহাতে কোনও সরকারি দপ্তর, সংগঠন বা আধিকারিক অভিযোগ ফিরিয়ে দিতে পারেন না।

হিন্দির বিকাশ ঃ

351 অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্র হিন্দি ভাষার উন্নতিকল্পে প্রচার, প্রসারের জন্য দায়বদ্ধ—যাতে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মাধ্যম হিসাবে হিন্দির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দুস্থানী সহ অষ্টম তফসিলীভুক্ত যে কোনও ভারতীয় ভাষার রীতি শৈলী, প্রকাশ ভঙ্গী ব্যাহত না করে প্রয়োজন বোধে প্রধানত সংস্কৃত থেকে বা অন্য যে কোনও ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে, হিন্দি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

ভাষা সংক্রান্ত 343, 344, 351 অনুচ্ছেদগুলি একসঙ্গে পড়লে সহজেই বোঝা যায় এর মূল কথা—হিন্দি ভাষার প্রসার, উন্নতি বিধান এবং সরকারি কাজে ও যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ক্রমশঃ ভাষাটিকে চালু করা। 15 বছর পরেও ইংরেজি ব্যবহার করা হলেও 351 অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করা হয় না। সংবিধানের 343 অনুচ্ছেদে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কোনও কারণে ইংরেজী চালু রাখতে হলে তার উল্লেখ করে—হিন্দির অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় বক্তব্য রাখলেই চলবে। (*কেন্দ্র বনাম মুরাসোলী,* AIR 1977 SC 225), *দালাভি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য* মামলায় (AIR 1976 SC 1559) হিন্দি বিরোধী বিক্ষোভকারীদের, রাজ্য সরকার যে পেনসন মঞ্জুর করেন, সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেন। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, যে রাজ্য সরকার 351 অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছেন, কারণ তাঁরা হিন্দি প্রসারে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে হিন্দি বিরোধী আবেগকে উস্কানি দিচ্ছেন।

সংবিধানের প্রামাণ্য হিন্দি অনুবাদ ঃ

সংবিধানের 56 তম সংশোধনীতে 394A অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। হিন্দি ভাষায় প্রামাণ্য সংবিধান রচনার কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রামাণ্য হিন্দি সংবিধান প্রকাশিত হয়েছে।

অষ্টম তফসিল ঃ

হিন্দি ছাড়া আমাদের সংবিধান অন্য ভাষাসমূহকেও স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেই ভাষাগুলির উন্নতির প্রয়োজন স্বীকার করেছে। অষ্টম তফসিলে 18টি ভাষার উল্লেখ আছে ঃ অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মিরী, কোঙ্কানী, মালায়লম, মণিপুরী, মারাঠি, নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু।

একুশ

সংবিধান সংশোধন

অংশ XX অনুচ্ছেদ 368

সংবিধানের 368 অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে সংশোধন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সংসদ সাংবিধানিক শক্তির ধারক। 368 অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের বেশ কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যার ফলে সহজেই বোঝা যায় আমাদের সংসদের শুধুমাত্র আইন তৈরি করার গতানুগতিক ক্ষমতা নয়, বেশ কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতাও আছে। প্রথমত, সংসদের যে কোনও কক্ষে একটি বিল উত্থাপন করেই সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবনা করা হয়। যার অর্থ এ বিষয়ে সংসদের একচ্ছত্র ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংসদের বিশেষ সংখ্যাধিক্যে অর্থাৎ উভয় সভার উপস্থিত এবং ভোটে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে সংবিধানের সংশোধন করা যায়। সামান্য কয়েকেটি ক্ষেত্রে (যেমন সপ্তম তফসিলভুক্ত বিষয়সমূহ, সংসদে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, 368 অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশোধনী প্রভৃতি) সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভের পর বিলটিকে রাজ্যের আইনসভাগুলির অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। রাজ্য আইনসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সমর্থন প্রয়োজন হয়। তৃতীয়ত, যথাবিহিত ভাবে গৃহীত সংবিধান সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি বাধ্যতামূলক। সাধারণ আইন সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতি সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন বা স্বাক্ষর দান স্থগিত রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি তা পারেন না। সবশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়,

আমাদের সংসদ, সংবিধানের যে কোনও অংশই সংশোধন করতে পারে। এবং এই ধরনের সংশোধন নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না, যদি না সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করার কোনও চেষ্টা হয়।

1950 থেকে 1972 সালের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন মামলায় মৌলিক অধিকার সংশোধনের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য আসে, যেমন *শঙ্করী প্রসাদ বনাম ভারত সরকার* (AIR 1951 SC 458); *সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান সরকার* (AIR 1965 SC 845) এবং *গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য* (AIR 1967 SC 1643) গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পূর্বে, আইন ছিল নিম্নরূপ ঃ

i সংবিধান সংশোধনী আইন সাধারণ আইন নয়। সংসদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বলেই সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। সাধারণ আইন অপেক্ষা এগুলি অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সংবিধান সংশোধনের জন্য কোনও গণপরিষদ নেই। সংসদের উপরে সেই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। (পরবর্তীকালে 1981 সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন 368 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন, সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত আইনগত ক্ষমতার অতিরিক্ত। *শশাঙ্ক বনাম কেন্দ্র* AIR 1981 SC 522)।

ii সংশোধনী ক্ষমতার কোনও সীমারেখা টানা হয়নি। অর্থাৎ যে কোনও অনুচ্ছেদই সংশোধন করা যায়। 368 অনুচ্ছেদ সর্বজনীন এবং কোনও রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদকে দিয়েছে।

iii সংবিধানের তৃতীয় অংশে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারও সংসদের সংশোধনী ক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত।

গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 6-5 গরিষ্ঠতায় তার পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রায় দেন যে, সংবিধানে গৃহীত মৌলিক অধিকারসমূহ পরিবর্তনাতীত। এবং 368 অনুচ্ছেদে সংশোধনের পদ্ধতির কথাই বলা হয়েছে। এবং সংসদের মূল আইনগত ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনও ক্ষমতাই সংসদকে 368 অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, একটি সংবিধান সংশোধনী আইন, সংবিধানের 13 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন মাত্র। সেজন্য 368 অনুচ্ছেদে সংসদকে মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত করা বা হরণ করার কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি।

1973 সালে *কেশবানন্দ বনাম কেরালা রাজ্য* মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (AIR 1973 SC 1461) গোলকনাথ মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করেন। 13 জন বিচারকের মধ্যে 10 জনের অভিমত 368 অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন করা যায় এবং 13(2) অনুচ্ছেদে 'আইনের' সংজ্ঞায় সংবিধান সংশোধন পড়ে না। ফলে, গোলকনাথ মামলার রায় বাতিল হয়ে যায়। 368 অনুচ্ছেদে ক্ষমতা অসীম এবং সর্বব্যাপী কি-না,

এই প্রশ্নে অধিকাংশ বিচারপতি (সংখ্যায় *7জন*) মনে করেন, 368 অনুচ্ছেদে সংশোধনী ক্ষমতার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা আছে। 7-6 সংখ্যাধিক্যে আদালত রায় দেন, "368 অনুচ্ছেদে সংসদ সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না।" তবে মূল কাঠামো বলতে কী বোঝায় তার উল্লেখ করা হয়নি এবং অদ্যাবধি জানা যায়নি।

কেশবানন্দ মামলায় এই রায়ের পর 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 368 অনুচ্ছেদে 4 এবং 5 ধারা সংযোজিত হয়। যার ফলে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে সংসদের "মূল বৈশিষ্ট্যের" যে সীমাবদ্ধতা ছিল তা তরলীভূত হয়। এই ধারাগুলিতে বলা হয়েছে — প্রথমত 368(1) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের কোনও সীমারেখা নেই এবং দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনী আইন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় নয় কোনও অবস্থাতেই। কিন্তু "মূল কাঠামো" তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় স্বীকার করেন, *মিনার্ভা মিল্স বনাম কেন্দ্র* মামলায়। (AIR 1980 SC 1789) ধারা 4 ও 5 বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট অভিমত দেন এই সংশোধনী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা - যা মূল বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত — তাকে অস্বীকার করে।

মূল বৈশিষ্ট্যের বর্তমান অবস্থা হল — যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ-বেঞ্চ কেশবানন্দ মামলার রায় পরিবর্তন না করছেন ততক্ষণ সংবিধানের যে কোনও সংশোধনীই, 'কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্যে ব্যাখ্যাত ঘটাচ্ছে', এই কারণে আদালতের হস্তক্ষেপযোগ্য।

কেশবানন্দ মামলায় বিচারপতি সিক্রি (প্যারাগ্রাফ 302) সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে তালিকাভূক্ত করার চেষ্টা করেন ঃ

1. সংবিধানের উৎকর্ষতা
2. সরকারের প্রজাতন্ত্রী বা গণতান্ত্রিক রূপ
3. সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা
4. ক্ষমতা বিভাজন
5. সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র।

ওই একই মামলায় বিচারপতি হেগড়ে ও বিচারপতি মুখার্জি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও একতা, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সংবিধানের মূল কাঠামো বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন একটি হিতসাধক রাষ্ট্র ও সামাজিক রাজনীতিক সমতাবাদী সমাজ গড়ার যে ঘোষণা তা থেকে সরে আসার কোনও ক্ষমতা সংসদের নেই (682 প্যারাগ্রাফ)। বিচারপতি খান্না আরও বলেন, সংসদ একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বৈরতান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত করতে পারে না। এমন কি লোকসভা ও

রাজ্যসভার অবলুপ্তিকেও অনুমোদন করা যায় না। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে একই ভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না (1437 প্যারাগ্রাফ)।

ইন্দিরা নেহরু গান্ধী বনাম রাজনারায়ণ মামলায় (AIR 1975 SC 2299, অনুচ্ছেদ 55–213) বিচারপতি চন্দ্রচূড় সংবিধানের মূল কাঠামো হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উল্লেখ করেন ঃ

1. ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
2. মর্যাদা ও সুযোগের সমান অধিকার
3. ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিবেকের স্বাধীনতা
4. আইনের শাসন

মিনার্ভা মিল্‌স মামলায় ঐ একই বিচারপতি 'সংসদের সংশোধনী ক্ষমতা', 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' এবং 'মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে সমতা' কে সংবিধানের মূল কাঠামোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপাদানকে মৌলিক উপাদান হিসাবে স্বীকার করতে বিচারপতিদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। যেমন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে প্রধান বিচারপতি রায় মৌলিক উপাদান বলে মনে করতেন না কিন্তু বিচারপতি খান্না বিষয়টিকে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনে করতেন (*ইন্দিরা নেহরু গান্ধী* মামলা প্যারাগ্রাফ 55–213)। বিচারপতি চন্দ্রচূড় সংবিধানের মুখবন্ধের মধ্যে কোনও মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করতেন না (665 প্যারা) অথচ বিচারপতি বেগ মনে করতেন সংবিধানের মুখবন্ধের মধ্যেই তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিহিত আছে (623 প্যারা)। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে কি নীতি হবে সে সম্পর্কে মুখবন্ধের মধ্যেই ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

অতএব এটা পরিষ্কার যে এই প্রশ্নে বিচারপতিদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে এবং সংবিধানের বহু বিশেষ ধরনের মৌলিক প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন বিচারপতি সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বলে যে তালিকা দিয়েছেন আদালত তা অস্বীকার করেননি। *ইন্দিরা নেহরু গান্ধী* মামলায় বিচারপতি চন্দ্রচুড় রায় দেন "মূল বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নটি বিশেষ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে। বিমূর্তভাবে নয়, নির্দিষ্ট সমস্যার নিরিখে।" (2465 প্যারা)।

1950 সালে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর 74 টি সংবিধান সংশোধন কার্যকর হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই সংসদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেই হয়েছে।

সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে বা খুব ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়েছে, এই প্রশ্নে মতপার্থক্য আছে। নেহরু বলেছিলেন, একটি সংবিধান যত ভালই হোক—সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। তাই কাজ করতে করতে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি দূর করার জন্য সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন হয়। (সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অধ্যায় দেখুন)।

বাইশ

পঞ্চায়েতি রাজ

অংশ IX ও IXA, অনুচ্ছেদ 243—243 ZG

সংবিধানের 7তম (1992) ও 74তম (1992) সংশোধনীর ফলে সংবিধানে দুটি নতুন অংশ — IX ও IXA সংযোজিত হয়েছে। এই দুইটি অংশে, 34টি নতুন অনুচ্ছেদ — 243 থেকে 243 ZG — এবং দুটি নতুন তফসিল (11 ও 12) আছে। 73তম সংশোধনীটি পঞ্চায়েতগুলিকে ও 74তম সংশোধনটি পৌরসভাগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলি অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের বহু অংশে আঞ্চলিক নিজস্ব সরকার ও পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা — এই প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে তার কার্যকলাপ চালাতে পারছিল না। উচ্চতর প্রতিষ্ঠান প্রায়শই তাদের দমিয়ে দিচ্ছিল। সংবিধানের এই সংশোধনী দুটি দেশের রাজনৈতিক গঠনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছে।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংবিধানের ছত্রচ্ছায়ায় এসেছে। সংশোধনের ফলে রাজ্যের আইনসভাগুলির উপর সংবিধান অনুসারে নিজস্ব আইন তৈরি করার দায়িত্ব বর্তেছে, যাতে তারা পঞ্চায়েত, পৌরসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুগঠিত করতে পারে। প্রতিটি রাজ্যে গ্রাম, জেলা ও মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য যে সব রাজ্যের জনসংখ্যা 20 লক্ষের কম, তাদের মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত গঠন না করলেও চলবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল — পঞ্চায়েতগুলিকে আগের মতো

স্থগিত রাখা বা দমিয়ে দেওয়া চলবে না; কোনও পঞ্চায়েত সভাকে বাতিল করার ছ' মাসের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি পঞ্চায়েতে মহিলা এবং তফসিলী জাতি-উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের কার্যকালের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট ক্ষমতার গণ্ডিকে প্রতিটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব বাজেট, কর বসানোর অধিকার ও আরও কিছু ক্ষমতা থাকবে। নিজস্ব এলাকায়, পঞ্চায়েতের হাতে নিজস্ব উন্নতির পরিকল্পনা গড়ার ও তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দিতে হবে। প্রতিটি রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন রাজ্য নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করতে হবে, যার কাজ হবে পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করা।

একই ভাবে 74তম সংশোধনীতে নগরপালিকা ও নগর পঞ্চায়েত গঠনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণ, নির্বাচন, কর বসানোর ক্ষমতা, উন্নতির পরিকল্পনা, অর্থ কমিশন গঠন, নির্দিষ্ট সময় সীমা ইত্যাদি বিষয়ে 73তম সংশোধনীর মতোই নানা আদেশ লিপিবদ্ধ আছে।

সব রাজ্যই সংবিধানের আদেশ মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করেছে। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে নবনির্মিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র গঠনের পথে দিশারী হবে এবং মানুষের হাতে পৃথক ক্ষমতা অর্পণ করবে।

তেইশ

বিবিধ, অস্থায়ী এবং বিশেষ ধারা

অংশ XVI, XIX, XXI, XXII

অনুচ্ছেদ 330-342, 361-367, 369-392

কয়েকটি শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির জন্য সংবিধান কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে নিয়ে আসা যায়। এজন্য তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয় এবং আইনসভায় কিছু আসন এবং সরকারি চাকরিতে তাদের জন্য সংরক্ষণ নীতি চালু আছে।

সংবিধান তফসিলী জাতি-উপজাতির কোনও সংজ্ঞা দেয়নি। প্রতিটি রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের তফসিলী জাতি-উপজাতি নির্দিষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। বস্তুত বিভিন্ন রাজ্যের তফসিলী জাতি-উপজাতি ঠিক করে রাষ্ট্রপতি বেশ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সংবিধানের 341-342 অনুচ্ছেদ বলে সংসদ এই সমস্ত নির্দেশের বেশ কিছু সংশোধনও করেছে।

বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়ে 334 অনুচ্ছেদ তফসিলী জাতি-উপজাতিদের জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া সংবিধান কার্যকর হওয়া থেকে 50 বছর পর্যন্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এই অনুচ্ছেদের আছে। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তফসিলী

জাতি-উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়। যদি দেখা যায় আইনসভায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব নেই, তবে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় ঐ সম্প্রদায় থেকে সর্বাধিক দুজনকে এবং রাজ্যপালগণ রাজ্য বিধানসভায় একজনকে মনোনীত করতে পারেন (331-334 অনুচ্ছেদ)। আসন সংরক্ষিত হলেও নির্বাচকমণ্ডলী কিন্তু জাতি ধর্ম সম্প্রদায় ব্যতিরেকে সাধারণ নাগরিক। 'আসন সংরক্ষণ নীতি' স্বল্প সময়ের জন্য ভাবা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে তফসিলী জাতি-উপজাতিভুক্ত মানুষ উন্নতি লাভ করে সাধারণ মানুষের মানে উন্নীত হবে। যাই হোক, যতবার সংরক্ষণের মেয়াদ শেষ হয়েছে সরকার ততবারই সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারার পরিবর্তন করে পুনরায় তার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন (334 অনুচ্ছেদ)। সর্বশেষ মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে 62 তম সংশোধনীর মাধ্যমে, 50 বছর—অর্থাৎ 2000 সাল পর্যন্ত।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক যোগ্যতার অবমূল্যায়ন না করে 335 অনুচ্ছেদে তফসিলী জাতি-উপজাতিদের দাবি বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। 338 অনুচ্ছেদে তফসিলী জাতি-উপজাতিদের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

340 অনুচ্ছেদ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের জন্য একটি কমিশন গঠন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। সামাজিক ভাবে এবং শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী সম্পর্কে অনুসন্ধান, এবং অসুবিধা দূর করে তাদের উন্নতির পন্থা সুপারিশ করা — এই কমিশনের কাজ। সুপ্রিম কোর্টের মতে জাতিভেদের মতো বিভিন্ন কারণে মানুষ পিছিয়ে পড়ে — কিন্তু শুধু জাতির ভিত্তিতে বিভাজন করলে তা কখনই আইনসম্মত হবে না। (*জানকী প্রসাদ বনাম জম্মু ও কাশ্মীর* AIR 1973 SC 930) অতি সম্প্রতি মণ্ডল মামলায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সুপ্রিম কোর্ট চাকুরির ক্ষেত্রে শতকরা 27 ভাগ সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। তাছাড়া, পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে উন্নত এবং বাছাই করা অংশকে সংরক্ষণের বাইরে রাখার নির্দেশ দিয়ে, মহাধর্মাধিকরণ বলেন, কোনও অবস্থাতেই সংরক্ষণ শতকরা 50 ভাগের বেশি হবে না। (মৌলিক অধিকার অধ্যায় দেখুন)

বিবিধ ব্যবস্থা

সংবিধানের 361 অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ কিছু সুবিধা ভোগ করেন। তাঁরা তাঁদের সম্পাদিত কাজের জন্য আদালতের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। কার্যকালের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ করা যায় না, আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি বা জেলে পাঠাতে পারে না। এমন কি ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন কোনও কাজের জন্য দেওয়ানি অভিযোগ আনতে হলে অন্ততঃ দু'মাস আগে সে ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ আনতে হবে।

রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল পদের মর্যাদা ও সম্মান উঁচুতে তুলে ধরাই এই অনুচ্ছেদের লক্ষ্য। তাঁরা সংবিধানের অভিভাবক, ক্ষমতার প্রতীক এবং দেশের ও রাজ্যের সম্মানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংবিধানের 61 অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদে রাষ্ট্রপতির অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁকে 'পদচ্যুত' করা যায়। রাজ্যের রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর নিজেদের পদে থাকতে পারেন।

44 তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 361A অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হয়। এই অনুচ্ছেদে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার কার্যবিবরণী প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আইনসভার কার্যবিবরণী বিশেষ অধিকারের আওতায় পড়ে। তাই নির্দিষ্ট আইনসভার অনুমতি ব্যতীত তা প্রকাশ করা যায় না। 361A অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে গোপন অধিবেশন ব্যতীত যে কোনও অধিবেশনের কার্যবিবরণী সৎ উদ্দেশ্যে, যথাযথ ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হলে — কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এই সংরক্ষণ আকাশবাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভারত সরকার বা তার পূর্ববর্তী কোনও সরকারের সঙ্গে রাজন্য শাসিত কোনও রাজ্যের সন্ধি-চুক্তিকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধ দেখা দিলে, আদালতের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 363 অনুচ্ছেদে। 363A অনুচ্ছেদে রাজন্যভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বিলোপ আইনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 364 অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি বড় বড় বন্দর ও বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন।

365 অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করে, তবে রাজ্য সরকার সংবিধান অনুযায়ী সরকার চালাতে অসমর্থ এ কথা রাষ্ট্রপতির মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে এবং তিনি "শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা" ঘোষণা করে 356 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে পারেন (জরুরী অবস্থার অধ্যায় দেখুন)।

366 অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা বিষয়ক ধারা বলা যায়। সংবিধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ এবং পদের ব্যাখ্যা এখানে করা হয়েছে। 367 অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধারাকে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে কোনও আইনের ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল অধ্যাদেশ জারি করে দিতে পারেন। সংবিধানে "বিদেশি রাষ্ট্র" বলতে ভারত ছাড়া যে কোনও রাষ্ট্রকে বোঝায়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে কোনও রাষ্ট্রকে বিদেশি রাষ্ট্র নয় ঘোষণা করতে পারেন।

অস্থায়ী পরিবর্তনকালীন এবং বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কিছু অস্থায়ী এবং পরিবর্তনকালীন ব্যবস্থা ছিল, যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, 369 অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের বিষয়ে

সংসদের আইন করার ক্ষমতা 5 বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে 373 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এক বছরের জন্য সীমাবদ্ধ।

"জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা" সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে সর্বাধিক বিতর্কিত — যা 370 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদের জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে আইন করার ক্ষমতা সংযোজিত বিষয়ের দলিলে উল্লিখিত বিষয়েই সীমাবদ্ধ। তবে রাজ্যের সম্মতিতে যে কোনও বিষয়ে এই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত করা যায়।

নাগাল্যান্ড, আসাম, মণিপুর, অন্ধ্র প্রদেশ, সিকিম, গোয়া, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে 371 এবং 371(1) অনুচ্ছেদে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত বা ভিন্ন ধরনের সংবেদনশীলতাকে সন্তুষ্ট করা এবং স্থানীয় মানুষের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্ম ও সামাজিক প্রথা, সম্পত্তির মালিকানা, প্রথাগত আইন প্রভৃতি বিষয়ে সংসদে গৃহীত কোনও আইন নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালের কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে।

372 অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রচলিত আইনসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। 372A অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি প্রাক্-সংবিধান সময়ের কোনও আইনকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। 374 থেকে 378A অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি সংক্রান্ত বিষয়, বকেয়া বিষয়াদি, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহা হিসাব পরীক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে, লোকসেবা আয়োগ, অন্ধ্র বিধানসভার মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

392 অনুচ্ছেদে সংবিধান প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে তা দূর করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে।

চব্বিশ

সংবিধানের কর্ম পদ্ধতি ও পর্যালোচনার প্রস্তাব

ভারতের অতীত, আয়তন ও প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে, গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও গঠন করা সহজ কাজ ছিল না। যে ব্যবস্থা আমরা চূড়ান্তভাবে পেয়েছি তাকে গণতন্ত্র, সমতাবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ, আইনের শাসন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব অর্পণকারী একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ, গতিশীল, আধুনিক সংবিধান বলা যায়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করার জন্য পরিকল্পিত উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে, দরিদ্র ও নিপীড়িতদের অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে, কৃষিতে বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে, বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়তে, শিল্পের ক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করা হয়।

প্রভূত সাফল্য এসেছিল — প্রায় 600 করদ রাজ্যের সংহতি, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সহ ভূমি সংস্কার, ভারতের পর্তুগিজ ও ফরাসি উপনিবেশের স্বাধীনতা, হায়দরাবাদ ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ভারতে সংযুক্তি, দুই প্রতিবেশীর একাধিক আগ্রাসন প্রতিহত করা, জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — এই দুই মুখ্য নীতি-ভিত্তিক অর্থবহ পররাষ্ট্রনীতির বিকাশ (একসময় 100-এর অধিক দেশ ভারতের দর্শন ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করা, একাধিকবার শান্তিপূর্ণভাবে এক দল থেকে অন্য দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশী বিদেশী অশুভ শক্তির চাপ, বলপ্রয়োগ, উৎপীড়নের মোকাবিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল (i) জাতির ঐক্য ও

সংহতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখা (ii) ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। চারপাশে তাকিয়ে দেখলে এই সাফল্যগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা বিশ্বে খুব কম দেশই আছে, যেখানে কার্যকরী গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা টিকে আছে। আমরা ন্যায্যত গর্ব অনুভব করতে পারি যে কিছু সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, যখন যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য থেকে সেগুলির সমাধান করেছি বা করার চেষ্টা করেছি।

কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। বর্তমান মোটেই আনন্দদায়ক নয়, বিশেষত যখন আমরা চিন্তা করি জীবনের সব ক্ষেত্রে সব পেশায় মূল্যবোধের অভাব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতপাতের হিংস্রতা, ভাষাগত, জাতিগত, এলাকা-ভিত্তিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, নির্বাচনে অর্থ ও পেশীশক্তির ব্যবহার (প্রধানমন্ত্রী রাও-এর কথায় "অপরাধীদের রাজনীতিকরণ" এবং "রাজনীতির অপরাধকরণ"), কিছু আইনসভায় যা ঘটছে, এবং জাতপাতের লড়াই ও সাম্প্রদায়িকতার মতো ঐক্যনাশক, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলি যত্র তত্র তাদের কুৎসিৎ ফণা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

যে কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে মূল সমস্যা দুটি — (i) স্থিতিশীলতা ও (ii) দায়িত্ববোধ। এই ব্যবস্থা যে সরকারের জন্ম দেয়, সেই সরকারের উচিত — নিরাপত্তা, জনগণের মঙ্গল ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও স্থিতিশীলতা — উপভোগ করা। আর যাদের শাসন করার জন্য ডাকা হবে তাদের উচিত —জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া।

সংবিধানের স্থপতিদের স্বেচ্ছাচারী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ছিল। এই ব্যবস্থা জনগণের আশা -আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন বা দাবিগুলির প্রতি নিস্পৃহ ছিল। ভারতের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোনও সংস্থার প্রতি, এই ব্যবস্থার কোনও দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা ছিল না। প্রশাসকদের দায়িত্ব ও প্রশাসনের দায়বদ্ধতাকে অতি মূল্যবান মনে করা তাই প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

তাই তাঁরা মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতা সহ সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এমন পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারেননি, যেখানে মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতার অর্থ জনগণের প্রতি কোনও দায়িত্ব পালন না করা, বা যেখানে এই ধারণা অসহায়ভাবে সরকারকে, ঐ মহান কক্ষের পরিবর্তনশীল দলীয় আনুগত্য বা অস্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

দলত্যাগ বিরোধী বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলা না থাকলেও এটা বলা যায়, এই বিলের অন্যতম প্রেরণা ছিল সরকারের অস্থিরতার প্রবণতাকে রোধ করা। কেন্দ্রীয় স্তরে কিছু সময়ের জন্য এই বিল সফল হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যস্তরে বা পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় স্তরের কাহিনী ভিন্নতর।

দলত্যাগ বিরোধী আইন দলত্যাগ বিরোধে ব্যর্থ হয়েছিল। এই কাজ তাদের করতে হচ্ছিল গোষ্ঠী গঠন করে, যাতে সংযুক্তি বা ভাঙন বলে তাদের কাজ পরিগণিত হয়। উপরন্তু দশম তফসিল, সদস্যদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার— ভোট দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে দলত্যাগ বিরোধী বিল পাশ হওয়ার পর জনতা দলের ভাঙন প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ পাতিল মন্তব্য করেন, সাংসদরা তাঁদের পছন্দমতো ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করেন না — যে স্বাধীনতা সংসদের বাইরে প্রতিটি নাগরিকের আছে। সাংসদরা শুধুমাত্র তাঁদের পার্টির নির্দেশমতো ভোট দিতে পারেন। অন্যথায় তাঁরা তাঁদের আসন হারাতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে প্রশাসন, মুখ্য প্রশাসক রাষ্ট্রপতির মতো স্থিতিশীল। রাষ্ট্রপতি 4 বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ছাড়া তাঁকে অপসারণ করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টের কোনও কক্ষের কাছে দায়বদ্ধ না থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন 4 বছর অন্তর জনগণের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ থাকে।

ফরাসিরা বিভিন্ন ধরণের সরকারের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে। মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতা সহ সংসদীয় ব্যবস্থার ওপর অনপসরণীয় মুখ্য প্রশাসক রূপে, রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি ব্যবস্থা আরোপিত করা যায়, এমন একটি ব্যবস্থা ফরাসিরা গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী সহ একটি মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে আর জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, 7 বছরের জন্য। জয়লাভের জন্য তাঁকে প্রদত্ত ভোটের শতকরা 50 ভাগের বেশি ভোট পেতে হয়।

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধনকারী ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসকদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে বহু ত্রিশঙ্কু সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা, সংখ্যালঘু সরকার ও ঘন ঘন সাধারণ নির্বাচনের ঘটনাবলী, স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীলতার পক্ষে গভীর শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরনল্ড টোয়েনবিকে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল "গণতন্ত্র এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে বাছতে হলে আপনি কোনটি পছন্দ করবেন?" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জবাব দিয়েছিলেন "এ বাছাই খুবই মর্মান্তিক, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তা হবে স্থিতিশীলতা।" এই উপদেশ সত্ত্বেও আমরা ভারতীয়রা দায়িত্ববোধের উপাদানকে লঘু করতে চাই না। তাই চালু সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে আরও বেশি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাই হবে আমাদের কাজ। অন্য সমস্ত কারণ ব্যতীত নির্বাচন একটি বিপুল ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া বলে দেশ ঘন ঘন নির্বাচনের বোঝা বহন করতে অপারগ — এ বিষয়ে সবাই মনে হয় একমত হবেন।

সংবিধান পুনর্বিবেচনার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ সহ

অন্যরাও রেখেছেন। সব প্রস্তাবই যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমর্থনযোগ্য তা নয়, কিন্তু সাংবিধানিক বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনার উদ্দীপক হতে পারে এগুলি। কিছু প্রস্তাবের সারমর্ম এখানে দেওয়া যেতে পারে।

1 অস্থিরতা রুখতে যখন দলত্যাগ বিরোধী বিল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে তখন এই বিল সম্পূর্ণভাবে কেন বাতিল করা হবে না? দেখতে হবে এমন কোনও সংশোধনী পাওয়া যায় কি-না — যার মাধ্যমে দায়িত্বশীলতাকে লঘু না করেও সরকারের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যায়। তাহলেই দশম তফসিল অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।

2 জার্মান রীতি অনুসরণ করে মন্ত্রিপরিষদের প্রতি গঠনমূলক অনাস্থা ভোটের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। এমন পরিস্থিতিতে সংসদের কাজ হবে, বোঝা-স্বরূপ প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর উত্তরাধিকার ঠিক করা।

3 ভারতের মতো একটি দেশের বিপুল সমস্যা ঘন ঘন সরকাব বদল করে সমাধান করা যাবে না। বর্তমানে আইন মোতাবেক একটি অধিবেশনে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি মাত্র অনাস্থা প্রস্তাব তোলা যায়। এক বছরে একটির বেশি অনাস্থা প্রস্তাব তোলা যাবে না এমনভাবে আইন করা যেতে পারে।

4 অকার্যকরী দশম তফসিলকে সংবিধান থেকে বাদ দিলে, সদস্যদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বড়জোর অনাস্থা প্রস্তাব, আর্থিক ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্নে কেবলমাত্র হুইপ জারি করা যেতে পররে। কেবলমাত্র অনাস্থা প্রস্তাব, নীতিগত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থ বিল বা সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের দাবির ওপর গৃহীত ভোটে পরাজিত হলে সরকারের পরিবর্তন হতে পারে।

5 কোনও মন্ত্রিসভা যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারায় অথবা কোনও দল যদি স্থায়ী সরকার গঠনে অসমর্থ হয়, রাষ্ট্রপতি জাতীয় সরকার গঠনে উদ্যোগী হতে পারেন। উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সংসদ বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে এই সরকার গঠিত হবে এবং নির্বাচিত সাংসদরা যতক্ষণ না স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবেন ততক্ষণ এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

6 রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীর নিয়োগ — বর্তমানে চালু এই ব্যবস্থার পরিবর্তে, সংসদের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতায়, সম্পূর্ণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা যেতে পারে। একইভাবে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদদের সম্মতিতেই এই সরকারকে অপসারণ করা যেতে পারে।

7 দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য এমন হতে পারে — সম-মনোভাবাপন্ন দলগুলিকে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে, একত্রিত হতে হবে এবং সম্মিলিত সরকার গঠন করতে হবে।

8 দেশ শাসনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংগঠনে গণতান্ত্রিক হতে হবে। এই দলগুলির, আইনের

সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হওয়ার প্রয়োজন আছে। কোনও রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে দলীয় সদস্যপদ সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে, দলে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে, দলের হিসাব—নিরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করতে হবে।

প্রদত্ত অপর প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ

- শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে একটা ছোট সংবিধান যা বিভিন্ন স্তরে আরও উচ্চমানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেবে।
- ধর্ম বর্ণ জাতি নারী পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে সকল নাগরিকের প্রতি সত্য সত্যই সম-মনোভাবাপন্ন হতে হবে।
- আমাদের দুর্বলতার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে পারে।
- কম বেশি একই আয়তনের 50 থেকে 60 টি ছোট ছোট রাজ্য, একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন সহ ত্রিস্তর বা চতুর্থস্তর বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা; শক্তিশালী কেন্দ্র এবং শক্তিশালী রাজ্যসমূহ।
- নির্বাচনকে আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তা অর্থবল ও বাহুবল মুক্ত করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার।
- রাজনৈতিক দলেব সংখ্যা কমানো, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে দলীয় ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, দলীয় তহবিলের সূত্র প্রকাশ, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি।
- কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে মন্ত্রী এবং সম পর্যায়ের পদাধিকারীর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কঠোর ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া।
- দলত্যাগীদেব কোনও সরকারিপদের অযোগ্য ঘোষণা করা।
- উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে আমলাতান্ত্রিকতার বাইরে নিয়ে আসা, পরিবার-পরিকল্পনার মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক জাতীয় ঐক্যমত গঠনের ব্যবস্থা করা উচিত।

□□

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

Agarwala, B.R.: *Our Judiciary*, New Delhi, 1993.

Aggarwala, K.B. and Raizada, R.K. (ed.): *Comparative Constitutionalism*, 1990.

Aiyer, V.R. Krishna: *A Constitutional Miscellany*, Lucknow, 1986.

—— :*Constitutional Challenge and Democratic Response*, Dharwad, 1985

Anand, C.L.: *Constitutional Law and History of Government of India*, 6th edn., 1990.

Anandam, M.: *Tryst with Destiny*, New Delhi, 1975.

Austin, Granville: *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Bombay, Oxford, 1985.

Awasthy, S.K.: *Constitution of India*, Allahabad, 1993.

Bakshi, P.M.: *The Constitution of India*, Delhi, 1991.

Bakshi, P.M. and Jaswant Singh: *The Constitution of India*, Vol.I (Preamble to article 193), Madras Law Journal Office, Madras, 1991.

Banerjee, A.C.: *Indian Constitutional Documents*, 4 Vols., 3rd edn., 1961.

Basu, D.D.: *Commentary on the Constitution of India*, 7th edn., 1993.

—— :*Commentary on the Constitution of India*, Vols. A to R, Calcutta, 1978-1988.

—— :*Comparative Constitutional Law*, New Delhi, 1984.

—— :*Constitutional Law of India*, 6th edn., New Delhi, 1991.

—— .*Introduction to the Constitution of India*, 14th edn., New Delhi, 1992.

—— :*Shorter Constitution of India*, 10th edn., New Delhi, 1988.

Beg, M.H.: *Impact of Secularism on Life and Law*, New Delhi, 1985.

Bhandari, M.K.: *Basic Structure of the Indian Constitution: A Critical Reconsideration*, New Delhi, 1993.

Bharatiya, V.P.: *Religion-State Relationship and Constitutional Rights in India*, 1987.

Chandrasekhara Rao, P.: *Indian Constitution and International Law,* Delhi, 1993.

Chandrasekhara Rao, R.V.B. and Prasad, V.S. (Ed.): *Indian Constitution and Polity,* New Delhi, 1991.

Chaturvedi, R.G. and Chaturvedi, M.S.: *Preamble of the Constitution,* Allahabad, 1989.

Chaudhari, A.S.: *Constitutional Rights and Limitations,* 2nd edn., Allahabad, 1990.

Chitaley, D.V.: *The Constitution of India,* AIR Commentaries, 2 Vols., 1970.

Coupland, R.: *The Constitutional Problem in India,* Madras, 1945.

De, D.J.: *New Dimensions of the Constitutional Law,* Calcutta, 1991.

Dhawan, Rajeev: *Amending Power under the Constitution of India—A Politico-legal Study,* Calcutta, 1990.

—— :*Justice on Trial: The Supreme Court Today,* Allahabad, 1980.

—— :*The Amendment, Conspiracy or Revolution,* Delhi, 1978.

Dhawan, Rajeev and Jacob, Alice (eds.): *Indian Constitution: Trends and Issues,* Bombay, 1978.

Diwan, Paras and Diwan, Piyushi: *Outlines of the Constitution of India,* New Delhi, 1991.

Doabia, H.S. and Doabia, T.S.: *Supreme Court on Constitution of India,* Agra, 1967.

Framework for the Future: A Case for a New Constitution for India, The Hague Foundation for Critical Choices for India, 1980.

Gajendragadkar, P.B.: *Secularism and the Constitution of India,* Bombay, 1971.

Ghosh, P.K.: *The Constitution of India: How it has been Framed,* Calcutta, 1966.

Glennon, Michael J.: *Constitutional Diplomacy,* Princeton, 1990.

Grover, Virendra (ed.): *The Indian Constitution,* New Delhi, 1990.

Gupta, S.N.: *Constitutional and International Law,* 1982.

Gwyer and Appadorai: *Speeches and Documents on the Indian Constitution,* Oxford, 1957, Vols. I & II.

Hamid, Abdul: *Constitutional Law: A Profile of Justice M Hidayatullah,* Vols. I & II, Jaipur, 1992.

Hari Chand: *Amending Process in the Indian Constitution,* Delhi, 1972.

Hegde, K.S.: *Directive Principles of State Policy in the Constitution of India,* New Delhi, 1972.

Haskar, K.N. and Panikkar, K.M.: *Constitutional Problems of Federal India*, Delhi, 1988.

Hidyatullah, M. (ed.): *Constitutional Law of India*, Vols. I & II, New Delhi, 1986.

—— :*Judicial Methods*, Delhi, 1970.

Ilbert, C.: *The Government of India*, Oxford, 1915.

Jacob, Alice (ed.): *Constitutional Developments since Independence*, Bombay, 1975.

Jain, M.P.: *Indian Constitutional Law*, Agra, 4th edn., 1993.

Jha, Chakradhar: *Judicial Review of the Legislative Acts*, Bombay, 1974.

Joshi, G.N.: *Aspects of Indian Constitutional Law*, Bombay, 1965.

Joshi, Ram and others: *The Indian Constitution and its Working*, 3rd edn., Hyderabad, 1986.

Kagzi, M.C. Jain: *The Constitution of India*, 5th edn., New Delhi, 1988, 2 Vols.

Kashyap, Subhash C.: *Anti-Defection Law and Parliamentary Privileges*, Bombay, 1995.

—— :*Delinking Religion and Politics*, New Delhi, 1993.

—— :*History of Parliamentary Democracy*, New Delhi, 1991.

—— :(ed.): *Indian Polity, Retrospect and Prospect*, New Delhi, 1989.

—— :*Our Parliament*, New Delhi, 3rd edn., 1995.

—— :*Jawaharlal Nehru, The Constitution and the Parliament*, New Delhi, 1990.

—— :(ed.): *Perspectives on the Constitution, Incorporating the Report of the I.I.C. Committee on the Constitution*, Delhi, 1993.

—— :(ed.):*Union-State Relations in India*, New Delhi, 1983.

—— :(ed.): *Reforming the Constitution*, New Delhi, 1992.

—— :(ed.): *Basic Constitutional Values*, New Delhi, 1994.

Khan, Rasheeduddin: *Federal India—A Design for Change*, New Delhi, 1992.

Khanna, H.R.: *Federal Element in the Indian Constitution*, Pune, Board of Extra Mural Studies, 1984.

—— :*Judicial Review or Confrontation*, Delhi, 1977.

—— :*Making of India's Constitution*, Lucknow, 1982 edn. Kogekar, S.V.: :*Revision of the Constitution*, Poona, 1976.

Lal J.: *The Constitution of India*, Allahabad, 1993.

Lijphart, Arend (ed.): *Parliamentary v. Presidential Government*, 1992.

Lok Sabha Secretariat: *Constituent Assembly Debates*, New Delhi, 1989.

—— :*Constitutional Amendment in India*, 5th edn., New Delhi, 1986.

Mahajan, V.D.: *Constitutional Law of India*, 7th edn., Lucknow, 1991.

Makkar, S.P. Singh and Hamid, Abdul (ed.): *Constitutional Law—A Miscellany*, Jalandhar, 1990.

Markandan, K.C.: *The Amending Process and Constitutional Amendments in the Indian Constitution*, New Delhi, 1992.

Mehta, S.M.: *Indian Constitutional Law*, 4th revised edn., New Delhi, 1990.

Mishra, Rajiva Ranjan: *The Making of the Indian Constitution*, Delhi, 1986.

Misra, Govind: *Constitutional Law of India*, New Delhi, 1993.

Mukharji, P.B.: *Three Elemental Problems of the Indian Constitution*, Delhi, 1972.

Munshi, K.M.: *Pilgrimage to Freedom—Indian Constitutional Documents*, Vols. I & II, Bombay, 1967.

Nakade, Shivraj B.: *Emergency in Indian Constitution*, New Delhi, 1990.

Palkhivala, N.A.: *Our Constitution—Defaced and Defiled*, 1974.

—— :*The Constitution and the Common Man*, Bombay, 1971.

—— :*We the People*, 1984.

—— :*We the Nation — The Lost Decades*, 1993.

Pandey, Jitendra and Dubey, R.K.: *Civil Liberties under the Constitution*, New Delhi, 1992.

Pandey, J.N.: *Constitutional Law of India*, Allahabad, 1993.

Pandey, Manoj and Kedia, Onkar: *Fundamentals of Indian Constitution*, New Delhi, 1993.

Pannikar, K.M.: *Communalism in India*, Delhi, 1992.

Rajashekhar C.: *Social Revolution and the Indian Constitution: Inter-relationship between Fundamental Rights and Directive Principles*, New Delhi, 1993.

Raju, Pataballa Sanyasi: *Constitutional Law v. The Legislatures*, Hyderabad, 1975.

Raman, Sunder: *Amending Power under the Constitution of India, A Politico-legal Study*, Calcutta, 1990.

Ramaswamy, M.: *The Constitutional Position of the President of the Indian Republic*, Bangalore, 1950.

Rathee, K.L. and Balakrishnan, S.: *A Critical Analysis of the (42nd) Constitutional Amendment*, 1976.

Ray, Amal and other: *Political Development and Constitutional Change*, New Delhi, 1986.

Reddy, P. Jagan Mohan: *A Constitution: What it is and What it Signifies*, Vishakhapatnam, 1983.

Saharay, H.K.: *Cases and Materials on the Constitution*, Pune, Board of Extra Mural Studies, 1989.

Santhanam, K : *Fundamental Rights and the Indian Constitution*, Ahmedabad, Harold Laski Institute of Political Science, 1969.

Sarkar, Amit: *Secularism and Constitutionality*, New Delhi, 1988.

Sarkar, R.C.S.: *The Constitution of India*, New Delhi, 1991.

Sathe, S.P . *Constitutional Amendments*, 1950-1988, 1989.

Sathe, Vasant: *National Government — Agenda for a New India*, New Delhi, 1991.

—— .*Two Swords in One Scabbard*, New Delhi, 1989.

Sayid Muhammad, V A. *Our Constitution — For Haves and Have-nots*, New Delhi, 1975

Seervai, H.M. *Constitutional Law of India — A Critical Commentary*, 4th edn , Bombay, 1991 (3 Vols.).

Sengupta, Pradip Kumar: *India. Constitutional Polity*, Allahabad, 1991.

Setalvad, M.C . *Union and State Relations under the Indian Constitution*, 1974.

Sharma, B R *Socio-economic Justice under Indian Constitution*, New Delhi, 1984.

Sharma, G S. (ed.). *Secularism—Its Implications for Law and Life in India*, New Delhi, 1985

Sharma, Shri Ram: *A Constitutional History of India (1765 to 1954)* 2nd edn , Bombay, 1955

Shiva Rao and others (eds): *The Framing of India's Constitution*, 5 Vols., New Delhi, Indian Institute of Public Administration, 1966.

Shukla, V N.: *Constitution of India*, 8th edn., (ed) M.P Singh, Lucknow, 1990.

Singh, M M.: *The Constitution of India, Studies in Perspective*, Calcutta, 1975.

Singh, Mahendra Pratap (ed). *Comparative Constitutional Law*, Delhi, 1984

Sinha, Lal Narain: *Indian Constitution A Fresh Look — An Analysis of Some Salient Aspects*, Patna, 1993

Smith, D E.: *India as a Secular State*, 1963.

Subbarao, G.C. Venkata. *Legislative Powers in Indian Constitutional Law*, Hyderabad, 1982.

Tope, T.K.: *Constitutional Law of India,* Lucknow, 1982.

Venkataramaiah, V. (ed.): *Essays on Constitutional Law,* New Delhi, 1986.

Vinod Kumar: *Constitution of India: Critical Appraisal,* New Delhi, 1988.

Wadhwa, K.K.: *Minority Safeguards in India, (Constitutional Pro.isions and their Implementation),* Delhi, 1975.

Printed at I.J Offset Printers, Wazirpur, Delhi - 35